আনোয়ার উল আলম

রক্ষীবাহিনীর সত্য-মিথ্যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা-পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য জাতীয় রক্ষীবাহিনী নামে নতুন একটি বাহিনী গঠন করা হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সরকার পরিবর্তনের পর রক্ষীবাহিনীকে বিলুপ্ত করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে আত্তীকরণ করা হয়। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে আলোচনা-সমালোচনার একটি কেন্দ্রবিন্দু ছিল রক্ষীবাহিনী। সে আলোচনা-সমালোচনা এখনো শেষ হয়নি। লেখক আনোয়ার উল আলম গঠন-প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে সেনাবাহিনীর সঙ্গে আত্তীকরণ পর্যন্ত রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। এ বইয়ে তাঁর ভাষ্যে উন্মোচিত হয়েছে রক্ষীবাহিনী এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নানা অজানা কথা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের প্রথম দিকে সরকার মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের নিয়ে গঠন করেছিল জাতীয় রক্ষীবাহিনী। এ বাহিনীর কাজ ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করা। রক্ষীবাহিনী এসব জাতীয় দায়িত্ব পালনে সর্বাত্মক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কিন্তু এর কর্মকাণ্ড নিয়ে নানা তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়। এসবের কতটা সত্য আর কতটা নিছক প্রচারণা? গ্রন্থের লেখক আনোয়ার উল আলম গঠন-প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত এই বাহিনীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। রক্ষীবাহিনী নিয়ে যেসব প্রশ্ন ও বিতর্ক রয়েছে, তিনি সেসব নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ বই আমাদের জাতীয় ইতিহাসের উত্থান-পতনময় কালপর্বের তাৎপর্যপূর্ণ দলিলবিশেষ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলোকচিত্র : সৈকত ভদ্র

আনোয়ার উল আলম

জন্ম ১৯৪৭, টাঙ্গাইল শহরে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞানে এমএ। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে টাঙ্গাইলে আঞ্চলিক মুক্তিবাহিনী সংগঠনে তাঁর ভূমিকা অনন্য। স্বাধীনতার পর সরকার জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠন করে। তিনি লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদমর্যাদায় এ বাহিনীর উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ) ছিলেন। ১৯৭৫ সালের অক্টোবরে এ বাহিনী বিলুপ্ত করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে আত্তীকরণ করা হয় এবং তিনি সেনাবাহিনীতে লেফটেন্যান্ট কর্নেল হিসেবে পুনর্নিয়োগ পান। কয়েক বছর পর তাঁর চাকরি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়। এরপর তিনি বিদেশে বাংলাদেশ মিশন ও দূতাবাসে কূটনীতিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে নানা সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত।

প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধরী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রক্ষীবাহিনীর সত্য-মিথ্যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনোয়ার উল আলম

রক্ষীবাহিনীর সত্য-মিথ্যা

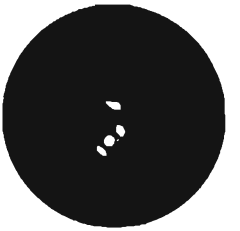

প্রথমা প্রকাশন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথমা প্রকাশন

রক্ষীবাহিনীর সত্য-মিথ্যা
গ্রন্থস্বত্ব © আনোয়ার উল আলম
চতুর্থ মুদ্রণ : চৈত্র ১৪২০, মার্চ ২০১৪
দ্বিতীয় সংস্করণ : কার্তিক ১৪২০, অক্টোবর ২০১৩
প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৪২০, জুন ২০১৩
প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ ও গ্রন্থসজ্জা : কাইয়ুম চৌধুরী
সহযোগী শিল্পী : অশোক কর্মকার
মুদ্রণ : সৃষ্টি প্রিন্টার্স
৬/৩ নয়াপল্টন, ঢাকা ১০০০

মূল্য : ৩৭৫ টাকা

Rokkhibahinir Shotto-Mittha
by Anwar Ul Alam
Published in Bangladesh by Prothoma Prokashan
CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue
Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Telephone : 8180081
e-mail : prothoma@prothom-alo.info

Price : Taka 375 only

ISBN 978 984 90253 9 9
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা মৌলভী আবদুর রাহীম ইছাপুরী,
যাঁর স্নেহের পরশে আমি বড় হয়েছি,
দেশপ্রেম শিখেছি এবং সত্য বলার সাহস পেয়েছি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

জাতীয় রক্ষীবাহিনী বিলুপ্তির ৩৮ বছর পর ২০১৩ সালে এসে আমি লিখি *রক্ষীবাহিনীর সত্য-মিথ্যা*। এত দিন পর বইটি পাঠকমহলে এতটা আদৃত হবে, ভাবিনি। বইটি প্রকাশিত হয় জুন মাসে। মাত্র দেড় মাসে বইটি শেষ হয়ে যায়। পুনর্মুদ্রিত হয় আগস্টে। দ্বিতীয় মুদ্রণও দ্রুতই নিঃশেষিত হয়। বইটির প্রতি পাঠকের আগ্রহ এখনো কমেনি।

ছাপা হওয়ার পর বইটিতে কয়েকটি ত্রুটি চোখে পড়ে। কয়েকজন পাঠকও দু-একটি ভুল ধরিয়ে দেন। এবার সেসব ত্রুটি সংশোধনের সুযোগ নিলাম। এর পরও কোনো ভুল থেকে গেলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে। পাঠকের কাছে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

আনোয়ার উল আলম
ঢাকা, অক্টোবর ২০১৩

ভূমিকা

১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত, এমনকি পরবর্তী সময়েও সমাজের বিভিন্ন স্তরে আলাপ-আলোচনায় জাতীয় রক্ষীবাহিনী একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে ছিল। রক্ষীবাহিনীর বিলুপ্তি বা সেনাবাহিনীর সঙ্গে আত্তীকরণের ৩৮ বছর পরও সেই আলাপ-আলোচনা অব্যাহত আছে। অনেক মহল থেকে রক্ষীবাহিনীর প্রশংসাও করা হয়। কিন্তু নিন্দা যত ছড়ায়, প্রশংসা তত ছড়ায় না।

আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী লীগ সরকারের সমালোচনাকারীরা সুযোগ পেলেই রক্ষীবাহিনীর সমালোচনা করেন। আওয়ামী লীগসহ কোনো মহল থেকে এই সমালোচনার বস্তুনিষ্ঠ জবাব দেওয়ার চেষ্টা করা হয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমালোচকদের একটি অভিযোগ, রক্ষীবাহিনী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত বাহিনী ছিল। আবার খোদ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরাও রক্ষীবাহিনীর সমালোচনা করতে পিছপা হন না। তাঁদের অভিযোগ,বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হলো অথচ রক্ষীবাহিনী কিছুই করল না।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের বেশির ভাগই বলতেন, বঙ্গবন্ধুর জন্য তাঁরা জীবন দিতে প্রস্তুত। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে যখন সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করা হলো, তখন জীবন দেওয়া দূরে থাক, প্রতিবাদে একটা টুঁ শব্দও যে কেউ করেননি, সে কথাটা বলেন না।

রক্ষীবাহিনীর সমালোচনা হয়েছে, কিন্তু রক্ষীবাহিনীর পক্ষে কেউ সমালোচনার জবাব দেননি। ফলে দীর্ঘ দিন ধরে সত্য, অর্ধসত্য ও একেবারে মিথ্যা উচ্চারিত হতে হতে প্রকৃত সত্য অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। বারবার উচ্চারিত হওয়ার ফলে অনেকের কাছে, বিশেষত নতুন প্রজন্মের কাছে মিথ্যাও সত্য বলে প্রতিভাত হচ্ছে। রক্ষীবাহিনীর একজন প্রাক্তন কর্মকর্তা হিসেবে এসব সমালোচনার জবাব দেওয়া এবং সত্য উদ্‌ঘাটন করা আমার নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে হয়েছে। রক্ষীবাহিনীর ব্যাপারে বারবার মিথ্যা বা ভুল তথ্য প্রচারিত হওয়ার পর এ বাহিনী সম্পর্কে মানুষের মনে যে ধারণা সৃষ্টি হয়েছে, তা যে মোটেই সঠিক নয়, সেটা পরিষ্কারভাবে তুলে ধরার জন্যই এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

দৈনিক *প্রথম আলোর* সম্পাদক মতিউর রহমানের উৎসাহ ও তাগিদেই আমি এই বই লেখার কাজ শুরু করি। আমার জানা তথ্যের ভিত্তিতে নির্ভয়ে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে আমি লেখার চেষ্টা করেছি। যদি কোনো ভুল থেকে থাকে তার দায়ভার সম্পূর্ণ আমার। কেউ ভুল নির্দেশ করলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

রক্ষীবাহিনীর সত্য-মিথ্যা প্রকাশের জন্য সম্পাদক মতিউর রহমান, *প্রথম আলোর* রাশেদুর রহমান এবং প্রথমা প্রকাশনার সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই। সুহৃদ পাঠকেরা বইটি সম্পর্কে মতামত জানালে খুশি হব।

আনোয়ার উল আলম
ঢাকা, জুন ২০১৩
anwarshaheed71@gmail.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

পটভূমি ১১
জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠন ২৯
আইনশৃঙ্খলা সমস্যা ৫২
রক্ষীবাহিনী নিয়ে বিতর্ক ৭০
সিরাজ শিকদার ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ৯৯
বাকশাল গঠন ১৩৩
কলঙ্কজনক অধ্যায় ১৩৯
ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ নভেম্বর ১৭২
শেষ কথা ১৮৪
পরিশিষ্ট
১. জাতীয় মিলিশিয়া সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকারের ঘোষণা ১৮৯
২. রক্ষীবাহিনী গঠন-সম্পর্কিত গেজেট ও সংশোধনী ১৯৩
৩. রক্ষীবাহিনীর প্রধানকে লেখা এম এ জি ওসমানীর চিঠি ২০৫
৪. রক্ষীবাহিনীর দ্বিতীয় ব্যাচের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ উপলক্ষে প্রকাশিত স্যুভেনিরের মুখবন্ধ ২০৭
৫. ১৯৭২-৭৫ সালে আওয়ামী লীগের যাঁরা নিহত হয়েছেন ২১০
৬. থানা-পুলিশ ফাঁড়িতে হামলা, লুট ও রক্ষীবাহিনীর ওপর আক্রমণ ২১৭
৭. রক্ষীবাহিনীর চতুর্থ ব্যাচের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ উপলক্ষে প্রকাশিত স্যুভেনিরের মুখবন্ধ ২২০
৮. রক্ষীবাহিনীর কর্মকর্তা ২২৪
৯. কে এম সফিউল্লাহর সাক্ষাৎকার ২৩১
১০. রক্ষীবাহিনীর বিলুপ্তি ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে আত্তীকরণ-সংক্রান্ত গেজেট ২৪৪
সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ২৪৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পটভূমি

১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ সরকার মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের নিয়ে জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনী গঠনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, তালিকাভুক্ত এবং তালিকাবহির্ভূত গণবাহিনীর সব সদস্যকে সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত করার জন্য জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনী গঠিত হবে। জাতীয় পুনর্গঠনের কাজে দেশের এই তরুণ সমাজের অভূতপূর্ব উৎসাহ-উদ্দীপনা সঠিকভাবে কাজে লাগানোর জন্যই এই কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয় যে প্রতিটি জেলা ও মহকুমায় একটি করে মিলিশিয়া ক্যাম্প খোলা হয়েছে, যেখানে মুক্তিবাহিনীর সব অস্ত্র জমা দিতে হবে। জাতীয় মিলিশিয়া কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দেশের তরুণ সমাজ মাতৃভূমির সেবা করার বিরাট সুযোগ পাবে। জাতীয় মিলিশিয়া হবে জনশক্তির আধার, যেখান থেকে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন সংস্থায় মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়োগ করতে পারবে। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের কিছুদিনের মধ্যেই আঁচ করা গেল, তরুণদের মধ্যে যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়নি, তারা একটু অসন্তুষ্ট। কারণ, চাকরির ক্ষেত্রে শুধু মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হলে তাদের সুযোগ কিছুটা হলেও সীমিত হয়ে পড়বে।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করে। এর অব্যবহিত পরই মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের কীভাবে যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন দেশটির পুনর্গঠনের কাজে লাগানো যায়, তা নিয়ে বাংলাদেশ সরকার চিন্তাভাবনা করেছিল। কারণ, মুক্তিযোদ্ধাদের অসীম সাহস, আত্মত্যাগী মনোভাব ও অসাধারণ দেশপ্রেমকে সরকার কাজে লাগাতে চেয়েছিল। ১৮ ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের জাতীয় মিলিশিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। মন্ত্রিসভার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই সিদ্ধান্তের পেছনে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ছয় দফা ও ছাত্রসমাজের এগারো দফা দাবির বিষয়টি ছিল। ছয় দফার ৬ নম্বর দফায় বলা হয়েছিল, 'আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলিকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আধা সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হইবে।' অন্যদিকে ছাত্রসমাজের এগারো দফার ৩ নম্বর দফার 'চ' উপদফায় ছিল, 'পূর্ব-পাকিস্তানকে মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিটারি রক্ষীবাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হইবে। পূর্ব-পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা নির্মাণ ও নৌবাহিনীর সদর দপ্তর স্থাপন করিতে হইবে।' এমনকি ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের একুশ দফার ১৯ নম্বর দফায়ও বিষয়টি প্রচ্ছন্নভাবে ছিল।

জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনী গঠনের কথা ছিল উপরিউক্ত সব দফায়। যদিও দফাগুলো ছিল তৎকালীন পাকিস্তানে পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধাদের কাজে লাগানোর জন্যও একটি মিলিশিয়া বাহিনী বা অন্য কোনো বাহিনী গঠন করার প্রয়োজন ছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে আত্মত্যাগী মনোভাব ও দেশপ্রেম ছিল, কিন্তু তাদের সবার সেনাবাহিনী অথবা অন্য কোনো নিয়মিত বাহিনীতে যোগ দেওয়ার মতো শারীরিক বা অন্যান্য যোগ্যতা ছিল না।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করার পর নিরাপত্তাজনিত ও অন্যান্য কারণে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ও মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের তখনই ঢাকায় আসা সম্ভব হয়নি। তবে সরকারের অগ্রবর্তী দল ১৭ ডিসেম্বরই ঢাকায় এসে প্রশাসনিক কাজ শুরু করে। ২২ ডিসেম্বর ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী প্রবাস থেকে ঢাকায় ফেরেন। ২৩ ডিসেম্বর ঢাকায় ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির সভাপতিত্বে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে ১৮ ডিসেম্বরের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১১ সদস্যবিশিষ্ট 'জাতীয় মিলিশিয়া' বোর্ড[১] গঠন করা হয়।

১৯৭২ সালের ৩ জানুয়ারি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকে সভাপতি করে জাতীয় মিলিশিয়ার কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হয়। সদস্যরা হলেন: ১. মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (সভাপতি, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, ন্যাপ [ভাসানী]), ২. এ এইচ এম কামারুজ্জামান (তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী), ৩. মনোরঞ্জন ধর (এমএনএ; আওয়ামী লীগ), ৪. মণি সিংহ (সভাপতি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি), ৫. অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ (সভাপতি, ন্যাশনাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আওয়ামী পার্টি, ন্যাপ [মোজাফ্ফর]), ৬. গাজী গোলাম মোস্তফা (এমপিএ[২]; আওয়ামী লীগ), ৭ রফিক উদ্দিন ভূঁইয়া (এমপিএ; আওয়ামী লীগ), ৮. তোফায়েল আহমেদ (এমএনএ[৩]; আওয়ামী লীগ), ৯. আব্দুর রাজ্জাক (এমপিএ; আওয়ামী লীগ) ও ১০. (ক্যাপ্টেন) সুজাত আলী (এমপিএ; আওয়ামী লীগ)। সরকার, আওয়ামী লীগসহ স্বাধীনতার পক্ষের সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি এই বোর্ডের সদস্য ছিলেন।

১৯৭২ সালের ৬ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ সচিবালয়ে জাতীয় মিলিশিয়া বোর্ডের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাজউদ্দীন আহমদ সভায় বলেন, 'জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও দলমত-নির্বিশেষে যাঁরা দখলদার পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন, তাঁদের সবাইকে জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনীতে নেওয়া হবে। সরকার তাঁদের আহার, বাসস্থান এবং ন্যূনতম বেতনের ব্যবস্থা করবেন।...জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনীতে তালিকাভুক্তির পর প্রত্যেককে নিজ নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কর্মস্থান এবং ব্যক্তিগত পেশায় ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে।'[৪]

এই সময় অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ২ থেকে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ফরমেশন[৫] কমান্ডারদের এক সভা সেনাসদরে অনুষ্ঠিত হয়। সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান কর্নেল মুহাম্মদ আতাউল গনি (এম এ জি) ওসমানী[৬] সভায় সভাপতিত্ব করেন। মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর ও ফোর্স কমান্ডাররাসহ তিন বাহিনীর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে জাতীয় মিলিশিয়া গঠনে সরকারের প্রস্তাবের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানানো হয়। এ ব্যাপারে সরকারকে প্রয়োজনীয় সব সহযোগিতা করার জন্য ফরমেশন কমান্ডাররা একটি কমিটি[৭] গঠন করেন। উইং কমান্ডার এম কে বাশার[৮], লেফটেন্যান্ট কর্নেল সি আর দত্ত[৯], লেফটেন্যান্ট কর্নেল ডি কে দাস[১০], লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাজী নূরুজ্জামান[১১], লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম এ মঞ্জুর[১২] ও মেজর রফিকুল ইসলামকে[১৩] ওই কমিটির সদস্য নির্বাচিত করা হয়।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশে ফেরেন। ১২ জানুয়ারি তিনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর কয়েক দিন পর বাংলাদেশ সরকার চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত নেয়, মুক্তিযোদ্ধাদের দেশ গঠনে কাজে লাগানোর জন্য জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করা হবে। ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি এই মর্মে সরকার একটি প্রেসনোট[১৪] জারি করে। প্রেসনোটে বলা হয় :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১. অনতিবিলম্বে একটি জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করা হইবে এবং তালিকাভুক্ত হউক বা না হউক, সমস্ত মুক্তিযোদ্ধাকে তাহার আওতায় আনা হইবে।

২. প্রত্যেক মহকুমায় সেই এলাকার গেরিলা বাহিনীর জন্য শিবির প্রতিষ্ঠা করা হইবে। শিবিরগুলোর পরিচালনা ব্যবস্থা এমনভাবে করা হইবে যেন এইসব যুবককে পুনর্গঠন কাজের উপযোগী করিয়া প্রয়োজনীয় ট্রেনিং দেওয়া সম্ভবপর হয়।

৩. মহকুমাভিত্তিক শিবিরগুলো সেই এলাকার সমস্ত গেরিলা বাহিনীর মিলনকেন্দ্র হইবে।

৪. ঊর্ধ্বপক্ষে এগারোজন সদস্য লইয়া জাতীয় মিলিশিয়ার জন্য একটি কেন্দ্রীয় বোর্ড গঠন করা হইবে। বোর্ডের সদস্যগণকে সরকার মনোনয়ন দান করিবেন।

৫. প্রত্যেক মহকুমা শহরে জাতীয় মিলিশিয়ার জন্য মহকুমা বোর্ড থাকিবে। মহকুমা বোর্ডের সদস্যসংখ্যা অনধিক এগারোজন হইবে। সদস্যগণ সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবেন।

৬. প্রতিটি শিবিরে অস্ত্রশস্ত্র কার্যোপযোগী অবস্থায় রাখা, গুদামজাত করা ও হিসাবপত্র রাখার জন্য একটি করিয়া অস্ত্রাগার থাকিবে।

৭. ট্রেনিং-এর কার্যসূচি এমনভাবে প্রস্তুত করা হইবে যেন এইসব যুবককে নিম্নে বর্ণিত ভূমিকা পালনের উপযোগী করিয়া তোলা যায়:

   ক. যেন তাঁহারা দেশের দ্বিতীয় রক্ষাবাহু হইতে পারেন।

   খ. যখনই নির্দিষ্টভাবে প্রয়োজন হইবে তখনই যেন তাঁহারা আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও পুনর্বহালে উপযোগী হইতে পারেন।

   গ. দেশের পুনর্গঠনকার্যে সরকারি সহায়তা হয় এমন বিভিন্ন কাজের উপযোগী হন।

৮. অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান, অপুষ্টিকর খাদ্য এবং অপর্যাপ্ত বেতন ও ভাতার জন্য মুক্তিযুদ্ধের সময় এই গেরিলাদের এক বিরাট অংশ কষ্টভোগ করিয়াছেন। সে জন্যই তাঁহাদের খাদ্য, বাসস্থান ও ভাতার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হইবে।

সে দিন অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টাঙ্গাইলের মুক্তিবাহিনীর[১৫] অস্ত্র গ্রহণের জন্য টাঙ্গাইল সফরে যান। স্বাধীন দেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ এবং বন্দী অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে দেশে ফেরার পর ঢাকার বাইরে এটাই ছিল তাঁর প্রথম সফর। তিনি মুক্তিযুদ্ধে টাঙ্গাইলের মুক্তিযোদ্ধাদের অসীম সাহসিকতা ও টাঙ্গাইলের মুক্ত এলাকায় মুজিবনগর সরকারের প্রশাসন কার্যকর রাখার সাফল্যের স্বীকৃতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

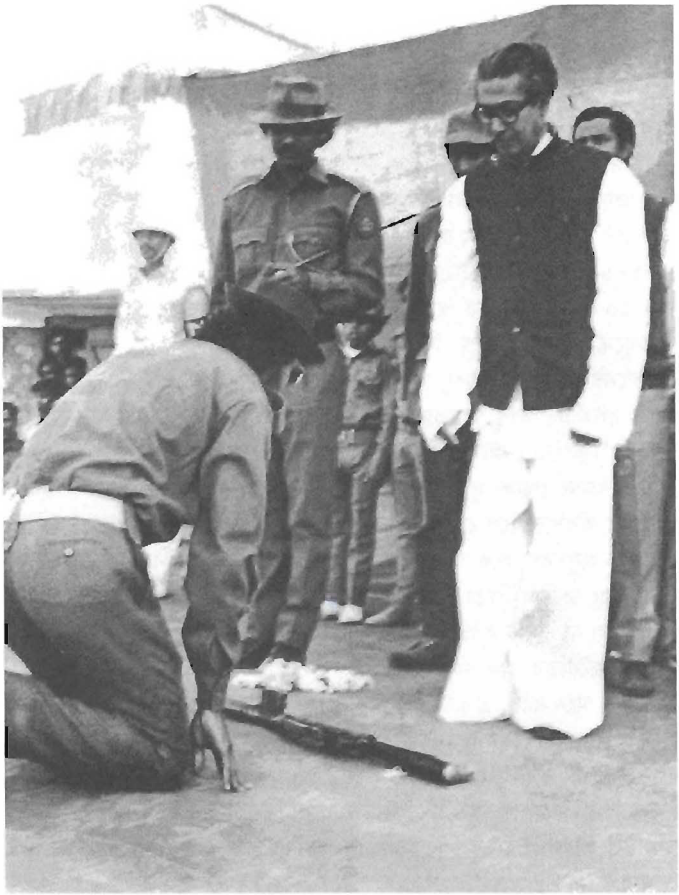

টাঙ্গাইল মুক্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে অস্ত্র সমর্পণ করছেন আবদুল কাদের সিদ্দিকী [বীর উত্তম]। বঙ্গবন্ধুর বাঁ পাশে লেখক আনোয়ার উল আলম

দিতে চেয়েছিলেন। তবে সরকারের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন নানা কারণে তাঁর এই সফরের বিরোধিতা করেছিলেন।

টাঙ্গাইলে অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। তিনি বলেন, 'আমি তোমাদের তিন বছর কিছু দিতে পারব না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরও তিন বছর যুদ্ধ চললে তোমরা যুদ্ধ করতে না?' (মুক্তিযোদ্ধারা সমস্বরে বলে, করতাম, করতাম।) এরপর বঙ্গবন্ধু বলেন, 'তা হলে মনে কর যুদ্ধ চলছে। তিন বছর যুদ্ধ চলবে। সেই যুদ্ধ দেশ গড়ার যুদ্ধ। অস্ত্র হবে লাঙল আর কোদাল।'

টাঙ্গাইল সফরের একপর্যায়ে বঙ্গবন্ধু আমাকে জাতীয় মিলিশিয়া গঠনের কথা জানান। তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমাকে এতে যোগ দিতে বলেন। তাঁর এ আহ্বানে আমি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে যাই।

১৯৬২ সালে আমি ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হই। পড়াশোনার পাশাপাশি দীর্ঘ ১০ বছর বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলাম। মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশ নিয়েছি। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানের পর মনে হলো, আমার রাজনীতি করার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। এখন রাজনীতি হবে ক্ষমতার রাজনীতি। সেই রাজনীতিতে আমার কোনো আকর্ষণ ছিল না। আমার পিতা মৌ. আবদুর রাহীম ইছাপুরী সারা জীবন ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তির লক্ষ্যে রাজনীতি করেন। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হলে সে বছর তিনি সরকারি চাকরিতে যোগ দেন। আমিও পিতাকে অনুসরণ করে সরকারি চাকরিতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। তা ছাড়া স্বয়ং জাতির পিতা নির্দেশ দিয়েছেন, সে নির্দেশ অমান্য করার কোনো প্রশ্নই ছিল না। আমার ভাইবোন ও রাজনৈতিক সহকর্মীরা অবশ্য চেয়েছিলেন আমি রাজনৈতিক অঙ্গনেই থাকি।

আমি মনে করি, একটা স্বপ্ন বা উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষের পথ চলা উচিত। আমার সারা জীবনের স্বপ্ন ছিল বাঙালি জাতির মুক্তি। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়ার পর বঙ্গবন্ধুর আহ্বান পেয়ে আমার মনে হলো, আমার আর রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার কোনো দরকার নেই। আমি একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের সৎ পিতা-মাতার সন্তান। সৎ পথে জীবন ধারণ করাই আমার লক্ষ্য।

দেশকে শত্রুমুক্ত করেছি, কিন্তু আমার হাতে কোনো টাকা নেই। ভাবলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে পিতা-মাতার কাছ থেকে টাকা নেওয়া ঠিক নয়। দেশসেবা ও জীবিকা নির্বাহের জন্য চাকরিই আমার জন্য সম্মানজনক ও সৎ পথ। স্বাধিকার আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধকালে আমার কিছু সহকর্মীকে দেখেছি কোথা থেকে যেন তাঁরা অর্থ সংগ্রহ করেন। চাঁদা আদায় করে বা অন্যের পয়সায় জীবন ধারণ করব—এটা আমার কল্পনাতেও কখনো আসেনি।

মুক্তিযুদ্ধকালে আমি মাত্র দু-তিনটি কাপড় ব্যবহার করেছি। স্বাধীনতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর আমার পরার মতো ভালো কাপড় ছিল না। পিতা-মাতা বা ভাইদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে কাপড়চোপড় তৈরি করতে হয়। আমি চলতাম পিতা-মাতা ও ভাইদের টাকায়। এদিক দিয়ে আমি কিছুটা ভাগ্যবান। তখন আমার মনে হলো, এখন বড় হয়েছি, আমার নিজের পায়ে দাঁড়ানো দরকার। এই সময় আমার বন্ধু সৈয়দ আহমেদ ফারুক[১৬] আমাকে সদ্য প্রতিষ্ঠিত জনতা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক খায়রুল কবিরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁর সহায়তায় আমি ১৯৭২ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসের দিকে জনতা ব্যাংক থেকে ব্যক্তিগত ও অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০ হাজার টাকা ঋণ নিই। পরে এই টাকা কিস্তিতে পরিশোধ করি।

বঙ্গবন্ধু টাঙ্গাইল থেকে ফিরে দু-তিন দিন পর আমাকে খবর পাঠান—আমি যেন প্রধানমন্ত্রীর বৈকালিক কার্যালয় 'গণভবনে'[১৭] তাঁর সঙ্গে দেখা করি। সেই নির্দেশ অনুযায়ী ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসের ২৮ তারিখ বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গণভবনে যাই। তিনি আমাকে ঢাকায় থাকতে এবং মেজর এ এন এম নূরুজ্জামানের[১৮] সঙ্গে অবিলম্বে সাক্ষাৎ করতে বলেন।

আমি এ এন এম নূরুজ্জামানের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলাম না। তাঁর সঙ্গে কোথায় দেখা করব, তাও জানা ছিল না। তবে এটুকু জানতাম যে তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধকালে যুদ্ধ করেন ৩ নম্বর সেক্টরে। ৩ নম্বর সেক্টরের সেক্টর অধিনায়ক মেজর কে এম সফিউল্লাহ[১৯] জুলাই মাসের শেষে নিয়মিত মুক্তিবাহিনী গঠনের লক্ষ্যে ব্রিগেড গঠনের ('এস' ফোর্স) দায়িত্ব পেলে নূরুজ্জামান তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। আমার কাছে তাঁর আরও একটা পরিচয় ছিল। তিনি ছিলেন আমার এক সহপাঠীর ভগ্নিপতি।

২৮ জানুয়ারি গণভবনে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাতের পর তাঁর সচিব রফিকুল্লাহ চৌধুরীর সঙ্গে আমি দেখা করতে যাই। দেখা গেল, তিনিও এ এন এম নূরুজ্জামানের সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না। কোথায় তাঁর দেখা পাব বা তাঁর ঠিকানা কী, তিনি বলতে পারলেন না। তিনি দু-তিন দিন পর আমাকে আবার গণভবনে যেতে বললেন।

৩১ জানুয়ারি গণভবনে জাতীয় মিলিশিয়ার নবনিযুক্ত পরিচালক এ এন এম নূরুজ্জামানের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। পরে রফিকুল্লাহ চৌধুরীর অফিসকক্ষে আমরা দুজন দীর্ঘক্ষণ জাতীয় মিলিশিয়া গঠন নিয়ে আলোচনা করি। ঠিক হয়, পরদিন সকালবেলা পিলখানায় অবলুপ্ত ইস্ট পাকিস্তান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাইফেলসের[২০] কার্যালয়ে আমরা আবার মিলিত হব। জাতীয় মিলিশিয়ার প্রধান কার্যালয় হবে সেখানেই।

১ ফেব্রুয়ারি সকালে নির্ধারিত সময়ের আগেই পিলখানায় যাই। নির্ধারিত সময়ে এ এন এম নূরুজ্জামানও আসেন। আমরা পিলখানায় আমাদের কাজকর্মের সূচনা করি। কীভাবে কাজ করা হবে, আমরা দুজন তা আগের দিনই আলোচনা করেছি। তার ভিত্তিতে সারা দিন কাজ করার পর বিকেলবেলা আমরা দুজন আবার প্রধানমন্ত্রীর বৈকালিক কার্যালয় গণভবনে যাই। সেখানে প্রধানমন্ত্রীর সদ্য নিযুক্ত রাজনৈতিক সচিব তোফায়েল আহমেদের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি আমাদের সঙ্গে একজনকে পরিচয় করিয়ে দেন। নাম সরোয়ার হোসেন মোল্লা। তাঁকে আমরা দুজনের কেউ চিনতাম না। তোফায়েল আহমেদ জানালেন, তিনিও আমাদের সঙ্গে কাজ করবেন।

সরোয়ার হোসেন মোল্লা ছিল মুক্তিযুদ্ধকালে আলাদাভাবে গঠিত মুজিব বাহিনীর মাদারীপুর মহকুমার কমান্ডার। অসাধারণ সাহসের সঙ্গে সে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। এ ছাড়া ওই এলাকায় সরোয়ার বহুদিন ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে। একসময় সে মাদারীপুর কলেজ ছাত্র সংসদের নির্বাচিত সহসভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। আমার সঙ্গে আগে পরিচয় না থাকলেও সেদিন তার কাছ থেকে জানতে পারি, ১৯৭০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সলিমুল্লাহ হল ছাত্র সংসদের নির্বাচনে সে আমার প্রার্থিতার পক্ষে পার্শ্ববর্তী সার্জেন্ট জহুরুল হক হল থেকে এসে প্রচারণা চালিয়েছিল। আমরা দুজনই মুক্তিযোদ্ধা। দেখামাত্রই তার সঙ্গে আমার একটা উষ্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গণভবনে কাজ শেষে নূরুজ্জামানের অনুমতি নিয়ে সেদিন রাতেই আমি টাঙ্গাইলে চলে আসি।

৩ ফেব্রুয়ারি আমার পিতা মৌ. আবদুর রাহীম ইছাপুরী আমার ও টাঙ্গাইল মুক্তিবাহিনীর সাফল্যে নিজ বাড়ি 'ইছাপুরী লজে' এক আনন্দোৎসবের আয়োজন করেন। সেই উৎসবে তিনি স্থানীয় মুক্তিবাহিনীর নেতা, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য, টাঙ্গাইল শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ আত্মীয়স্বজনদের আমন্ত্রণ জানান। এম হোসেন আলী ছিলেন আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের একজন। ১৯৭১ সালে তিনি কলকাতায় পাকিস্তানের উপদূতাবাসের প্রধান ছিলেন। বাঙালি কূটনীতিক হিসেবে তিনি প্রথম বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে আনুগত্য ঘোষণা করেন। স্বাধীনতার পর পরই তিনি ঢাকায় আসেন। উঠেছিলেন ঢাকা সেন্ট্রাল সার্কিট হাউসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেখানে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা ও পরিচয় হয়। প্রথম পরিচয়েই আমাদের একটু ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল।

ইছাপুরী লজের লনে বিরাট শামিয়ানা টানিয়ে মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হয়। পুত্রতুল্য মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান জানিয়ে এবং তাঁদের বীরত্বের প্রশংসা করে আমার পিতা একটা চমৎকার ভাষণ দিয়েছিলেন। স্বাধীনতার পর আমার পিতাই প্রথম ব্যক্তিগত আয়োজনে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরাট সংবর্ধনা দেওয়ার বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তিনি ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ সংগ্রামী ও আদর্শ দেশপ্রেমিক। হাজার হাজার বাঙালির মতো একাত্তরে পাকিস্তানি কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে তিনি প্রতিনিয়ত মৃত্যুর মুখোমুখি ছিলেন। কিন্তু কখনো মৃত্যুভয়ে ভীত হননি। পরে পাঞ্জাবিবিদ্বেষী এক সিন্ধি কর্মকর্তার বদৌলতে তিনি মুক্ত হন। এর পরও তিনি স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করার ব্যাপারটি অব্যাহত রেখেছিলেন। আমি কখনো যুদ্ধ শেষে ফিরে আসব কি না, সে বিষয়ে তিনি বিন্দুমাত্র চিন্তা করতেন না। আসলে আমার পিতা ছিলেন আজীবন একজন ত্যাগী ও নির্ভীক সংগ্রামী। তাঁর পুত্র হিসেবে আমি মনেপ্রাণে গর্ব অনুভব করি, সৌভাগ্যবান মনে করি নিজেকে।

পরদিন, ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় এসেই আমি সরাসরি পিলখানায় যাই এবং এ এন এম নূরুজ্জামানের সঙ্গে দেখা করি। একটু পর তিনি আমাকে সুবেদার হাফিজ উদ্দিনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। পরিচয় শেষে তিনি বলেন, সারা দেশের বিভিন্ন জেলা-মহকুমায় অবস্থিত মিলিশিয়া ক্যাম্প থেকে মুক্তিযোদ্ধারা শিগগিরই পিলখানায় আসতে শুরু করবে। অবলুপ্ত ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের সদস্যরাও কাজে যোগ দেবেন। সুতরাং, তাঁদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। নূরুজ্জামানের নির্দেশমতো আমি হাফিজ উদ্দিনকে সঙ্গে নিয়ে বিপুল উদ্যমে কাজ শুরু করি।

কয়েক দিনের মধ্যেই সারা দেশ থেকে মুক্তিযোদ্ধারা পিলখানায় আসতে থাকে। এর আগে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা দিয়েছিলেন, টাঙ্গাইল মুক্তিবাহিনীর মধ্যে যাঁরা মিলিশিয়ায় যোগদান করতে চান, তাঁদের সুযোগ দেওয়া হবে। তাঁর ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে টাঙ্গাইল ক্যাম্প থেকেও আমি মুক্তিযোদ্ধাদের আনার ব্যবস্থা করি। তাঁদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতেই আমাদের হিমশিম খাওয়ার অবস্থা হয়। এ ব্যাপারে আমাদের কাছে তখনো কোনো সরকারি অর্থ বরাদ্দ আসেনি। ঢাকার জেলা প্রশাসকের কাছে যে অর্থ বরাদ্দ ছিল, সেখান থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিদিন খাওয়ার খরচ দেওয়া হতো। এ জন্য ম্যাজিস্ট্রেট আজিজুল হক ও নাসিরউদ্দিন প্রতিদিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থসহ পিলখানায় আসতেন। কিন্তু এভাবে তো বেশি দিন চলতে পারে না!

বাংলাদেশ সরকার জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনীকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে রাখে। তখন স্বরাষ্ট্রসচিব ছিলেন তসলিম আহমদ। পাকিস্তানপন্থী হিসেবে তাঁর কিছুটা পরিচিতি ছিল। একাত্তরে একনিষ্ঠভাবে তিনি পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করেন। তার পরও তাঁকে স্বরাষ্ট্রসচিব করা হয়। অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্রসচিব মুক্তিযোদ্ধা আবদুল খালেক একজন দক্ষ পুলিশ কর্মকর্তা ছিলেন। সরকার তাঁকে পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল (আইজি) নিয়োগ করে। অনেকের মতে, তাঁকেই স্বরাষ্ট্রসচিব রাখা উচিত ছিল। তা না করে বঙ্গবন্ধু তসলিম আহমদের মতো একজন ব্যক্তিকে কেন স্বরাষ্ট্রসচিব করেছিলেন, আমাদের বোধগম্য হয়নি। জাতীয় মিলিশিয়া গঠনসংক্রান্ত রাষ্ট্রপতির আদেশনামা জারি, এর কাঠামো তৈরি ও বাজেট প্রণয়ন নিয়ে পরিচালক এ এন এম নূরুজ্জামান এবং আইন মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিরা তসলিম আহমদের সঙ্গে প্রায় প্রতিদিনই বসতেন। নতুন দেশে এসব কাজ সম্পন্ন করা এমনিতেই কঠিন ছিল, তার ওপর তসলিম আহমদ নানাভাবে সমস্যা সৃষ্টি করে কাজ আরও কঠিন করে তুলতেন। এ জন্য সব সময় জটিলতা লেগেই থাকত।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত বাংলাদেশ একটি প্রদেশ ছিল। প্রাদেশিক সরকারের রাজধানী ছিল ঢাকা। প্রাদেশিক সরকার স্বাধীনভাবে কাজ না করে শুধু পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের হুকুম তামিল করেছে। ঢাকা একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের রাজধানী হওয়ার পর কীভাবে কাজ করতে হবে তা প্রাদেশিক আমলাতন্ত্রের কেউই ঠিকমতো অনুধাবন করতে পারছিলেন না। অবশ্য পুলিশ বাহিনী আগে থেকেই প্রাদেশিক সরকারের বিষয় ছিল। সে জন্য পুলিশ বাহিনীকে আবদুল খালেক সহজেই সংগঠিত করতে সক্ষম হন। মুক্তিযুদ্ধকালেও বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্রসচিব এবং পুলিশের আইজি হিসেবে তিনি দারুণ দক্ষতা ও সাংগঠনিক ক্ষমতা দেখিয়েছিলেন। আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম, তিনি স্বরাষ্ট্রসচিব থাকলে আমাদের অনেক সুবিধা হতো। অন্যদিকে তসলিম আহমদ ও তাঁর মতো কর্মকর্তারা নানাভাবে প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্টি করতেন। পাকিস্তান আমলের আমলাতান্ত্রিক মনোভাব নিয়ে তাঁরা সদ্য স্বাধীন দেশ ও সরকারের জন্য যাবতীয় প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ ছিলেন।

এদিকে জাতীয় মিলিশিয়া গঠনের সরকারি প্রজ্ঞাপন জারি হলেও অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে তখনো কোনো অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি। কারণ, কোন খাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে এর ব্যয় নির্বাহ করা হবে, তখনো তা ছিল অনির্ধারিত। এ ব্যাপারে আমাকে বারবার অর্থ মন্ত্রণালয়ে যেতে হয়। সেখানেও দেখা গেল ফাইল নড়ে না। অর্থ বরাদ্দ না হলে পিলখানায় জমায়েত হওয়া জাতীয় মিলিশিয়ার সদস্যদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। আবার সুব্যবস্থা না হলে দূর-দূরান্ত থেকে আসা মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করে একটা শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে আসাও প্রায় অসম্ভব। শত প্রতিকূলতার মধ্যে এ এন এম নূরুজ্জামান, সরোয়ার হোসেন মোল্লা আর আমি নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাই। সরোয়ার আর আমাকে বলা হয়েছে পরিচালক নূরুজ্জামানের অধীনে আমরা দুজন জাতীয় মিলিশিয়ার সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করব।

স্বাধীনতার পরপরই ভারত সরকার বাংলাদেশকে ৩ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছিল। বাংলাদেশ সরকারের কোষাগারে তখন তেমন কোনো অর্থ মজুত ছিল না। পাকিস্তান সেনাবাহিনী পরাজয় নিশ্চিত জেনে ডিসেম্বরের প্রথম দিকে স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের ঢাকা অফিসে রক্ষিত সব অর্থ ও স্বর্ণ পাকিস্তানে পাচার করেছিল বা পুড়িয়ে ফেলেছিল। ভারত সরকারের দেওয়া অর্থ সেই সময় বাংলাদেশ সরকারের বেশ কাজে লেগেছিল। পশ্চিমা বিশ্ব ও মুসলিম দেশগুলো সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে তখনো স্বীকৃতি না দিলেও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে।

বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্ত ছিল, অবলুপ্ত ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের সদস্য ও মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে গঠিত হবে জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনী। তাদের দুটো মুখ্য দায়িত্ব হবে, সীমান্ত পাহারা দেওয়া এবং অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ বাহিনীকে সহায়তা করা। ইপিআরের বেশির ভাগ সদস্য সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে বীরবিক্রমে লড়াই করেন। আমাদের চূড়ান্ত বিজয়ে তাঁরা অসাধারণ অবদান রাখেন। কিন্তু তাঁদের জেসিও (জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার) ও এনসিও (ননকমিশন্ড অফিসার) পর্যায়ের কয়েকজন মুক্তিযুদ্ধে অংশ না নিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে ছিল। ফলে ইপিআরের মুক্তিযোদ্ধারা তাদের ব্যাপারে নানা রকম প্রশ্ন তোলেন। সেসব প্রশ্ন মীমাংসার জন্য ১৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় মিলিশিয়ার পরিচালক নূরুজ্জামান একটি স্ক্রিনিং কমিটি গঠন করেন। সেনাবাহিনীতেও এর আগে অনুরূপ একটি বোর্ড গঠন করা হয়েছিল। জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনীর স্ক্রিনিং কমিটির প্রধান করা হয় আমাকে। সদস্য হিসেবে থাকেন সেনাবাহিনীর সুবেদার হাফিজ উদ্দিন এবং ইপিআরের নায়েব সুবেদার আহসান উল্লাহ। স্ক্রিনিং কমিটি গঠনের কথা আমি জানতাম না। জানলাম পরদিন ১৬ ফেব্রুয়ারি সকালে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেদিন অর্থাৎ ১৬ ফেব্রুয়ারি আমি খুব সকালেই পিলখানায় আমার অফিসে যাই। পৌঁছেই দেখি, হাফিজ উদ্দিন ও আহসান উল্লাহ আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। হাফিজ উদ্দিনই আমাকে জানান যে আগের দিন অর্থাৎ ১৫ ফেব্রুয়ারি পরিচালক নূরুজ্জামান একটি স্ক্রিনিং কমিটি গঠন করেছেন এবং আমাকে সেই কমিটির সভাপতি করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, কয়েকজন জেসিও (সুবেদার মেজর, সুবেদার ও নায়েব সুবেদার) এবং এনসিও (হাবিলদার, নায়েক ও ল্যান্স নায়েক) সাবেক ইপিআরের মুক্তিযোদ্ধা ও অমুক্তিযোদ্ধা সৈনিক, বিশেষত জেসিও ও এনসিওদের মধ্যে এই মর্মে গুজব ছড়াচ্ছে যে তাদের চাকরি থেকে বের করে দেওয়া হবে। এতে পিলখানায় কিছুটা চাপা ক্ষোভ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হচ্ছে। স্ক্রিনিং কমিটি তখনো কাজ শুরু করেনি, কিন্তু পিলখানায় ইপিআরের সদস্যদের মধ্যে এই গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে তাদের বেশির ভাগ জেসিও এবং এনসিওকে জাতীয় মিলিশিয়া থেকে বাদ দেওয়া হবে। বিশেষত যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়নি, তারা শঙ্কিত হয়ে পড়ে।

বিষয়টি জানার পর ঠিক সেই মুহূর্তে আমাদের, বিশেষত আমার, কী করণীয় তা আমি বুঝে উঠতে পারিনি। আমি ভাবতে শুরু করি, আমার কী করা প্রয়োজন। এদিকে দ্রুত ঘটনা ঘটতে থাকে। হঠাৎ কিছু শোরগোল আমার কানে আসে। আমি যে কক্ষে ছিলাম সেখান থেকে তাড়াতাড়ি বের হয়েই দেখি, এ এন এম নূরুজ্জামানকে ঘিরে ইপিআরের কয়েকজন জেসিও এবং এনসিওসহ সেনারা হইচই করছে। তাদের মধ্যে অনেকে মারমুখী হয়ে উঠেছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে ভিড় ঠেলে নূরুজ্জামানের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের শান্ত করার চেষ্টা করি। কিন্তু তারা কিছুতেই আমার কথা শুনতে চায় না; বরং আরও মারমুখী হয়ে ওঠে। একপর্যায়ে তারা নূরুজ্জামানকে কিল-ঘুষি মারতে থাকে। আমি তাদের প্রতিহত করার চেষ্টা করি। আমাদের দুজনকে রক্ষা করার জন্য আক্রমণকারীরা ছাড়া আর কেউ ধারেকাছে ছিল না। মনে হলো, আক্রমণকারীদের যত ক্ষোভ নূরুজ্জামানের ওপর। তারা আমাকে চিনতে পারেনি; ভেবেছে, আমি তাদের দলের বা বাইরের কেউ হব। নূরুজ্জামানকে রক্ষা করতে গিয়ে আমার নাকে একটা শক্ত আঘাত লাগে। ঝরঝর করে রক্ত পড়তে থাকে।

এর মধ্যে হাফিজ উদ্দিন আমাদের ওপর আক্রমণ হওয়ার খবর পিলখানার ব্যারাকে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পৌঁছে দেন। মুক্তিযোদ্ধারা সরোয়ার হোসেন মোল্লার নেতৃত্বে আমাদের দুজনকে উদ্ধার করতে আসেন। তখন ইপিআরের অমুক্তিযোদ্ধা সদস্যরা অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এলোপাতাড়ি গোলাগুলি শুরু করে। মুক্তিযোদ্ধারাও তাঁদের কাছে থাকা অস্ত্র দিয়ে পাল্টা গুলিবর্ষণ করেন। প্রায় আধা ঘণ্টা ধরে গুলিবিনিময় চলে। মুক্তিযোদ্ধারা নূরুজ্জামান ও আমাকে আক্রমণকারীদের কবল থেকে উদ্ধার করেন। তাঁরা আমাদের পিলখানার এক পাশে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যান। আমাদের জামাকাপড় তখন রক্তাক্ত। এ ঘটনার সময় মুক্তিযোদ্ধা আকরাম হোসেন ও শেখ দলিল উদ্দিন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁরা সফল হননি।

পরে জানতে পারি, সেনা কর্মকর্তা এ এন এম নূরুজ্জামান ইপিআরের অমুক্তিযোদ্ধাদের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন, এ খবর কিছুক্ষণের মধ্যেই সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান এম এ জি ওসমানীর কাছে পৌঁছে যায়। তিনি কীভাবে খবর পেয়েছেন বা কে তাঁকে খবর দিয়েছে, সেটা আমি জানি না। খবর পেয়েই তিনি সদ্য গঠিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৪৬ ব্রিগেড অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল কে এম সফিউল্লাহসহ কয়েকজন সেনা কর্মকর্তাকে নিয়ে দ্রুত পিলখানার গেটে উপস্থিত হন। কিন্তু অবিরাম গোলাগুলির কারণে তাঁরা ভেতরে ঢুকতে পারেননি।

এদিকে গোলাগুলির শব্দে ঢাকা শহরের একাংশ প্রকম্পিত এবং মানুষ সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণের মধ্যে খবরটা গোটা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত খবরটা পৌঁছে যায় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছেও। তিনি খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, ওসমানী পিলখানায় ঢুকতে পারছেন না বা ঢোকার সাহস পাচ্ছেন না। কালবিলম্ব না করে বঙ্গবন্ধু নিজেই চলে আসেন পিলখানায়। তিনি ধানমন্ডির দিক থেকে পিলখানার ভেতরে প্রবেশ করেন। বঙ্গবন্ধু পিলখানায় প্রবেশ করেছেন, খবরটা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গোলাগুলি বন্ধ হয়ে যায়। একটু পর খবর পেয়ে নূরুজ্জামান আর আমি দ্রুত বঙ্গবন্ধুর কাছে যাই। ঘটনাটি নিয়ে তিনি আমাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলেন। কারণ জানতে চান। আমরা সংক্ষেপে তাঁর কাছে ঘটনা বলি। এরপর উপস্থিত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আমাদের হাসপাতালে পাঠানোর নির্দেশ দেন বঙ্গবন্ধু।

আমাদের দুজনকে দ্রুত নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসকেরা আমাদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে সারা দিন হাসপাতালে রাখেন। পরীক্ষা করে দেখা যায়, আমার নাকের আঘাতটা গুরুতর, তাই রক্তক্ষরণ বেশি হয়েছে। চিকিৎসক এ জন্য আমাকে কয়েক দিন বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দিয়ে সন্ধ্যাবেলায় ছেড়ে দেন। নূরুজ্জামানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত লেগেছিল। সে আঘাত ছিল গুরুতর। চিকিৎসার জন্য তাঁর হাসপাতালে থাকা প্রয়োজন ছিল। তবু তিনি হাসপাতালে থাকতে চাননি।

সেদিন হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আমি ভাবছিলাম, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নূরুজ্জামান একজন সেক্টর কমান্ডার ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের আগে তিনি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে একজন অভিযুক্ত ছিলেন। তাঁদের মতো খাঁটি দেশপ্রেমিক ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কারণে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর মতো একজন মানুষ স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে আক্রান্ত হলেন পাকিস্তানিদের সহযোগীদের হাতে! মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে পাকিস্তানি ভাবধারার একদল মানুষের হাতে আমি নিজেও টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে আক্রান্ত হয়ে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলাম। স্বাধীন দেশের মাটিতেও আবার আমাকে তাদের হাতেই আক্রান্ত হতে হলো। আমি ভালো করেই জানতাম, বাংলাদেশের একশ্রেণীর মানুষ আমাদের স্বাধীনতা চায়নি এবং স্বাধীনতাযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু যুদ্ধ শেষে মুক্ত দেশে তাদের হাতে আমাকে আহত হতে হবে, সেটা কখনো চিন্তা করিনি।

উল্লেখ্য, তখন পর্যন্ত বাংলাদেশের সব বাহিনীর প্রধান (প্রধান সেনাপতি) ছিলেন কর্নেল এম এ জি ওসমানী। ডেপুটি চিফ অব স্টাফ ছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম এ রব। তাঁরা দুজনই আবার ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তৎকালীন পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের সদস্য বা এমএনএ নির্বাচিত হয়েছিলেন।

এ সময় এ এন এম নূরুজ্জামানের কাছে কানাঘুষা শুনেছিলাম যে, মুক্তিযুদ্ধের তিনজন ফোর্স কমান্ডার জিয়াউর রহমান[২২], কে এম সফিউল্লাহ ও খালেদ মোশাররফ[২৩] জোট বেঁধেছেন এম এ জি ওসমানী এবং এম এ রবের বিরুদ্ধে, যাতে তাঁরা সেনাবাহিনীর পদ ত্যাগ করে পার্লামেন্টের সদস্য হিসেবে রাজনৈতিক অঙ্গনেই থাকেন। তখন অবশ্য ওসমানীও মনে করেছিলেন বঙ্গবন্ধু তাঁকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেবেন। এসব বিষয় নিয়ে বেশ জল্পনাকল্পনা চলছিল। এর মধ্যে ওসমানীর সঙ্গে আলোচনা করে বঙ্গবন্ধু মোটামুটি ঠিক করেছিলেন যে, একজন উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তাকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান নিয়োগ করা হবে। তাঁদের আলোচনায় যে নামটি মুখ্য ছিল সেটা হচ্ছে খাজা ওয়াসিউদ্দিন[২৪]। তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশ না নিলেও বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই পাকিস্তান থেকে লন্ডনে চলে যান। সেখানে পৌঁছেই তিনি ঢাকায় তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ওসমানীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওসমানী সেনাপ্রধান হিসেবে প্রস্তাব করেন তাঁর বন্ধু ওয়াসিউদ্দিনের নাম। এ ব্যাপারে তিনি নাকি বেশ শক্ত অবস্থান নিয়েছিলেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তাঁর কথায় কান দেননি।

তথ্যনির্দেশ

১. *দৈনিক ইত্তেফাক,* ২৪ ডিসেম্বর ১৯৭১।
২. এমপিএ : মেম্বার প্রভিনশিয়াল অ্যাসেমব্লি বা প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য।
৩. এমএনএ : মেম্বার ন্যাশনাল অ্যাসেমব্লি বা জাতীয় পরিষদ সদস্য।
৪. *দৈনিক ইত্তেফাক,* ৭ জানুয়ারি ১৯৭২।
৫. সেনাবাহিনীতে যাঁরা ব্রিগেড কমান্ড করেন এবং ওই পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ফরমেশন কমান্ডার বলা হয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তখন গঠন পর্যায়ে ছিল। মুক্তিযুদ্ধকালে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর জন্য গঠিত তিনটি ফোর্সকে তখন ব্রিগেড হিসেবে গণ্য করা হয়। ফরমেশন কমান্ডারদের সভা বলা হলেও এতে তিন ফোর্সের অধিনায়ক, সেক্টর কমান্ডার এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া সেনা, বিমান ও নৌবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
৬. মুহাম্মদ আতাউল গনি [এম এ জি] ওসমানী : পরে জেনারেল ও মন্ত্রী।
৭. *দৈনিক ইত্তেফাক,* ৩ জানুয়ারি, ১৯৭২।
৮. মুহাম্মদ খাদেমুল বাশার বীর উত্তম : ১৯৭১ সালে পাকিস্তান বিমানবাহিনীর ঢাকা বেসে কর্মরত ছিলেন। মে মাসের প্রথমার্ধে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। জুলাই মাস থেকে ৬ নম্বর সেক্টরের অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য তাঁকে বীর উত্তম খেতাবে ভূষিত করে। পরে এয়ার ভাইস মার্শাল এবং বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর প্রধান। ১৯৭৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর ঢাকায় প্রশিক্ষণ বিমান দুর্ঘটনায় নিহত।
৯. চিত্তরঞ্জন (সি আর) দত্ত বীর উত্তম : ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে মেজর পদে কর্মরত থাকা অবস্থায় ছুটিতে ছিলেন। ২৭ মার্চ মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। বৃহত্তর সিলেটে সশস্ত্র প্রতিরোধযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তী সময়ে ৪ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য তাঁকে বীর উত্তম খেতাবে ভূষিত করে। পরে পর্যায়ক্রমে মেজর জেনারেল এবং বাংলাদেশ রাইফেলসের (বিডিআর, এখন বিজিবি) প্রথম মহাপরিচালক।
১০. লেফটেন্যান্ট কর্নেল ডি কে দাস ভারতীয় সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা ছিলেন।
১১. কাজী নূরুজ্জামান বীর উত্তম : পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল। ১৯৭১ সালের ৩০ মার্চ মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার পর দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেজিমেন্টের সঙ্গে হবিগঞ্জের তেলিয়াপাড়ায় যান। সেখানে অনুষ্ঠিত ৪ এপ্রিলের সভায় তিনি যোগ দেন। এরপর মুক্তিবাহিনীর কেন্দ্রীয় দপ্তরে কাজ করেন। সেপ্টেম্বর মাস থেকে ৭ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার তাঁকে বীর উত্তম খেতাব প্রদান করে। মৃত্যু ২০১১। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে আমৃত্যু সোচ্চার ছিলেন।

১২. মুহাম্মদ আবুল (এম এ) মঞ্জুর বীর উত্তম : ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মেজর ছিলেন। তখন পশ্চিম পাকিস্তানে (বর্তমান পাকিস্তান) কর্মরত ছিলেন। পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। আগস্ট মাস থেকে ৮ নম্বর সেক্টরের অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য তাঁকে বীর উত্তম খেতাবে ভূষিত করে। পরে পর্যায়ক্রমে মেজর জেনারেল। ১৯৮১ সালে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান (বীর উত্তম) হত্যার ঘটনায় উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নিহত।

১৩. রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম : ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন এবং প্রেষণে ইপিআরের চট্টগ্রাম সেক্টরের অ্যাডজুট্যান্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ২৫ মার্চ মধ্যরাতে তাঁর নেতৃত্বে বাঙালি ইপিআর সদস্যরা বিদ্রোহ করে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বাংলাদেশে সামরিক ব্যক্তিদের মধ্যে তিনিই প্রথম বিদ্রোহ করেন। চট্টগ্রাম অঞ্চলের সশস্ত্র প্রতিরোধযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা অনন্য। পরে ১ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখার জন্য তাঁকে বীর উত্তম খেতাবে ভূষিত করে। ১৯৯১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা এবং ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী ছিলেন।

১৪. জাতীয় মিলিশিয়া সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকারের ঘোষণা। পরিশিষ্ট ২ দেখুন।

১৫. টাঙ্গাইল মুক্তিবাহিনী স্বাধীনতার পর 'কাদেরিয়া বাহিনী' হিসেবে পরিচিতি পায়। এই বাহিনীর সামরিক প্রধান ছিলেন আবদুল কাদের সিদ্দিকী। বেসামরিক প্রধান ছিলেন লেখক আনোয়ার উল আলম।

১৬. সৈয়দ আহমেদ ফারুক ১৯৭০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদের নির্বাচিত সহসভাপতি ছিলেন। বর্তমানে ব্যবসায়ী।

১৭. ঢাকার রমনা পার্কের পাশে এর অবস্থান। পাকিস্তান শাসনামলে ব্রিটেনের রানির বাংলাদেশ সফরের আগে তাঁর থাকার জন্য এ বাড়িটি নির্মিত হয়। পরে এটি প্রেসিডেন্ট হাউস হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এটি ছিল প্রেসিডেন্ট হাউস। স্বাধীনতার পর নাম রাখা হয় 'গণভবন'। বর্তমানে এ ভবনটির নাম সুগন্ধা। এখন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮. এ এন এম নূরুজ্জামান বীর উত্তম: ১৯৬৭ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে ক্যাপ্টেন পদে কর্মরত ছিলেন। তখন আরও কয়েকজনের সঙ্গে আগরতলা ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে আটক হন। তাঁকে এই মামলার আসামি করা হয়। তিনি ছিলেন ২৮ নম্বর আসামি। ১৯৬৯ সালে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে মুক্তি পান। কিন্তু চাকরিচ্যুত হন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে যুদ্ধে যোগ দেন। সেপ্টেম্বর মাস থেকে ৩ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধকালে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হন এবং মেজর পদে পদোন্নতি পান। পরে পর্যায়ক্রমে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ও বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯. কাজী মুহাম্মদ (কে এম) সফিউল্লাহ বীর উত্তম: ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মেজর ও দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের উপ-অধিনায়ক ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ২৯ মার্চ বিদ্রোহ করেন। মুক্তিযুদ্ধকালে লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদে পদোন্নতি পান। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখার জন্য তাঁকে বীর উত্তম খেতাব প্রদান করে। পরে পর্যায়ক্রমে মেজর জেনারেল ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান হন। তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম সেনাপ্রধান। ১৯৭৫ সালের ২৪ আগস্ট পর্যন্ত তিনি সেনাপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনার ছিলেন।

২০. সংক্ষেপে ইপিআর। মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তান সরকার ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের পরিবর্তে 'ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্স' নামে নতুন একটি বাহিনী গঠন করেছিল। সংক্ষেপে এর নাম ছিল ইপিসিএএফ বা ইপিকাফ।

২১. মুহাম্মদ আবদুর রব বীর উত্তম: পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল। ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে হবিগঞ্জ এলাকা থেকে নির্বাচিত হন। মুক্তিযুদ্ধকালে মুক্তিবাহিনীর চিফ অব স্টাফ ছিলেন। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার তাঁকে মেজর জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি দেয় এবং মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখার জন্য বীর উত্তম খেতাবে ভূষিত করে।

২২. জিয়াউর রহমান বীর উত্তম: ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মেজর ও অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের উপ-অধিনায়ক। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ২৫ মার্চ মধ্যরাতে (তখন ঘড়ির কাঁটা অনুসারে ২৬ মার্চ) বিদ্রোহ করেন। ২৭ ও ২৮ মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। মুক্তিযুদ্ধকালে লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদে পদোন্নতি পান। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতার পর মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখার জন্য বাংলাদেশ সরকার তাঁকে বীর উত্তম খেতাব দেয়। ১৯৭৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সালের ২৪ আগস্ট সেনাপ্রধান নিযুক্ত হন। পর্যায়ক্রমে লেফটেন্যান্ট জেনারেল, উপসামরিক আইন প্রশাসক, সামরিক আইন প্রশাসক এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হন। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) প্রতিষ্ঠাতা। রাষ্ট্রপতি থাকা অবস্থায় ১৯৮১ সালে ৩০ মে চট্টগ্রামে নিহত।

২৩. খালেদ মোশাররফ বীর উত্তম : ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মেজর ও চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের উপ-অধিনায়ক। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ২৭ মার্চ বিদ্রোহ করেন। মুক্তিযুদ্ধকালে লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদে পদোন্নতি পান। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা অসামান্য। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য তাঁকে বীর উত্তম খেতাবে ভূষিত করে। পরে পর্যায়ক্রমে মেজর জেনারেল। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর এক অভ্যুত্থানে তিনি নেতৃত্ব দেন। ৪ নভেম্বর সেনাপ্রধান নিযুক্ত হন। ৭ নভেম্বর পাল্টা অভ্যুত্থানের ঘটনায় নিহত।

২৪. খাজা ওয়াসিউদ্দিন : ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট জেনারেল। মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানে ছিলেন। স্বাধীনতার কিছুদিন আগে লন্ডনে চলে যান। ১৯৭৩ সালের ২ অক্টোবর দেশে আসেন। পরে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠন

পিলখানার ঘটনার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং সরকারি নীতিনির্ধারকরা হয়তো মনে করেছিলেন, অবলুপ্ত ইপিআর আর মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের সমন্বয়ে জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করা ঠিক হবে না। কারণ, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া যুবসমাজের সঙ্গে সীমান্ত রক্ষীদের মন ও মানসিকতার মিল হবে না। উভয় পক্ষই বীরবিক্রমে মুক্তিযুদ্ধ করলেও তাদের মধ্যে ঘন ঘন বিরোধ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যাবে। তাই বঙ্গবন্ধু সিদ্ধান্ত নেন, মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের নিয়ে আলাদা একটি বাহিনী এবং ইপিআরের সদস্যদের নিয়ে শুধু সীমান্ত পাহারার জন্য বাংলাদেশ রাইফেলস (বিডিআর) গঠন করবেন। কালবিলম্ব না করে মন্ত্রিপরিষদের পরবর্তী সভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি দুটো আলাদা বাহিনী গঠনের ব্যবস্থা করেন।

নতুন বাহিনীর নাম নিয়ে তখন অনেক আলাপ-আলোচনা হয়। ন্যাশনাল সিকিউরিটি ফোর্স, ন্যাশনাল গার্ড, আর্মড পুলিশ ইত্যাদি অনেক নাম বিবেচনায় ছিল। এ সময় নতুন বাহিনীর পরিচালক নূরুজ্জামানের মাধ্যমে আমরা সুপারিশ করি যে নামটা যেন বাংলায় হয়। শেষ পর্যন্ত সরকারও বাংলা নামকরণের সিদ্ধান্ত নেয়। অনেক আলোচনার পর নতুন বাহিনীর নাম ঠিক করা হয় জাতীয় রক্ষীবাহিনী (জেআরবি)। আজ বলতে দ্বিধা নেই, বাংলায় নাম রাখার সুপারিশ করা হয়তো তখনকার জন্য সঠিক ছিল না। কোনো সশস্ত্র বাহিনীর নাম বাংলায় হতে পারে, এটা বেশির ভাগ বাঙালির ধারণার বাইরে ছিল। শত শত বছর পরাধীন থেকে বাঙালি সব সময়ই শুনে এসেছে ফারসি, আরবি বা ইংরেজি নাম, যেমন: আর্মি, নেভি, এয়ারফোর্স, পুলিশ, মুজাহিদ, আনসার ইত্যাদি। এসব নামের মধ্যে অনেকের কাছে বাংলা নামটা বেখাপ্পা লেগেছে। স্বাধীনতার পর শুধু মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে হঠাৎ একটা নতুন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাহিনী গঠিত হওয়ার ব্যাপারটি তখন অনেকে ভালো চোখে দেখেননি। এর পেছনে একটা কারণও ছিল। ইচ্ছা থাকলেও নানা কারণে অনেকে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে পারেননি। আবার অনেকে যোগ দেননি সুযোগ থাকা সত্ত্বেও। স্বাধীনতার পর তাঁদের মনে একধরনের হীনম্মন্যতা সৃষ্টি হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে বাহিনী গঠনের বিষয়টি খুব ভালো মনে হয়নি তাদের। কারণ, এই বাহিনীতে তাদের প্রবেশের সুযোগ তখন সীমিত ছিল। এ ছাড়া কিছু বাঙালি পাকিস্তানিদের প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা না করলেও মনেপ্রাণে পাকিস্তানি ধ্যানধারণায় বিশ্বাসী ছিল। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ নামের নতুন এই দেশটাকে বিশেষত, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা ইত্যাদি আদর্শকে স্বীকার করে নিতে তাদের কষ্ট হচ্ছিল। তাই নতুন একটা বাহিনী গড়ার খবর তাদের কাছে মোটেই সুখকর ছিল না।

জাতীয় রক্ষীবাহিনী বিলুপ্ত (১৯৭৫) হওয়ার বহু বছর পর এর কর্মকাণ্ড নিয়ে লিখতে বসে মনে হচ্ছে, বাহিনীর নাম ইংরেজিতে হলে দুর্নামটা হয়তো অত বেশি হতো না। মানুষ ধরেই নিত, অন্যান্য বাহিনীর মতোই কাজ করেছে এই বাহিনী। রক্ষীবাহিনীর কাজটা এখন অনেকটা ইংরেজি নামধারী র‍্যাব (র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন) করছে। কিন্তু র‍্যাবের দুর্নাম তখনকার মতো তাড়াতাড়ি ছড়াচ্ছে না। কারণ, দেশ স্বাধীন হওয়ার চার দশক পর স্বাধীনতাবিরোধী গোষ্ঠীর অনেকেই পরলোকে। বাকিরা এত বছরে নতুন নতুন সংগঠন দেখে অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

এখন একটা কথা ভেবে সন্তোষ অনুভব করি যে আমাদের কয়েকজনের সুপারিশে বাহিনীর নাম বাংলায় 'জাতীয় রক্ষীবাহিনী' দেওয়া হয়েছিল। এর পর মানুষের ধারণা হলো যে, বাংলাদেশে সশস্ত্র বাহিনীর নাম বাংলায় হতে পারে। এখন অনেক ক্ষেত্রে আর্মিকে সেনাবাহিনী, নেভিকে নৌবাহিনী ও এয়ারফোর্সকে বিমানবাহিনী বলা হচ্ছে। এসব বাহিনীর বাংলা নাম ব্যবহারের পেছনে আমরা কিছুটা হলেও কৃতিত্ব দাবি করতে পারি।

যা হোক, বাংলাদেশ সরকারের নেওয়া সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৭২ সালের ৮ মার্চ 'দ্য জাতীয় রক্ষীবাহিনী অর্ডার ১৯৭২' ইংরেজি ভাষায় সরকারি গেজেটে[১] প্রকাশিত হয়। এই আদেশের ৮ নম্বর অনুচ্ছেদে বাহিনীর তিনটি মুখ্য দায়িত্বের কথা উল্লেখ করা হয়। এগুলো ছিল :

> 8. (1) The Bahini shall be employed for the purpose of assisting the civil authority in the maintenance of internal security when required by such authority as may be described.
>
> (2) The Bahini shall render assistance to the Armed Forces

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

when called upon by the Government to do so in circumstances and in such manner as may be prescribed.

(3) The Bahini shall perform such other functions as the Government may direct.

২ নম্বর উপধারা নিয়ে তখন বিভিন্ন মহলে সংশয় দেখা দেয়। সাধারণত সেনাবাহিনী সরকারকে সহায়তা করে। কিন্তু এই বাহিনী সেনাবাহিনীকে সহায়তা করবে, এটা অনেকের বোধগম্য হয়নি। যুবসমাজ ও মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে গড়া বাহিনীর চেয়ে দেশরক্ষায় কে বেশি বীরত্ব ও মমত্ব প্রদর্শন করবে, সেটা তাঁরা চিন্তা করেননি।

সরকারিভাবে রক্ষীবাহিনী গঠনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হওয়ার পর বাহিনীর পরিচালক পদে সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা মেজর এ এন এম নূরুজ্জামানকে এবং সহকারী পরিচালক পদে সরোয়ার হোসেন মোল্লা ও আমাকে সরকারিভাবে পুনর্নিয়োগ দেওয়া হয়। অপর দিকে একই সময় (৩ মার্চ ১৯৭২) বাংলাদেশ রাইফেলস গঠনের জন্যও আরেকটি অধ্যাদেশ জারি করা হয়। বাংলাদেশ রাইফেলসের মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ পান লেফটেন্যান্ট কর্নেল সি আর দত্ত।

জাতীয় রক্ষীবাহিনী কাগজ-কলমে গঠিত হলেও এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোনো স্থান নির্ধারণ করা হয়নি। কাজটা সহজও ছিল না। তখন রাজধানী ঢাকায় কুর্মিটোলা সেনানিবাস, পিলখানায় বাংলাদেশ রাইফেলসের ব্যারাক ও রাজারবাগে পুলিশ ব্যারাক ছাড়া সরকারের কাছে আর কোনো বড় ভবন, ব্যারাক বা জায়গা ছিল না, যেখানে একটা বাহিনীর প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম শুরু করা যায়। ফলে ঠিক করা হয় যে, নতুন একটা জায়গা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত রক্ষীবাহিনী অস্থায়ীভাবে পিলখানার একটি অংশ কার্যালয়, প্রশিক্ষণকেন্দ্র, অস্ত্রাগার ও ব্যারাক হিসেবে ব্যবহার করবে।

জাতীয় মিলিশিয়া থেকে জাতীয় রক্ষীবাহিনীতে যোগ দেওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করে একটি শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে আসতে আমরা তখন ভীষণ ব্যস্ত। আমাদের অবস্থা অনেকটা 'ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার'-এর মতো। একটা বাহিনী গড়তে যা দরকার, তার কিছুই নেই আমাদের। প্রথমেই আমরা জাতীয় মিলিশিয়ায় যোগ দিতে আসা মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে যাঁরা জাতীয় রক্ষীবাহিনীতে যোগ দিতে আগ্রহী তাঁদের একটা তালিকা তৈরি করি। এ সময় জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনীতে যোগ দিতে আসা মুক্তিযোদ্ধারা কী করবেন, তা নিয়ে কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে যান। কারণ, মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর যুবক ছিল। যেমন :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক. সেনাবাহিনীর প্রাক্তন ও চাকরিরত সদস্য, যাঁরা নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর (পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিদ্রোহী সেনা ও আধা সামরিক ইপিআরের বাঙালি সেনাদের সমন্বয়ে গঠিত) বাইরে গণবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন।

খ. বেসামরিক প্রশাসনের চাকরিরত সদস্য। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তাঁরা চাকরির মায়া ছেড়ে সশস্ত্র যুদ্ধে যোগ দেন। গণবাহিনীর সদস্য হিসেবে যুদ্ধ করেন তাঁরা।

গ. বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল-কলেজের ছাত্র। তাদের বেশির ভাগই গণবাহিনীর সদস্য ছিল। স্বাধীনতার পর তারা লেখাপড়ায় ফিরে যাবে, না চাকরি করবে, এ নিয়ে বেশ দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিল।

ঘ. গণবাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের বাকি অংশ ছিল বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার যুবক, যাঁদের চাকরির দরকার ছিল।

জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনীতে যোগ দিতে আসা মুক্তিযোদ্ধারা সবাই চিন্তাভাবনা করে যাঁর যাঁর মতো করে সিদ্ধান্ত নেন। অনেকে আগের চাকরিতে বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফিরে যান। যাঁদের শিক্ষাজীবন শেষ, তাঁরা এবং অন্য অনেকেই রক্ষীবাহিনীতে যোগ দিতে আগ্রহী হন। আমরা তাঁদের তালিকা তৈরি করলাম। কারণ, এই তালিকার ওপর ভিত্তি করেই তাঁদের নিয়োগ দেওয়া হবে। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে যাঁরা অস্ত্রসহ জাতীয় মিলিশিয়ায় যোগ দিতে এসেছিলেন, তাঁদের সেসব অস্ত্রের তালিকা করার পর সেগুলো সদ্য প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ রাইফেলসের অস্ত্রাগারে রাখা হয়।

পরিচালক এ এন এম নূরুজ্জামান প্রতিদিন সন্ধ্যার পর সরোয়ার ও আমাকে নিয়ে বসতেন এবং পরবর্তী সময়ে কী কী করতে হবে এবং কীভাবে করতে হবে, তা বুঝিয়ে দিতেন। মাঝে মাঝে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতেন এবং আমাদের মতামত নিতেন। জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা বহু সমস্যার সম্মুখীন হই। দেখা গেল, পিলখানায় কিছু ব্যারাক পাওয়া গেছে, মুক্তিযোদ্ধারা সেখানকার ফ্লোরে ঘুমাচ্ছেন। তাঁদের কোনো বিছানাপত্র নেই। এসব কিছুর ব্যবস্থা করার জন্য কোনো অর্থই তখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এরকম অবস্থায় কেবল মুক্তিযোদ্ধারাই থাকতে পারেন। কারণ, মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁরা বিছানা ছাড়াই ঘুমিয়েছেন।

কয়েক দিন পর পরিচালক নূরুজ্জামান আমাকে বললেন, ভারত সরকার একটি মালবাহী বিমানে নানা ধরনের সামগ্রী পাঠিয়েছে বাংলাদেশ পুলিশের জন্য। সেগুলো তেজগাঁও বিমানবন্দরে আছে। সেখান থেকে কিছু সামগ্রী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রক্ষীবাহিনীকে দেওয়া হবে। তিনি আমাকে সেগুলো বিমানবন্দর থেকে আনার জন্য বললেন।

তখন রক্ষীবাহিনীর নিজস্ব কোনো বাহন ছিল না। পুলিশের আইজি আবদুল খালেকের সহায়তায় আমাদের পরিচালক বাহিনীর কাজে ব্যবহারের জন্য কয়েকটা ট্রাক সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু সেগুলো চালানোর জন্য তখনো কোনো চালক পাওয়া যায়নি। পরিচালক আমাকে বললেন, যেভাবেই হোক চালক সংগ্রহ করে ওই ট্রাক নিয়ে অনতিবিলম্বে বিমানবন্দরে যেতে হবে। কিন্তু কোনো ট্রাকচালক পাওয়া গেল না।

আমার হালকা গাড়ি চালানোর অভিজ্ঞতা ছিল। বাধ্য হয়ে আমি নিজেই চালকের আসনে উঠে বসলাম। আমার সঙ্গে ছিলেন লুৎফর রহমান, আকতারুজ্জামানসহ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা। তাঁদের নিয়ে বিমানবন্দর অভিমুখে রওনা হলাম। জীবনে প্রথমবারের মতো ট্রাক চালাতে গিয়ে বুঝতে পারলাম মোটামুটি চালাতে পারি। বিমানবন্দরে পৌঁছে দেখি, রক্ষীবাহিনীর মালামালের কার্টনগুলো এক পাশে রেখে ঢাকার পুলিশ সুপার হাবিবুর রহমান আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। মালামাল ট্রাকে তোলার সময় বোঝা গেল, সব জিনিস একবারে নেওয়া যাবে না। এক ট্রাক মালামাল নিয়ে তা পিলখানায় রেখে আবার বিমানবন্দরে গেলাম। এভাবে দুই ট্রাক মালামাল পেলাম আমরা।

এখানে পুলিশ সুপার হাবিবুর রহমান সম্পর্কে কিছু কথা না বললেই নয়। ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকার সুবাদে ১৯৬২ সাল থেকে আমি নানা আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকেছি। এ কারণে বিভিন্ন সময় আমাকে পুলিশের মুখোমুখি হতে হয়েছে। তখন পুলিশের কনস্টেবল ও কর্মকর্তাদের দেখেছি ভিন্ন চোখে। অবশ্য তাঁদের মধ্যে টাঙ্গাইলে দুজন পুলিশ কর্মকর্তার অমায়িক ব্যবহারে আমরা মুগ্ধ ছিলাম। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন এ এফ এম শাহজাহান। ষাটের দশকের প্রথম দিকে তিনি ছিলেন টাঙ্গাইল মহকুমা পুলিশ কর্মকর্তা। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার সময় পুলিশ বাহিনীতে যোগ দেন। পরে স্বাধীন বাংলাদেশে তিনি পুলিশের আইজি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন। অপরজন সত্তরের দশকের শুরুতে ছিলেন টাঙ্গাইল জেলায় পুলিশ সুপার। তাঁর নাম এস বি জামান। তিনি বোধ হয় পরে অ্যাডিশনাল আইজি হিসেবে অবসরে যান।

কিন্তু ঢাকার পুলিশ সুপার হাবিবুর রহমানের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমার এত ভালো লেগেছিল যে ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। তিনি সস্নেহে আমাদের খুব কাছে টেনে নেন এবং সব রকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশের সব পুলিশ কর্মকর্তা যদি আবদুল খালেক, এ এফ এম শাহজাহান ও হাবিবুর রহমানের মতো হতেন, তাহলে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী সত্যিই এত দিনে জনসেবার একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতো। সত্যিকার অর্থে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের কাজে নিবেদিত থাকত।

তেজগাঁও বিমানবন্দরে হাবিবুর রহমান আমাদের বলেছিলেন, কার্টনের ভেতর কী আছে তা বোঝা যাচ্ছে না। কার্টনে কিছু লেখাও ছিল না। পিলখানায় নেওয়ার পর সেগুলো খুলে দেখা গেল তার মধ্যে রয়েছে কিছু খাকি ও জলপাই রঙের পোশাক, বুট, বেল্ট ইত্যাদি।

সামগ্রীগুলো আমরা পিলখানায় সমবেত রক্ষীবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বিতরণ করি। সবাইকে দেওয়া সম্ভব হয়নি। মুক্তিযোদ্ধারা খাকি পোশাক নেননি। বস্তুত খাকি পোশাক তাঁরা পরতে চাননি। পাকিস্তান সেনাবাহিনী খাকি পোশাক ব্যবহার করত বলে এ পোশাকের ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন বীতশ্রদ্ধ। দেখা গেল, বেশির ভাগ মুক্তিযোদ্ধার আগ্রহ জলপাই সবুজ রঙের পোশাকের প্রতি। ফলে তাঁদের মধ্যে জলপাই সবুজ রঙের পোশাক বিতরণ করা হয়। এভাবে জলপাই সবুজ রঙের পোশাক জাতীয় রক্ষীবাহিনীর নিজস্ব পোশাক হয়ে যায়। এই পোশাক যে পরবর্তী সময়ে সমালোচনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে, তখন সেটা বুঝতে পারিনি।

জাতীয় রক্ষীবাহিনীতে প্রথমে যাঁদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁদের জাতীয় একটি বাহিনীর উপযোগী করে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়। অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের প্রশিক্ষণের জন্য পরিচালক নূরুজ্জামান সেনাবাহিনীর কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত সুবেদার, নায়েব সুবেদার এবং হাবিলদারকে নিয়োগ দেন। ভারত সরকারও এ ব্যাপারে সহায়তা করতে আগ্রহ দেখায়। বাংলাদেশ সরকার এতে সম্মত হলে মেজর ত্রিবেদীর (তাঁর পুরো নাম এখন মনে নেই) নেতৃত্বে ভারতীয় সেনাবাহিনীর তিনজন কর্মকর্তা ও চার-পাঁচজন জেসিও এবং এনসিও ঢাকায় আসেন। তাঁরা আসার পর আরও সুশৃঙ্খলভাবে শুরু হয় প্রশিক্ষণের কাজ।

সহকারী পরিচালক হিসেবে আমার ওপর প্রশাসন ও অর্থ বিভাগের দায়িত্ব পড়ে। বিশেষ করে, বিভিন্ন পর্যায়ের রক্ষী সদস্যদের বেতন-ভাতা ঠিক করার কাজে। এসব কাজে আমি তেমন অভিজ্ঞ ছিলাম না। পরিচালকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আমি কাজ করতে থাকি।

দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে মুক্তিযোদ্ধারা জাতীয় রক্ষীবাহিনীতে যোগ দিতে আসতে থাকেন। তাঁদের মধ্যে মুজিব বাহিনী, টাঙ্গাইল মুক্তিবাহিনীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্তিযোদ্ধাসহ বিভিন্ন আঞ্চলিক বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধারাও ছিলেন। বিভিন্ন জেলা ও বিভিন্ন আঞ্চলিক বাহিনী থেকে আসা মুক্তিযোদ্ধাদের একটা সরকারি বাহিনীতে সমন্বিত করা চাট্টিখানি কথা ছিল না। সদ্য যুদ্ধ করা ছাত্র-যুবকেরা তখনো একটা শৃঙ্খলার মধ্যে আসেননি। এ জন্য তাঁদের মোটিভেশন করার জন্য পরিচালক সরোয়ার ও আমার ওপর বেশি নির্ভর করতেন।

সবচেয়ে কঠিন কাজ ছিল রক্ষীবাহিনীর খসড়া কাঠামোর ভিত্তিতে সাধারণ রক্ষী, অ্যাসিস্ট্যান্ট লিডার, ডেপুটি লিডার, সিনিয়র ডেপুটি লিডার পদে মুক্তিযোদ্ধাদের পদায়ন করা। শিক্ষা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে পদায়ন করা যেত। কিন্তু কীভাবে তা নির্ধারণ করা হবে এবং কারা তাঁদের নির্বাচন করবেন, সেসব বিষয়ে তখন আমাদের কোনো ধারণাই ছিল না। স্পষ্টভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, ব্যাপারটা আমরা বুঝতেই পারিনি। ফলে আমাদের মধ্যে অনভিজ্ঞতাপ্রসূত কিছু সংশয় দেখা দেয়। সে জন্য এসব কাজে আমাদের পরিচালক এ এন এম নূরুজ্জামান আইন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের যুগ্ম সচিব মনোয়ারুল ইসলামকে নিয়ে বিস্তারিত নীতিমালা তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। আসলে একেবারে শূন্য থেকে একটা বাহিনী সীমিত সম্পদ, অর্থ ও সময়ের মধ্যে গড়ে তোলা যে কত কঠিন কাজ, সেটা আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিলাম।

বাহিনীর নেতৃত্ব পর্যায়ে সরকারি কার্যপ্রণালি সম্পর্কে সরোয়ার ও আমি যে অনভিজ্ঞ ছিলাম, সে কথা আগেই বলেছি। এ জন্য অভিজ্ঞ একজনকে রক্ষীবাহিনীতে নিয়োগ দেওয়া হয়। তাঁর নাম আবুল হাসান খান[২]। তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর ছিলেন। স্বাধীনতার আগে অবসর নেন। তিনি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের[৩] কোর্সমেট এবং একসঙ্গে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি আমাদের বাহিনীর প্রশাসনিক কাজে পরিচালককে সহযোগিতা করতে থাকেন।

পরিচালক নূরুজ্জামান আরও কয়েকজন সেনা কর্মকর্তাকে রক্ষীবাহিনীতে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কর্মকর্তার অভাব ছিল। তখন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ঊর্ধ্বতন র‍্যাংকের কর্মকর্তা ছিলেন সর্বসাকল্যে ১৮-১৯ জন। স্বাধীনতার আগে একজন ছাড়া তাঁরা সবাই মেজর ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তাঁদের অনেকে পদোন্নতি পান। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে গড়ে তোলার কাজে তাঁরা দিনরাত কর্মব্যস্ত ছিলেন। কিছুসংখ্যক সেনা কর্মকর্তাকে তখন নবগঠিত বাংলাদেশ রাইফেলসে নিয়োগ করতে হয়। ফলে রক্ষীবাহিনীতে মেজর এ এন এম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নূরুজ্জামানকে ছাড়া আর কোনো সেনা কর্মকর্তাকে নিয়োগ দিতে প্রধান সেনাপতি এম এ জি ওসমানী রাজি ছিলেন না।

রক্ষীবাহিনীর কার্যক্রম শুরু হওয়ার কয়েক দিনের মধ্যে একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস এসে পড়ে। তখন আমরা হাজারো কাজে ব্যস্ত। কিন্তু স্বাধীন দেশে প্রথম শহীদ দিবস। সে জন্য পরিচালককে আমি অনুরোধ করি রক্ষীবাহিনীর পক্ষ থেকে যেন শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। তিনি সে দায়িত্ব আমাকেই দেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে কোনো বাহিনীর পক্ষ থেকে আমি প্রথম শহীদ মিনারে সামরিক কায়দায় পুষ্পমাল্য অর্পণ করি। এর ছবি সেদিন বিটিভিতে এবং পরের দিন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় দেখে বিভিন্ন বাহিনীর প্রধানেরা উৎসাহী হয়ে ওঠেন। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৭৩ সালের শহীদ দিবসে সব বাহিনীর প্রধান, এমনকি পুলিশ-প্রধানও শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। শহীদ দিবসে একটা নতুন কার্যক্রম অর্থাৎ শহীদ মিনারে বিভিন্ন বাহিনীর শ্রদ্ধা নিবেদনের ব্যাপারটির প্রচলন করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলাম।

এ সময় অর্থাৎ ২৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ সরকার সব মুক্তিবাহিনী বিলুপ্ত ঘোষণা করে। ফলে মুক্তিবাহিনী, মুজিব বাহিনী, টাঙ্গাইল মুক্তিবাহিনীসহ অন্যান্য আঞ্চলিক মুক্তিবাহিনীর সব কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়।

এরপর মুক্তিযোদ্ধারা রক্ষীবাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য ব্যাপক হারে ঢাকায় আসতে থাকেন। কিন্তু তাঁদের সবাইকে তখনই রক্ষীবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব ছিল না। তাঁরা অপেক্ষায় থাকেন। সারা দেশ থেকে আগে আসা মুক্তিযোদ্ধাদের চারটি ব্যাটালিয়নে ভাগ করে প্রশিক্ষণের কাজ চলতে থাকে। নিয়মিত কোনো বাহিনীতে যোগদানের পর নির্বাচিতদের (রিক্রুট) অস্ত্র চালনা ও আইনকানুন শেখানোর আগে প্রথমেই শৃঙ্খলা শিক্ষা দেওয়া হয়। সেটা শুরু হয় পিটি ও প্যারেড দিয়ে। এ জন্য প্রয়োজন হয় কমান্ড-সম্পৃক্ত শব্দাবলি। পাকিস্তান আমলে এগুলো ছিল ইংরেজি ও উর্দুতে। একদিন পরিচালক আমাকে জানান, রক্ষীবাহিনীতে কমান্ডের শব্দাবলি হবে বাংলাতে। তিনি ইংরেজিতে কমান্ডের শব্দাবলি লিখে আমাকে দিয়ে বললেন বাংলা করতে।

ছাত্রজীবনে আমি স্কাউট ছিলাম। ফলে নিয়মিত বাহিনীর প্যারেড ও কিছু কমান্ড-সম্পৃক্ত শব্দ আমার জানা ছিল। আমি সেগুলো দারুণ উৎসাহ নিয়ে বাংলা করতে শুরু করি। বাংলায় করা কমান্ড-সম্পৃক্ত শব্দগুলোর মধ্যে ছিল—'দ্রুত চলো', 'ডাইনে দেখো', 'সালাম জানাবে'; 'সা-লাম', 'আরামে দাঁড়াও', 'সাবধান' ইত্যাদি। প্রশিক্ষকদের মধ্যে বেশির ভাগ বাঙালি ছিলেন। তাঁদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্য বাংলা কমান্ড শেখা খুব সহজ ছিল, কিন্তু যাঁরা ভারত থেকে এসেছিলেন, তাঁদের এগুলো শিখতে একটু সময় লাগে। তবু বাংলা কমান্ড দিয়েই প্রশিক্ষণের কাজ চলতে থাকে। কমান্ডের শব্দাবলি বাংলায় হওয়ায় বাহিনীর সদস্যদেরও বেশ সুবিধা হয়। দারুণ উৎসাহে তাঁরা প্রশিক্ষণ নিতে থাকেন।

মুশকিল হলো একটা জায়গায়। সাধারণত পিটি ও প্যারেড করতে পোশাক-আশাক, বুট জুতা, পিটি জুতা, মোজা, বেল্ট ও ব্যারেটের (টুপি) পাশাপাশি অস্ত্রশস্ত্রও দরকার হয়; কিন্তু এসব কিছু তখন আমাদের ছিল না। মুক্তিযোদ্ধাদের জমা করা অস্ত্রের কিছু তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। সেগুলো পর্যাপ্ত ছিল না। প্রথমে সরকারের সিদ্ধান্ত ছিল যে রক্ষীবাহিনীর পোশাক অন্যান্য বাহিনীর মতো খাকি রঙের হবে। কিন্তু বাহিনীর সদস্যরা খাকি পোশাক পরতে রাজি ছিলেন না। এ কথা আগেও বলেছি। আবার বাংলাদেশের কোথাও খাকি রঙের কাপড় তৈরি হতো না। এ ধরনের কাপড় বাজারে একসঙ্গে অনেক পাওয়াও যেত না। ১৯৭১ সালের আগে এগুলো পশ্চিম পাকিস্তানে তৈরি হতো। একটি অস্ত্র কারখানা ছাড়া তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে অর্থাৎ বাংলাদেশে সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত করার কোনো কারখানাই ছিল না।

দেখা গেল খাকি কাপড়ের অভাবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, পুলিশ এবং বাংলাদেশ রাইফেলসের সদস্যদেরও নতুন পোশাক দেওয়া যাচ্ছে না। এ অবস্থায় সরকার সিদ্ধান্ত নেয়, ভারত থেকে যে পোশাকই পাওয়া যায়, আপাতত সেটাই নেওয়া হবে। পরে খাকি অথবা অন্য কোনো রঙের পোশাকের ব্যবস্থা করা হবে।

এ সময় রক্ষীবাহিনী জলপাই সবুজ রঙের পোশাক নেওয়ায় একটি মহল সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। আমার মনে পড়ছে, মূলত দুটি পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে সমালোচনা হয়। একটা পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, ভারতের সেনাবাহিনীর পোশাক জলপাই রঙের। ভারতীয় সেনারা যাতে সহজেই বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারে, সে জন্য রক্ষীবাহিনীর পোশাক জলপাই রঙের করা হয়েছে। কিন্তু তারা চিন্তা করেনি যে আমাদের অপর প্রতিবেশী মিয়ানমারের সেনাবাহিনীও সামরিক পোশাক হিসেবে জলপাই রঙের কাপড় ব্যবহার করে।

আরেক দল সমালোচনাকারী ছিল যারা স্বাধীন বাংলাদেশকেই স্বীকার করতে পারেনি। বাধ্য হয়ে স্বীকার করলেও তাদের মনের গভীরে ছিল পাকিস্তানি আদর্শ। যেহেতু পাকিস্তান সেনাবাহিনী খাকি পোশাক পরত,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুতরাং তাদের ধারণায় ছিল দুনিয়ার সব সেনাবাহিনী খাকি পোশাক পরে।

রক্ষীবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত মুক্তিযোদ্ধারা অনেকেই শিক্ষিত ছিলেন। আবার অনেকে তেমন শিক্ষিত ছিলেন না। বিভিন্ন জেলা ও মহকুমা থেকে আসা এসব মুক্তিযোদ্ধা বিভিন্ন এলাকায় যুদ্ধ করেছেন। তাঁদের নেতৃত্ব দিয়েছেন বিভিন্ন বেসামরিক ব্যক্তি বা সামরিক কর্মকর্তা। এ রকম পরিস্থিতিতে সবাইকে একেবারে নতুন একটি সরকারি বাহিনীর শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে আসা ছিল ভীষণ একটা কঠিন কাজ। এই কাজটা করতে গিয়েই আমাদের সবচেয়ে বেশি বেগ পেতে হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধকালে সরোয়ার ও আমি দেশের ভেতরে থেকেই শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে স্থানীয় পর্যায়ে মুক্তিবাহিনী সংগঠিত করেছিলাম এবং নেতৃত্ব দিয়েছিলাম। মুক্তিযুদ্ধকালের এ অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আমরা ধীরে ধীরে মুক্তিযোদ্ধাদের শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে সক্ষম হয়েছিলাম।

বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে যাঁরা নেতৃস্থানীয় ও শিক্ষিত ছিলেন, তাঁরাও এ ব্যাপারে আমাদের সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। এঁদের মধ্যে পাবনার মোজাফফর হোসেন ও জাহেদুল ইসলাম; যশোরের আকরাম হোসেন, লুৎফর রহমান ও সৈয়দ রফিকুল ইসলাম; ফরিদপুরের রাখালচন্দ্র সাহা, সরদার মিজানুর রহমান ও আলমগীর হাওলাদার; কুষ্টিয়ার শেখ দলিল উদ্দিন ও আলিমুজ্জামান জোয়ারদার; টাঙ্গাইলের তায়েব উদ্দিন খান ও নূরুল হক তালুকদার; বরিশালের আখতারুজ্জামান ও মহিউদ্দিন আহমেদ; খুলনার শরীফ ওয়ালিউর রহমান, মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ ও দীপককুমার হালদার; ময়মনসিংহের সাখাওয়াত হোসেন, ওয়াসিকুল আজাদ ও আনোয়ারুল ইসলাম; রংপুরের এ কে এম আবদুল আজিজ ও শরিফুল ইসলাম; চট্টগ্রামের আইনুল কামাল এবং ঢাকার মঈনউদ্দিন চৌধুরী ও সিরাজুল হক দেওয়ান উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।

একেবারে শূন্য থেকে একটা বাহিনী গড়ে তোলা শুধু কঠিন কাজ নয়, এর জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত সময়ও। কিন্তু যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন দেশে সরকারের দরকার যত দ্রুত সম্ভব আইনশৃঙ্খলা-পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা, যাতে দেশ পুনর্গঠনের কাজ নিরাপদে শুরু করা যায়। আইনশৃঙ্খলা ছাড়াও সরকারের সামনে আরেকটি বড় সমস্যা দেখা দেয়, সেটা হচ্ছে অর্থাভাব। কলকারখানা বন্ধ, পশ্চিম পাকিস্তানি মালিকেরা পালিয়েছেন; কেন্দ্রীয় ব্যাংকে কোনো বৈদেশিক মুদ্রা বা সোনা নেই। কারণ, পরাজিত পাকিস্তানিরা আত্মসমর্পণের আগেই সবকিছু পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করে বা পুড়িয়ে দেয়। অন্যান্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাংকেরও একই অবস্থা। এই সময় কপর্দকহীন অবস্থায় সরকার পরিচালনা দুরূহ হয়ে ওঠে। তবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও কয়েকটি উন্নত দেশ পুনর্গঠনের কাজে বাংলাদেশকে সহযোগিতা দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসে। এতে সরকারের প্রশাসনিক মহলে একটু স্বস্তি আসে এবং দেশ পুনর্গঠনের কাজ নতুন উদ্যমে শুরু হয়।

পরিচালক এ এন এম নূরুজ্জামান সরোয়ার হোসেন মোল্লা ও আমাকে তাঁর সঙ্গে রাখেন। তিনি একটা নিয়মিত বাহিনীর বিভিন্ন কাজ কীভাবে করতে হয়, তা হাতে-কলমে শেখাতে থাকেন। বাহিনীর শৃঙ্খলা, প্রশাসনিক কাজকর্ম, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিশেষ করে অর্থ মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয় ও পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে বিভিন্ন কাজে যোগাযোগ রক্ষা ও সহযোগিতা গ্রহণ এবং চিঠিপত্র লেখা, উত্তর দেওয়া ইত্যাদি কাজে লাগান। আমরাও দারুণ উৎসাহে কাজ শিখতে থাকি। আমাদের একটা সুবিধা ছিল যে দেশের প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে আমরা ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম এবং তাঁদের সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক ছিল। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে সব ধরনের যোগাযোগ রক্ষা করতেন পরিচালক নিজেই। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন, জাতীয় রক্ষীবাহিনীকে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের অধীনে রাখা হয়েছিল।

পিলখানায় তখন কয়েক হাজার মুক্তিযোদ্ধা জাতীয় রক্ষীবাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য নাম লেখান। প্রায় প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে মুক্তিযোদ্ধারা রক্ষীবাহিনীতে যোগ দিতে আসতে থাকেন। তাঁদের খাবারের ব্যবস্থা করতে গিয়ে আমাদের বেহাল দশা। প্রথম দিকে মিলিশিয়া ক্যাম্প থাকা অবস্থায় ঢাকার জেলা প্রশাসন থেকে সামান্য অর্থ দেওয়া হতো। কিন্তু মিলিশিয়ার জায়গায় বাংলাদেশ রাইফেলস (বিডিআর) ও জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে যত অসুবিধা, সব হলো জাতীয় রক্ষীবাহিনীর। ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের কাঠামো, বাজেট ইত্যাদি তো পাকিস্তান আমলেই ছিল। নতুন দেশে নতুন নামে নতুন অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে তাদের কাজ করতে অসুবিধা হলো না।

এ সময় অধুনালুপ্ত ইপিআরের একজন বড় সরবরাহকারী এম এফ করিম আমাদের সহায়তায় এগিয়ে এলেন। সরকারের প্রয়োজনীয় আদেশ ও অর্থ মঞ্জুরি আসবে—এই আশায় তিনি খাবার সরবরাহ করতে থাকলেন। কারণ, জাতীয় রক্ষীবাহিনী অধ্যাদেশ ১৯৭২ ইতিমধ্যে জারি হয়ে গিয়েছিল। তাতে করে আমাদের একটু স্বস্তির কারণ ঘটল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেশির ভাগ মুক্তিযোদ্ধা এক কাপড়ে বিভিন্ন জেলা বা মহকুমা থেকে এসেছিলেন। পরার জন্য একের বেশি পোশাক তাঁদের ছিল না। ছিল না কেনার ক্ষমতাও। সরকারের অর্থ মঞ্জুরির অভাবে তাঁদের সবার জন্য পোশাক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী দেওয়া সম্ভব ছিল না। পরিচালক একটা প্রাথমিক বাজেট তৈরি করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ও মঞ্জুরির জন্য বারবার চিঠি লিখছেন, কিন্তু কোনো উত্তর আসে না। একবার তিনি অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এম এ রশিদের কাছে তাগিদ দেওয়ার জন্য সরোয়ার ও আমাকে সচিবালয়ে পাঠান। আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করি কিন্তু তিনি আমাদের কোনো গুরুত্বই দিচ্ছিলেন না। হাজার কয়েক মুক্তিযোদ্ধা যে খাদ্যাভাব, অর্থাভাব ও কাপড়চোপড়ের অভাবে কষ্ট পাচ্ছেন—এই বিষয়টি তাঁর কাছে কোনো গুরুত্বই পেল না। উপসচিব মুক্তিযোদ্ধা মামুন-উর-রশিদ[৪] মঞ্জুরির বিষয়টি ত্বরান্বিত করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সুপারিশ করলেও অতিরিক্ত সচিব এম এ রশিদকে অনড় মনে হলো। অগত্যা সরোয়ার ও আমি অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। এর দিন কয়েক পর দেখা গেল প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুরি এসেছে। আমরা স্পষ্টত দেখতে পাচ্ছিলাম, যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ না নিয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পাকিস্তানিদের সঙ্গে ছিলেন, তাঁরা মুক্তিযোদ্ধাদের কাজে লাগানোর ব্যাপারে সরকারের প্রতিটি উদ্যোগে বাধা সৃষ্টি করছেন।

এ-জাতীয় নানা ধরনের বাধা ও অসুবিধার মধ্যেও রক্ষীবাহিনীর প্রশিক্ষণ চলতে থাকে। এ সময় সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে ১৭ মার্চ (১৯৭২) বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ সফরে আসবেন। পরদিন ১৮ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) তাঁকে নাগরিক সংবর্ধনা জানানো হবে। সদ্য স্বাধীন দেশ। রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে ভারত সহায়তা দিয়েছে, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে তাঁর নিরাপত্তার বিষয়টি তখন স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় ইন্দিরা গান্ধীর নিরাপত্তার জন্য অন্যান্য বাহিনীর সঙ্গে জাতীয় রক্ষীবাহিনীকেও দায়িত্ব দেওয়া হয়। অথচ রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের তখন সবেমাত্র প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে, কোনো পোশাক নেই, বুট, বেল্ট, এমনকি ব্যারেট (টুপি) পর্যন্ত নেই। অথচ সরকারের নির্দেশ পালন করতেই হবে। মুক্তিযোদ্ধারা দেশের জন্য করতে পারেন না, এমন কাজ নেই। কোনো রকমে চৌকস রক্ষী সদস্যদের দিয়ে এক কোম্পানির মতো একটা দল গঠন করা হলো। যা ছিল তা-ই দিয়ে তাঁদের তৈরি করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলো। সবাইকে পোশাক ও একটা করে রাইফেল দেওয়া হলো এবং সত্যি সত্যি প্রশিক্ষণ শেষ না করেই দায়িত্ব দেওয়া হলো তাঁদের।

একজন অতিগুরুত্বপূর্ণ বিদেশি অতিথিকে নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব বলে কথা। তাই সেদিন পরিচালক নিজেই সরোয়ার ও আমাকে সঙ্গে নিয়ে রেসকোর্স ময়দানে যান। সব রক্ষী সদস্যকে তিনি দৃষ্টি সজাগ রেখে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিলেন। পুলিশ ও অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে মিলে রক্ষী সদস্যরা ভালোই দায়িত্ব পালন করেন। সেদিন রক্ষীবাহিনী সমবেত লাখ লাখ জনতার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। এটাই ছিল রক্ষীবাহিনীর প্রথম রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন। বিষয়টি রক্ষীবাহিনীর কর্মকর্তাদের (লিডার, ডেপুটি লিডার, অ্যাসিস্ট্যান্ট লিডার) দ্বিতীয় পাসিং আউট প্যারেড উপলক্ষে প্রকাশিত স্যুভেনিরে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়।

জাতীয় রক্ষীবাহিনীর দ্বিতীয় দায়িত্ব পালন ছিল ভিন্ন ধরনের—প্রথম স্বাধীনতা দিবস (২৬ মার্চ ১৯৭২) উপলক্ষে রেসকোর্স ময়দানে আয়োজিত সম্মিলিত প্যারেডে অংশগ্রহণ। রক্ষীবাহিনীর যে দলটি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সফরের সময় গঠন করা হয়েছিল, সে দলটিই ডেপুটি লিডার মো. লোকমান হোসেনের নেতৃত্বে ওই প্যারেডে অংশগ্রহণ করে। লোকমান হোসেন ১৯৭১ সালে হাবিলদার হিসেবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন দেশমাতৃকাকে স্বাধীন করার সেই যুদ্ধে।

প্রথম স্বাধীনতা দিবসের সম্মিলিত কুচকাওয়াজে রক্ষীবাহিনীর চৌকস দলটি যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করে। কুচকাওয়াজে রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের চৌকস ক্রিয়াকাণ্ডে মুগ্ধ হয়ে এম এ জি ওসমানী (তখনো তিনি বাংলাদেশের সব বাহিনীর সর্বাধিনায়ক; সদ্য জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছেন) সরকারের পক্ষ থেকে ভূয়সী প্রশংসা করে পরিচালককে একটি সরকারি চিঠি লেখেন। এ চিঠি আমাদের তো বটেই, রক্ষীবাহিনীর প্রতিটি সদস্যকেও প্রেরণা জোগায়।

রক্ষীবাহিনীর পরিচালক এ এন এম নূরুজ্জামানের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রক্ষী সদস্যদের দায়িত্ব পালনে যোগ্য করে গড়ে তোলা। সেই উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণের উপযুক্ত জায়গা তিনি খুঁজতে থাকেন। এ সময় তিনি সাভারে আনসার বাহিনীর একটি প্রশিক্ষণকেন্দ্রের খোঁজ পান। সেটি প্রায় অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে ছিল। তাঁর মনে হয়, সাময়িকভাবে সেটি রক্ষীবাহিনীর প্রশিক্ষণকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। সরকারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছে কেন্দ্রটি রক্ষীবাহিনীকে দেওয়ার প্রস্তাব দেন তিনি। তাঁর এ প্রস্তাব সরকার বিবেচনায় নেয়। পরে সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে এই মর্মে সিদ্ধান্ত হয় যে আনসার বাহিনীর কর্মকর্তাদের রক্ষীবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং সাভারের আনসার প্রশিক্ষণকেন্দ্র রক্ষীবাহিনীর অধীনে থাকবে। এই সিদ্ধান্তে রক্ষীবাহিনী ও বাংলাদেশ রাইফেলস উভয়েরই উপকার হয়। এরপর পিলখানায় প্রশিক্ষণরত রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের বেশির ভাগকেই সাভারে স্থানান্তর করা হয়। পিলখানায় বাংলাদেশ রাইফেলস দু-তিনটি ব্যারাক ছাড়া বাকি সবকিছু ব্যবহার করার সুযোগ পায়।

সাভার আনসার প্রশিক্ষণকেন্দ্রে তখন থাকার মতো পর্যাপ্ত ঘর বা ব্যারাক ছিল না। দ্রুত ওপরে টিন আর চারপাশে বাঁশ দিয়ে ছাপরা তৈরি করে প্রশিক্ষণরত সদস্যদের কোনো রকমে থাকার ব্যবস্থা এবং মাঠের জঙ্গল পরিষ্কার করে প্রশিক্ষণের কাজ শুরু করা হয়।

পিলখানায় রক্ষীবাহিনীর হাতে থাকা ব্যারাক সদর দপ্তর হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। সেখানে পরিচালকসহ কর্মকর্তাদের অফিসকক্ষ এবং কয়েকজনের থাকার ব্যবস্থা ছিল। মে মাসের দিকে সরকার রক্ষীবাহিনীর সদর দপ্তরের জন্য বিকল্প জায়গার ব্যবস্থা করে। শেরেবাংলা নগরে নির্মাণাধীন জাতীয় সংসদ ভবনের কাজে তদারকের জন্য নির্মিত পিডব্লিউডির অস্থায়ী কার্যালয় রক্ষীবাহিনীর সদর দপ্তর হিসেবে ব্যবহারের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়। এরপর পিলখানা থেকে রক্ষীবাহিনীর সদর দপ্তর স্থানান্তর করা হয় শেরেবাংলা নগরে। নতুন জায়গায় আগে থেকেই অবকাঠামোগত কিছু ব্যবস্থা ছিল। সেখানে পরিচালক এবং কয়েকজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার জন্য আলাদা অফিসকক্ষ ও জুনিয়র কর্মকর্তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। সদর দপ্তরের নিরাপত্তা ও অন্যান্য কাজের জন্য এক কোম্পানির মতো সদস্যও রাখা হয়।

রক্ষীবাহিনী গঠনের যাবতীয় কাজ এগিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু সদস্যদের শুধু প্রশিক্ষণ দিলেই চলবে না, নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তাঁদের মধ্য থেকে শিক্ষিত ও উপযুক্ত কয়েকজনকে বাছাই করাও প্রয়োজন। অর্থাৎ কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগের জন্য কয়েকজনকে নির্বাচন করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ সময় সরকারের মুখ্য সচিব (প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি) রুহুল কদ্দুসকে সভাপতি করে রক্ষীবাহিনীর কর্মকর্তা নির্বাচন কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি যথাযথ পরীক্ষা ও যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে ২১ জনকে রক্ষীবাহিনীর কর্মকর্তা, অর্থাৎ লিডার হিসেবে বাছাই করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

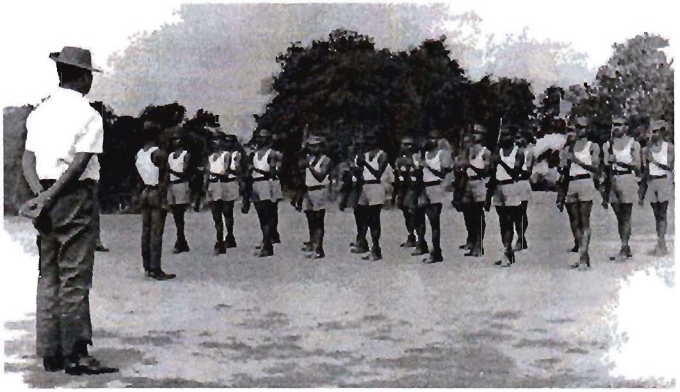

সাধারণ রক্ষীদের প্রশিক্ষণ দেখছেন লেখক (বাঁয়ে)

নির্বাচিত লিডার এবং উপ ও সহকারী লিডারদের মিলিটারি একাডেমির আদলে প্রশিক্ষণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু বাংলাদেশে মিলিটারি একাডেমির মতো কোনো প্রতিষ্ঠান তখন ছিল না। অবিভক্ত পাকিস্তানের মিলিটারি একাডেমি ছিল বর্তমান পাকিস্তানের কাকুলে। বাংলাদেশে তখনো মিলিটারি একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তখন নবগঠিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীরও পুনর্গঠনের কাজ চলছিল। পূর্বপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা সেনা কর্মকর্তা ও মুক্তিযুদ্ধকালে ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কিছুসংখ্যক নবীন সেনা কর্মকর্তাকে দিয়ে সে কাজ এগিয়ে নেওয়া হচ্ছিল। তাঁরা সবাই পুনর্গঠনের কাজে যথেষ্ট ব্যস্ত ছিলেন। অন্য বাহিনীর দায়িত্ব নেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অর্থাৎ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে রক্ষীবাহিনীর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের কোনো সুযোগ ছিল না। পুলিশ বাহিনীর অবস্থা ছিল তথৈবচ। তাদের সারদা পুলিশ একাডেমী থাকলেও তখন পর্যন্ত সেখানে পুলিশ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের কাজ শুরু করা যায়নি। ফলে সেখানে রক্ষী কর্মকর্তাদের পাঠানো সম্ভব হয়নি।

মুক্তিযুদ্ধকালে ভারতের টান্ডোয়ায় মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। এ অবস্থায় সেখানেই বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে ২১ জন লিডার আর কয়েকজন উপ (ডেপুটি) ও সহকারী (অ্যাসিস্ট্যান্ট) লিডারকে পাঠানো হয়। এ নিয়ে ওই সময় দেশের একশ্রেণীর সংবাদপত্রে কিছু কিছু সমালোচনা হয়। অথচ তখন বাস্তবতা ছিল এই যে, ভারত ছাড়া অন্য কোনো দেশে প্রশিক্ষণের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্য পাঠানোর মতো আর্থিক সংগতি সরকারের ছিল না। যাদের পরাজিত করে আমরা মুক্ত হয়েছি, সেই পাকিস্তানে রক্ষীবাহিনীর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানোর তো প্রশ্নই ওঠে না। ভারত ছাড়া অন্য কোনো দেশে তাদের পাঠালে সরকারের বিপুল টাকা ব্যয় হতো।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও ইপিআরের বিপুলসংখ্যক বাঙালি সৈনিক যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের নিয়মিত মুক্তিবাহিনী বলা হতো। মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর সৈনিকদের নেতৃত্ব দেওয়ার মতো উপযুক্ত বা যোগ্য সেনা কর্মকর্তার বেশ অভাব ছিল। একটি বাহিনীকে স্বাভাবিক সময়ে সুশৃঙ্খল এবং জরুরি সময়ে, বিশেষত যুদ্ধক্ষেত্রে, কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য যোগ্য নেতৃত্বের প্রয়োজন হয়। জুন মাসে মুক্তিযুদ্ধের সাংগঠনিক কার্যক্রম আনুষ্ঠানিক রূপ পেলে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর জন্য সেনাবাহিনীর আদলে কর্মকর্তা নির্বাচন (রিক্রুট) করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এর নাম দেওয়া হয়েছিল 'অফিসার্স ওয়ার কোর্স'। নির্বাচিতদের প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে ভারত সরকার তাদের সেনাবাহিনীর অধীনে মিলিটারি একাডেমির আদলে প্রশিক্ষণ দেয়। মুক্তিযুদ্ধকালে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর অফিসার্স কোর্সের দুটি ব্যাচের প্রশিক্ষণ হয়েছিল ভারতে। প্রথম ব্যাচ অর্থাৎ ফার্স্ট অফিসার্স ওয়ার কোর্সের নির্বাচিতরা অক্টোবর মাসে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীতে লেফটেন্যান্ট হিসেবে কমিশন পান। দ্বিতীয় ব্যাচের প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার আগেই দেশ স্বাধীন হয়ে যায়। স্বাধীনতার পর প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যাচের সবাইকেই নবগঠিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অবশ্য দু-তিনজন ব্যক্তিগত কারণে সেনাবাহিনীতে যোগ দেননি। মুক্তিযুদ্ধের সময় হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে ভারতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এতে কোনো সমস্যা হয়নি। কিন্তু রক্ষীবাহিনীর কর্মকর্তাদের ভারতে প্রশিক্ষণে পাঠানোয় বেশ সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়।

১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে রক্ষীবাহিনীর নির্বাচিত কর্মকর্তাদের ভারতে পাঠানোর কার্যক্রম শুরু হয়। আর সাধারণ রক্ষী সদস্যদের প্রশিক্ষণ সাভারে চলতে থাকে। এর মধ্যে সরকার সিদ্ধান্ত নেয়, রক্ষীবাহিনীর প্রথম ব্যাচের সদস্যদের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ জুন মাসের ২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। এই লক্ষ্যে সাভারে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা হয়। এর কিছুদিন আগে (৪ মে) সরকার সরোয়ার হোসেন মোল্লা ও আমাকে জাতীয় রক্ষীবাহিনীর উপপরিচালক হিসেবে পদোন্নতি দেয়। পরিচালক এ এন এম নূরুজ্জামানও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেফটেন্যান্ট কর্নেল হিসেবে পদোন্নতি পান। আমরা দুজন উপপরিচালক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার আগে মেজর আবুল হাসান খান নিয়োগ পেয়েছিলেন। পরিচালক বাহিনীর তিনজন উপপরিচালকের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করেন। আবুল হাসান খানকে উপপরিচালক (প্রশাসন), সরোয়ার হোসেন মোল্লাকে উপপরিচালক (অপারেশন) এবং আমাকে উপপরিচালকের (প্রশিক্ষণ) দায়িত্ব দেন। উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ) হিসেবে আমার ওপর সাভারের ট্রেনিং সেন্টারের দায়িত্ব থাকে। এ ছাড়া অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে সরোয়ার হোসেন মোল্লাকে ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগের জোনাল কমান্ডার এবং আমাকে চট্টগ্রাম ও খুলনা বিভাগের জোনাল কমান্ডার করা হয়।

আনসার বাহিনীকে বিলুপ্ত করে রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করার পর আনসারের তিনজন কর্মকর্তাকে সহকারী পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। তাঁরা হলেন এম এ হাসানাত, ফকির মোহাম্মদ ও তাইবুর রহমান। তাঁদের মধ্যে এম এ হাসানাতকে সাভার ট্রেনিং সেন্টারে, ফকির মোহাম্মদকে সদর দপ্তরে যানবাহন শাখায় এবং তাইবুর রহমানকে প্রশাসনে নিয়োগ দেওয়া হয়। তাঁদের প্রত্যেকের বয়স সরোয়ার ও আমার চেয়ে বেশি ছিল। কিন্তু তাতে আমাদের কাজ করতে অসুবিধা হয়নি। রক্ষীবাহিনীর সাধারণ সদস্যদের মধ্যে, যাঁদের সবাই মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, আনসারের ওই তিন কর্মকর্তাকে নিয়ে খানিকটা কানাঘুষা ছিল। কারণ, মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস তাঁরা আনসার বাহিনীর কর্মকর্তা হিসেবে পাকিস্তানিদের সঙ্গে কাজ করেছিলেন। তবে খোঁজ নিয়ে আমরা জেনেছিলাম, তাঁদের বিরুদ্ধে মারাত্মক কোনো অভিযোগ অর্থাৎ হত্যাকাণ্ডে সম্পৃক্ততার অভিযোগ ছিল না।

রক্ষীবাহিনীর প্রথম ব্যাচের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজের তারিখ নির্ধারিত হয় ১৯৭২ সালের ২১ জুন। এটা করতে গিয়ে দেখা গেল, কুচকাওয়াজের দিন পরার মতো পরিষ্কার পোশাক, বুট, ব্যারেট, বেল্ট ইত্যাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে নেই। এসব ছাড়া বাহিনীর সদস্যরা কুচকাওয়াজে অংশ নিতে পারবেন না। ফলে আমরা কিছুটা সমস্যায় পড়ে যাই। সমস্যার দ্রুত সমাধানও হয়। এ সময় খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বাছাই করতে ভারতে যায়। এই প্রতিনিধিদলের একজন সদস্য ছিলেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পরিচালক (অর্ডন্যান্স) লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম শওকত আলী৬। পুলিশ বাহিনীর তরফ থেকেও একই উদ্দেশ্যে আরেকটি প্রতিনিধিদল পাঠানো হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরকারের নির্দেশ পেয়ে জাতীয় রক্ষীবাহিনীর তরফ থেকেও একটি প্রতিনিধিদল পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়। জানুয়ারি মাসে অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রতিনিধিদল ভারত সফর করেছিল। সে সময় ভারত বাংলাদেশকে ২৫ কোটি রুপি ঋণ দিতে রাজি হয়। রক্ষীবাহিনীর পরিচালক এ এন এম নূরুজ্জামান শুধু আমাকে বাহিনীর পক্ষ থেকে ভারতে পাঠান। তিনি রক্ষীবাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের একটা তালিকা দেন আমাকে। তালিকাভুক্ত জিনিসগুলো এবং সেগুলোর মান সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না। পরিচালক শুধু আমাকে বলেছিলেন, ভারতীয় সেনাবাহিনীর দিল্লির কেন্দ্রীয় কমান্ডের কিউএমজি ব্রাঞ্চের কর্মকর্তা মেজর জেনারেল বি এন সরকারের কাছে তালিকাটি দিতে হবে। বি এন সরকার বাঙালি এবং মুক্তিযুদ্ধকালে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডে কর্মরত ছিলেন। এর সদর দপ্তর ছিল কলকাতা ফোর্ট উইলিয়ামে। তিনি মুক্তিবাহিনীকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেন। পরিচালক আমাকে আরও বলেন, ভারতীয় সেনাবাহিনীর স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার ব্রিজভূষণ ভাটনগর আমাকে বি এন সরকারের কাছে নিয়ে যাবেন।

পরিচালকের নির্দেশ অনুযায়ী আমি দিল্লিতে যাওয়ার জন্য তৈরি হলাম। বাংলাদেশ তখনো পাসপোর্ট দেওয়া শুরু করেনি। তাড়াহুড়ো করে এক পাতার একটি 'ট্রাভেল পারমিট' নিয়ে আমি দিল্লিতে যাই। স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের লেফটেন্যান্ট কর্নেল বাসুদেভা বিমানবন্দর থেকে আমাকে 'আকবর' হোটেলে নিয়ে যান। তিনি জানান, পরদিন ব্রিগেডিয়ার ব্রিজভূষণ ভাটনগর হোটেলে এসে আমাকে বি এন সরকারের কাছে নিয়ে যাবেন। ভাটনগর পরদিন নির্ধারিত সময়ে আমাকে হোটেল থেকে বি এন সরকারের কাছে নিয়ে যান। আমাদের পরিচালক নূরুজ্জামান আগেই তাঁর সঙ্গে টেলিফোনে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন। আমি শুধু পরিচালকের দেওয়া প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের তালিকা তাঁর কাছে হস্তান্তর করি এবং তাঁকে জানাই, যত দ্রুত সম্ভব জিনিসগুলো নিয়ে আমাকে দেশে ফিরতে হবে। আগেই বলেছি, বি এন সরকার বাঙালি ছিলেন, বাংলাদেশের ব্যাপারে বেশ আন্তরিক ছিলেন। তিনি অধস্তন কর্মকর্তাদের আমাদের চাহিদামতো জিনিসগুলো অতি দ্রুত দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

বি এন সরকারের সঙ্গে আলোচনার পর আমি ব্রিজভূষণ ভাটনগরের সঙ্গে স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের সদর দপ্তরে যাই। সেখানে দেখা হয় ওই বাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল এস এস উবানের সঙ্গে। ১৯৭১ সালে তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিএলএফ, অর্থাৎ মুজিব বাহিনীর প্রশিক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন। তখন তাঁর অধীনস্থ ফোর্সের পরিচালনায় টাঙোয়ায় রক্ষীবাহিনীর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ চলছিল। তাদের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে আমরা কথা বলি এবং খোঁজখবর নিই। জাতীয় রক্ষীবাহিনীর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণে সহযোগিতা দেওয়ার জন্য তাঁকে আমি ধন্যবাদ জানাই। এরপর আমি বাসুদেভার সঙ্গে হোটেলে ফিরে আসি।

দুই দিন পর বাসুদেভা আমাকে জানান, আমাদের জিনিসপত্র তৈরি আছে। মেজর জেনারেল বি এন সরকার চেষ্টা করছেন, যাতে একটা বিশেষ বিমানে জিনিসগুলো আজকেই ঢাকায় পাঠানো যায়। তিনি আরও জানান, বি এন সরকার তাঁকে বলেছেন আমাকে ডিফেন্স সার্ভিস ক্লাবে নিয়ে যেতে। সেদিন ছিল ছুটির দিন। গিয়ে দেখি, বি এন সরকার ক্লাবে সপরিবারে আছেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে দুপুরে খাওয়ার সময় খবর এল, বিমান তৈরি। বি এন সরকার জানতে চাইলেন, আমি বিশেষ বিমানেই ঢাকা যাব, নাকি আলাদাভাবে যাব। আমি তাঁকে জানালাম, বিশেষ বিমানেই যাব।

সেদিন কথা প্রসঙ্গে আমি বি এন সরকারের কাছে জানতে চাই, সেনাবাহিনীর জিনিসগুলো পাঠানো হয়েছে কি না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর না দিয়ে একটু থেমে আমাকে বললেন, ভারতীয় সেনাবাহিনীর তেমন কিছুই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পছন্দ হচ্ছে না। তবে তাঁরা আরও দেখছেন। যদি কোনো কিছু তাঁদের পছন্দ হয় তা যেগুলো তাঁরা নিতে চাইবেন, সেগুলোই তাঁদের দেওয়া হবে। তবে বাংলাদেশ পুলিশের চাহিদামতো অনেক কিছু দেওয়া যাবে বলে তিনি জানান। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি হোটেলে ফিরি। বিকেলবেলা বিমানবন্দরে যাই। রক্ষীবাহিনীর জিনিসগুলোসহ ভারতীয় বিমানবাহিনীর পরিবহন বিমান 'এএন ১২'-যোগে আমি ঢাকায় পৌঁছাই।

১৯৭২ সালের ২১ জুন বুধবার সকাল ১০টায় বাংলাদেশ সচিবালয়ের সামনে আবদুল গনি রোডে জাতীয় রক্ষীবাহিনীর প্রথম ব্যাচের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কুচকাওয়াজে সালাম গ্রহণ করেন। এদিন বিভিন্ন পত্রিকায় গুরুত্বসহকারে এ সম্পর্কে খবর প্রকাশিত হয়। প্রধান দৈনিক *ইত্তেফাক*-এ সংবাদ সংস্থা বাসস পরিবেশিত খবরে বলা হয় :

> আজ জাতীয় রক্ষীবাহিনীর জমায়েত : বঙ্গবন্ধুকে অভিবাদন জ্ঞাপন ও শহর প্রদক্ষিণ। আজ (বুধবার) সকাল ৯টায় বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েটের আবদুল গণি রোডে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় রক্ষীবাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ করিবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকাল ৭.৩০ মি. রক্ষীবাহিনী ঢাকা স্টেডিয়ামে জমায়েত হইবে। অতঃপর তাহারা 'মার্চিং কলাম' ও 'মুভিং কলাম'—এই দুই ভাগে ভাগ হইয়া যাইবে।

মার্চিং কলাম ফজলুল হক হল, রেলওয়ে হাসপাতাল, গুলিস্তান সিনেমা হলের সম্মুখ ভাগ হইয়া নবাবপুর, ইসলামপুর, চকবাজার, নাজিমুদ্দিন রোড ধরিয়া সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যাইয়া ছত্রভঙ্গ হইবে এবং মুভিং কলাম আবদুল গণি রোড, কার্জন হল, বাঙলা একাডেমী, পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট হাসপাতাল হইয়া এয়ারপোর্ট রোড, ফার্মগেট, দ্বিতীয় রাজধানী এলাকা, মীরপুর রোড ও নিউমার্কেট প্রদক্ষিণ শেষে সদর দফতরে প্রত্যাবর্তন করিবে।

এ উপলক্ষে প্রকাশিত হয় একটি স্যুভেনির। মাত্র তিন মাসের প্রশিক্ষণের পর মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে গঠিত এই বাহিনীর চৌকস কুচকাওয়াজ দেশবাসীকে মুগ্ধ করে। পত্রপত্রিকায় বাহিনীর সদস্যদের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। পরদিন এ খবরও দৈনিক পত্রিকায় গুরুত্বসহকারে ছাপা হয়। *দৈনিক ইত্তেফাক*-এ প্রকাশিত খবরে বলা হয়:

জাতীয় রক্ষীবাহিনীর সমাবেশ ও জাতির জনককে অভিবাদন জ্ঞাপন: জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল (বুধবার) সকাল ন'টায় বাংলাদেশ সচিবালয়ের সম্মুখে আবদুল গণি রোডে জাতীয় রক্ষীবাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ করেন।

নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী জাতীয় রক্ষীবাহিনীর সদস্যগণ রক্ষীবাহিনীর পরিচালক লেঃ কর্নেল নূরুজ্জামানের নেতৃত্বে সকাল সাড়ে সাতটায় পল্টন ময়দানে সমবেত হয়।

সকাল নয়টায় আবদুল গণি রোডে বঙ্গবন্ধুকে অভিবাদন জানানোর পর জাতীয় রক্ষীবাহিনীর সদস্যগণ 'মার্চিং কলাম' ও 'মুভিং কলাম' এই দুইটি ভাগে বিভক্ত হইয়া পুরাতন শহর ও নতুন শহরের পথ পরিক্রমায় নির্গত হয়।

মার্চিং কলাম পুরাতন শহরের নবাবপুর, ইসলামপুর, চকবাজার ও নাজিমুদ্দীন রোড ধরিয়া সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আসিয়া মিলিত হয়। অপর দিকে মুভিং কলাম বাঙলা একাডেমী, শাহবাগ, ফার্মগেট, শেরে বাংলা নগর, মীরপুর রোড হইয়া সদর দফতরে প্রত্যাবর্তন করে।

কয়েক দিন পর দৈনিক *ইত্তেফাক*-এর প্রথম পাতায় আবদুল গাফফার চৌধুরী এক প্রতিবেদন লেখেন। এর শিরোনাম ছিল, 'সামরিক পোশাক পরে ওরা আমাদেরই লোক'। সদ্য স্বাধীনতায় উজ্জীবিত দেশপ্রেমিক জনগণের কাছে তাদের প্রিয় সন্তান রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা 'আমাদেরই লোক' হিসেবে প্রশংসিত হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কুচকাওয়াজস্থলে নিয়ে যাচ্ছেন রক্ষীবাহিনীর পরিচালক এ এন এম নূরুজ্জামান

প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার পরপরই আনুষ্ঠানিক অভিযান শুরু করে রক্ষীবাহিনী। ২৫ জুন সরকার ঢাকাসহ কয়েকটি বড় বড় শহরে জারি করে সান্ধ্য আইন। পুলিশের সহায়তায় রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা ঘরে ঘরে তল্লাশি শুরু করে। সন্ত্রাসী, সমাজবিরোধী, দেশবিরোধী, অবৈধ অস্ত্রধারী, চোরাকারবারিদের বিরুদ্ধে রক্ষীবাহিনীর সফল অভিযান কিছুসংখ্যক মানুষের ভালো লাগেনি। কিন্তু দেশবাসী স্বস্তি লাভ করে। স্থানীয় প্রশাসন নির্ভর করতে শুরু করে রক্ষীবাহিনীর ওপর।

এদিকে বাহিনীকে শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজনীয় বিধিমালা তৈরি, নেতৃত্বের কাঠামো গঠন, সংগঠনের মধ্যকার শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং বিভিন্ন ভৌত কাঠামো তৈরির পরিকল্পনা নিয়ে পরিচালক ও আমরা দিন-রাত পরিশ্রম করতে থাকি। কিন্তু প্রধান কার্যালয়ে প্রয়োজনীয় ও অভিজ্ঞ জনবলের অভাবে কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ এন এম নূরুজ্জামান দক্ষ, অভিজ্ঞ ও চৌকস সেনা কর্মকর্তা হিসেবে খ্যাত ছিলেন। তাঁর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই রক্ষীবাহিনী গড়ে উঠতে থাকে। তরতাজা কয়েক হাজার যুবক, যারা মুক্তিযুদ্ধে অসীম সাহসিকতার পরিচয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়েছে, তাদের সুসংগঠিত করে একটা সুশৃঙ্খল ও চৌকস বাহিনী গড়ে তোলা কঠিন কাজ ছিল। সে জন্য তিনি দিন-রাত অমানুষিক পরিশ্রম করতে থাকেন, সঙ্গে সঙ্গে সেনাবাহিনী থেকে আরও কর্মকর্তাকে প্রেষণে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু পাকিস্তান থেকে বাঙালি সেনা কর্মকর্তারা ফিরে না আসা পর্যন্ত সেনাবাহিনীর প্রধান কে এম সফিউল্লাহ কোনো কর্মকর্তা দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

এতে রক্ষীবাহিনীর কাজ থেমে থাকেনি। কয়েক মাসের মধ্যেই শেষ হয় দ্বিতীয় ব্যাচের প্রশিক্ষণ। ১৯৭২ সালের ৬ ডিসেম্বর রক্ষীবাহিনীর দ্বিতীয় ব্যাচের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষেও প্রকাশিত হয় একটি স্যুভেনির[৭]।

তথ্যনির্দেশ

১. রক্ষীবাহিনী গঠন-সম্পর্কিত গেজেট ও সংশোধনী। পরিশিষ্ট ৩ দেখুন।

২. আবুল হাসান খান: পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল।

৩. হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ: ১৯৭১ সালে লেফটেন্যান্ট কর্নেল ও পাকিস্তানে ছিলেন। পরবর্তীকালে লেফটেন্যান্ট জেনারেল, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান, সামরিক আইন প্রশাসক, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা।

৪. ১৯৭১ সালে মহকুমা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম (বর্তমানে জেলা)। পরে বাংলাদেশ সরকারের সচিব।

৫. রক্ষীবাহিনীর প্রধানকে লেখা এম এ জি ওসমানীর চিঠি। পরিশিষ্ট ৪-এ দেখুন।

৬. এম শওকত আলী: ১৯৬৭ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে ক্যাপ্টেন পদে কর্মরত ছিলেন। তখন আরও কয়েকজনের সঙ্গে আগরতলা ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে আটক হন। তিনি ছিলেন এই মামলার ২৬ নম্বর আসামি। ১৯৬৯ সালে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে মুক্তি পান। কিন্তু চাকরিচ্যুত হন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তাতে যোগ দেন। মুক্তিযুদ্ধকালে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হন এবং মেজর পদে পদোন্নতি পান। পরে পর্যায়ক্রমে কর্নেল পদে উন্নীত হন। ১৯৭৯, ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ ও ২০০৮ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের নির্বাচিত সাংসদ। বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার।

৭. রক্ষীবাহিনীর দ্বিতীয় ব্যাচের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ উপলক্ষে প্রকাশিত স্যুভেনিরের মুখবন্ধ। পরিশিষ্ট ৫ দেখুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রক্ষীবাহিনীর প্রথম ব্যাচের কুচকাওয়াজে সালাম নিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
ছবি : *দৈনিক ইত্তেফাক*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আইনশৃঙ্খলা সমস্যা

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার কিছুদিনের মধ্যে দেশের কিছু কিছু অঞ্চল, বিশেষ করে যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনা ও বরিশালে আইনশৃঙ্খলা-পরিস্থিতির অবনতি হতে থাকে। স্থানীয় প্রশাসন থেকে ঢাকায় খবর আসতে থাকে যে তথাকথিত রাজনৈতিক দলের একদল উগ্রপন্থী সংঘবদ্ধভাবে বিভিন্ন থানা আক্রমণ করে পুলিশের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিচ্ছে। সংবাদপত্রেও এ সম্পর্কে কিছু খবর প্রকাশিত হয়। এদের বেশির ভাগই ছিল চীনপন্থী পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি ও পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির সশস্ত্র ক্যাডার। এদের আক্রমণে সাধারণ পুলিশের দৈনন্দিন দায়িত্ব পালন দূরের কথা, তাদের পক্ষে থানা ও ফাঁড়ি রক্ষা করাই দায় হয়ে পড়ে।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সূচনায় বাংলাদেশের সর্বত্র পুলিশ বাহিনীর বেশির ভাগ সদস্য ঝাঁপিয়ে পড়েন প্রতিরোধযুদ্ধে। ২৫ মার্চ মধ্যরাতে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে পুলিশ সদস্যরা বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁদের অনেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেননি, তাঁরা অনেকে জীবনের ভয়ে অথবা চাকরি রক্ষার জন্য মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তান সরকারের পক্ষে কাজ করেন। কেউ কেউ মুক্তিযুদ্ধেও যোগ দেননি, পাকিস্তান সরকারের হয়েও কাজ করেননি। দেশের ভেতরেই পালিয়ে জীবন যাপন করেছেন। আবার পুলিশ বাহিনীর কিছুসংখ্যক সদস্য বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন না। তাঁরা পাকিস্তান রাষ্ট্রের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁদের এ মনোভাব মুক্তিযুদ্ধের সূচনায় তেমন স্পষ্ট ছিল না। পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাংলাদেশে দখলদারি কায়েম করলে তাঁরা স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁদের কয়েকজন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সহযোগী হিসেবে বাংলার জনগণের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন চালান। স্বাধীনতার পরও তাঁরা চাকরিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বহাল থাকলেও তাঁদের মনোবল ছিল না। তাঁদের পক্ষে তখন সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের মোকাবিলা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

আসলে সরকারি অস্ত্রধারী কোনো বাহিনীর সদস্যরা যখন তাদের মনোবল হারিয়ে ফেলে, তখন তাদের দিয়ে সরকারের কোনো কাজ হয় না। চাকরি আর বেতন যাদের লক্ষ্য, তাদের পক্ষে কোনো ত্যাগ স্বীকার করা সম্ভব নয়। ত্যাগ স্বীকার করতে পারে শুধু দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ জনগণ, বিশেষ করে যুবসমাজ, দেশের জন্য যাদের ত্যাগ স্বীকার করার সাহস আছে, অনুপ্রেরণা আছে আর আছে দেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা। এ কারণেই সরকার তখন মনে করেছিল, অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী, সমাজবিরোধীসহ অন্য অপরাধীদের মোকাবিলা করতে পারবেন একমাত্র মুক্তিযোদ্ধারা, যাঁদের অনেককে তখন নিয়োগ দেওয়া হচ্ছিল জাতীয় রক্ষীবাহিনীতে।

মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে দেখেছি, মনোবলহীন পাকিস্তানি সেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ধরা পড়লে তাদের পা ধরে জীবনভিক্ষা চাইত। আরও দেখেছি, প্রাণের ভয়ে মাথা নিচু করে তারা কেমন করে ঢাকার দিকে পালাচ্ছে। একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের দিন দেখেছি, তাদের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের প্রধান সেনাপতি টাইগার নিয়াজি নামে পরিচিত লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজি (এ এ কে নিয়াজি) কীভাবে মাথা নিচু করে নিজের অস্ত্র সমর্পণ করছে আর ভারতীয় সেনানায়ককে সালাম জানাচ্ছে। একজন সেনাপতি যখন অস্ত্র সমর্পণ করতে বাধ্য হন, তখন তার চেয়ে লজ্জাজনক কাজ আর কী হতে পারে! একাত্তরে বাংলার বীর মুক্তিযোদ্ধারা অনেকে পাকিস্তানিদের হাতে ধরা পড়েছেন। তাঁরা বীরের মতোই মৃত্যুকে বরণ করেছেন, কিন্তু বর্বর পাকিস্তানিদের কাছে মাথা নত করেননি, আত্মসমর্পণ করেননি।

শুধু আমাদের পুলিশ বাহিনী কেন, বাংলাদেশ সরকারের কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় যুদ্ধের দুই বছর পর পাকিস্তান থেকে বাঙালি সেনা কর্মকর্তারা যখন নিজেদের দেশে ফিরলেন, তখন চাকরিতে থাকার জন্য তাদের অনেককেই নতজানু হতে দেখেছি। নিজের জ্যেষ্ঠতা ভুলে মুক্তিযোদ্ধা জুনিয়রদের কীভাবেই না স্যালুট করেছেন তাঁরা! কেউ কেউ বলেছেন, 'তোমরা মুক্তিযুদ্ধে যে অবদান রেখেছ, সে জন্য আমরা তোমাদের জুতা পলিশ করলেও তোমাদের ঋণ শোধ হবে না।' তাঁরা জানতেন শুধু চৌকসভাবে স্যালুট করতে। পাকিস্তান আমলে তাঁরা পশ্চিম পাকিস্তানিদের স্যালুট করতেন। বাংলাদেশে ফিরে তাঁরা প্রথম দিকে মুক্তিযোদ্ধাদেরও স্যালুট করেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর সরকারের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের চাটুকারিতার মধ্য দিয়ে পদোন্নতি পেয়েছেন। তারপর আস্তে আস্তে দেশের বীরসন্তানদের সরিয়ে সেনাবাহিনীর কমান্ড নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছেন। যুদ্ধ করার সাহস এবং দেশপ্রেম তাঁদের অভিধানে ছিল না। যুদ্ধ করার জন্য তাঁরা সেনাবাহিনীতে প্রবেশ করেননি। পাকিস্তানফেরত সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে যাঁদের দেশপ্রেম ছিল, তাঁরা নিজেদের সম্মান নিয়েই নিঃস্বার্থভাবে সেনাবাহিনী ও দেশের কল্যাণে কাজ করে গেছেন।

দেশটা স্বাধীন হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই আরও কয়েকটি সমস্যা সবার দৃষ্টিগোচর হয়। একশ্রেণীর উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র-যুবক মুক্তিযোদ্ধাদের নাম করে ঢাকা শহরে গাড়ি হাইজ্যাক করতে থাকে। এতে ঢাকা শহরের ধনিকশ্রেণীর মধ্যে একটা উদ্বেগ লক্ষ করা যায়। আবার দেখা গেল, ট্রেনের যাত্রীদের অনেকেই টিকিট ছাড়া ভ্রমণ করছেন। এতে মুক্তিযুদ্ধে প্রায় বিধ্বস্ত রেলওয়ে আরও ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে।

দেশে তখন পর্যাপ্ত পুলিশ ছিল না। যারা ছিল, তারাও নতুন দেশের নতুন পরিস্থিতিতে নতুন দায়িত্ব পালনে হিমশিম খাচ্ছিল। এ অবস্থায় সরকার সিদ্ধান্ত নেয়, হাইজ্যাককারী ও টিকিটবিহীন রেলযাত্রীদের দমন এবং হাইজ্যাক করা গাড়ি উদ্ধারের কাজে পুলিশের সঙ্গে জাতীয় রক্ষীবাহিনীর সদস্যরাও থাকবেন।

রক্ষীবাহিনীর প্রথম ব্যাচের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজের পর কিছুসংখ্যক রক্ষী সদস্যকে ঢাকা শহরে হাইজ্যাক করা গাড়ি উদ্ধারে নিয়োগ করা হয়। তাঁরা পুলিশ ও ট্রাফিক পুলিশের সহায়তায় গাড়ির কাগজপত্র পরীক্ষা শুরু করেন।

একদিন একদল পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীর একদল সদস্য কমলাপুর রেলস্টেশন থেকে ট্রেনে ওঠেন। কমলাপুর থেকে রওনা হয়ে টঙ্গী পর্যন্ত তাঁরা যাত্রীদের টিকিট দেখেন এবং শতাধিক টিকিটবিহীন যাত্রীকে চিহ্নিত ও আটক করেন। অবাক হওয়ার মতো কাণ্ড, টিকিটবিহীন যাত্রীদের মধ্যে একজন ছিলেন পুলিশের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল, তা-ও আবার সপরিবারে।

এদিকে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে নিয়মিত মুক্তিবাহিনী ও তাদের নিয়ন্ত্রণে গণবাহিনীর যাঁরা অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছিলেন, যুদ্ধ শেষে তাঁদের অস্ত্র সরকারের নিয়ন্ত্রণেই থাকে। বিএলএফ, অর্থাৎ মুজিব বাহিনী ও টাঙ্গাইল মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জমা নেওয়া হয়েছিল। তবে তাঁদের কেউ কেউ যে বেশ কিছু অস্ত্র, গোলাবারুদ গোপনে লুকিয়ে রেখেছিলেন, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এ ছাড়া দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছোট-বড় কিছু আঞ্চলিক মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠেছিল। তারা দেশের জন্য যুদ্ধ করলেও মুক্তিযুদ্ধ শেষে তাদের অস্ত্রশস্ত্র ঠিকমতো হিসাব করে জমা দেওয়া হয়েছে বলে মনে হয় না।

তারপর ছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলে গড়ে ওঠা মুক্তিবাহিনী। তাদের মধ্যে বিশেষত চীনপন্থী উগ্র বামপন্থীরা কোথাও অস্ত্র জমা দেয়নি। তারা সেসব অস্ত্র, তাদের ভাষায় 'সশস্ত্র শ্রেণীসংগ্রামের' নামে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, জোতদার, এমনকি সাংসদ হত্যার কাজে পর্যন্ত লাগাতে থাকে। কারণ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তাদের উদ্দেশ্য ছিল শ্রেণীশত্রু খতম করা। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর সদ্য প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানে একশ্রেণীর উগ্র বামপন্থী স্লোগান তুলেছিল, 'লাখো ইনসান ভুখা হায়/ ইয়ে আজাদি ঝুটা হায়'। তেমনি সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের চীনপন্থী তথাকথিত উগ্র বামপন্থীরা স্বাধীনতাকে স্বীকার করতে চায়নি। তাদের দলের নাম পর্যন্ত বদলায়নি। তারা দলের নাম 'পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি' রাখে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে প্রচারপত্র বিতরণ করতে শুরু করে। তখন পর্যন্ত গণচীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। না দেওয়ার কারণে তারাও (চীনপন্থী উগ্র বাম দল) চায়নি বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিতে। এমন ঘটনা পৃথিবীর কোথাও ঘটেছে বলে আমার জানা নেই।

এ সময় ভারতের পশ্চিমবঙ্গে চারু মজুমদারের নেতৃত্বে চীনপন্থী উগ্র বামপন্থীরা নকশাল আন্দোলনের নামে বহু মানুষ হত্যা করতে থাকে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আগেই পশ্চিমবঙ্গে এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা শুরু হয়েছিল। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশেও এর প্রভাব পড়ে। সদ্য স্বাধীন দেশে সবকিছু ছিল বিশৃঙ্খল অবস্থায়। উগ্রপন্থীরা এই সুযোগ কাজে লাগানোর চেষ্টা করে। সরকার তখন বিষয়টি গুরুত্বসহকারে নিয়ে এদের কার্যক্রম অনেকটা দমন করতে সক্ষম হয়।

স্বাধীনতার এত বছর পর আমার মনে হচ্ছে, এসব কার্যক্রম প্রথম দিকেই দমন না করতে পারলে বাংলাদেশের জন্য গভীর সংকটের কারণ হতো। কারণ, তাদের সন্ত্রাসী আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল পুলিশের থানা, ফাঁড়ি লুট করা; মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ সংগ্রহ করা এবং নিজেদের সন্ত্রাসী তৎপরতা বৃদ্ধি করে সদ্য স্বাধীন দেশে সন্ত্রাস ও অরাজকতা সৃষ্টি করা। এদের মনোভাবটা ছিল এ-রকমের: গণচীন বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরোধিতা করার পরও স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশ করেছে। গণচীন যেহেতু মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতা করেছে, তারা বাংলাদেশকে দাঁড়াতেও দেবে না।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পরাজিত পাকিস্তান সেনাবাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ এবং অস্ত্র জমা দিলেও তাদের স্থানীয় দোসর রাজাকার, আলবদর ও আলশামসের সশস্ত্র সদস্যরা আনুষ্ঠানিকভাবে অস্ত্র জমা দেয়নি। এই কাজটা তখন করা হয়নি। কেন তাদের অস্ত্র আনুষ্ঠানিকভাবে জমা নেওয়া হয়নি বা নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়নি, সেটা অন্য প্রসঙ্গ। রাজাকার, আলবদর, আলশামসের অল্প কিছুসংখ্যক নেতা ও সদস্য আত্মসমর্পণ করেছিল। তাদের অস্ত্র মুক্তিবাহিনীর জিম্মায় ছিল। ওই তিন বাহিনীর বাদবাকি সদস্য, অর্থাৎ তাদের বেশির ভাগ সদস্য বিক্ষুব্ধ জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে নিজ নিজ এলাকা ছেড়ে পালিয়ে চলে যায় অপরিচিত এলাকায়। আত্মীয়স্বজন বা কোনো আশ্রয়দাতার কাছে আশ্রয় নেয়। পালানোর সময় অনেকে আবার তাদের অস্ত্রশস্ত্র সর্বহারা দল ও অন্যান্য স্বাধীনতাবিরোধীর কাছে রেখে যায় অথবা বিক্রি করে দেয়। এ ছাড়া পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এদেশীয় সশস্ত্র সহযোগীদের অনেকে, বিশেষত আলবদর ও আলশামসের কিছু সদস্য, ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে অকার্যকর করার লক্ষ্যে তাদের অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছিল।

পরাজিত পাকিস্তানি সেনা ও মিলিশিয়ারাও পালানোর সময় অনেক অস্ত্রশস্ত্র এখানে-সেখানে ফেলে রেখে যায়। সেগুলো অনেক ডাকাত ও সমাজবিরোধীর হাতে পৌঁছে যায়, যা উদ্ধার করা তখন পুলিশের পক্ষে সম্ভব ছিল না। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে প্রভাবশালী অনেকেই আবার নিজ নিজ এলাকায় নিজেদের প্রভাব বিস্তার করার জন্য অস্ত্র লুকিয়ে রাখেন। তাঁদের অনেকে আবার সরকারের সমর্থক ছিলেন। ফলে এঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া সহজ ছিল না। তাঁদের নিজেদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার নিয়েও অনেক ক্ষেত্রে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটতে দেখা যায়, যার পরিণতিতে বেশ কিছু প্রাণহানির ঘটনা ঘটতে থাকে।

এভাবে কিছুদিনের মধ্যে সারা দেশে আইনশৃঙ্খলা-পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। এটা নিয়ন্ত্রণ করা সরকারের জন্য অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে। পুলিশের পক্ষে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব ছিল না। তাদের একাংশের মনোবলের কথা আগেই বলেছি। আরেকটি কারণ তাদের সংখ্যাস্বল্পতা। জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনীতে যোগ দেওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্য থেকে যাঁদের পুলিশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাহিনীর জন্য নেওয়া হয়েছিল, তাঁদের প্রশিক্ষণ তখনো শুরু হয়নি। কাজেই তাঁদের দায়িত্বে লাগানো যায়নি। এদিকে নতুন দেশে নতুন পরিস্থিতিতে পুলিশ বাহিনীর দায়িত্বও বাড়তে থাকে।

অস্ত্রধারী সশস্ত্র বিরোধীদের দমন করার মতো শক্তি ও মনোবল, তখন পুলিশের ছিল না। সবার ওপরে ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ। বিমানবন্দর, রাস্তাঘাট, সেতু, রেলপথ, সমুদ্রবন্দর সবই বিধ্বস্ত। এগুলো মেরামত করে দেশ পুনর্গঠন করা ছিল অত্যন্ত জরুরি। অথচ সরকারের তহবিলে অর্থ নেই। যুদ্ধের সময় বর্বর পাকিস্তানি সেনা আর তাদের দোসর রাজাকার, আলবদর, আলশামসের ভয়াবহ নির্যাতনে প্রায় ১ কোটি মানুষ ভারতে আশ্রয় নেয়। স্বাধীন দেশে তারা ফিরে এলে সরকারকেই তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হয়। এর মধ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও কয়েকটি দেশ সাহায্য করলেও বিতরণে দেখা গেল অসংগতি ও বিশৃঙ্খলা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে লক্ষ করা গেল দুর্নীতি। এগুলো সামাল দেওয়া চাট্টিখানি কথা ছিল না।

বিশাল হৃদয়ের অধিকারী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদারতার সুযোগ নিয়ে দলের নেতাকর্মীসহ অনেকে অসৎ কর্মকাণ্ড শুরু করে। দেশের গরিব-দুঃখী, বিশেষত ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য আসা সাহায্যসামগ্রীই অসৎ ও দুর্নীতিবাজ আমলা, রাজনীতিক ও ব্যবসায়ীদের কবলে পড়ায় সঠিকভাবে তা বিতরণ করা সম্ভব হয়নি। আবার বেশ কিছু পাচারও হয়ে যায়। এ নিয়ে জনমনে নানা সংশয় দেখা দেয়। তবে এ সময় বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত কঠোর হয়ে ওঠেন। ১৯৭২ সালের ৬ এপ্রিল দুর্নীতি ও দেশবিরোধী তৎপরতার কারণে তাঁর দলের ১৬ জন সাংসদকে তিনি দল থেকে বহিষ্কার করেন। ৯ এপ্রিল ৭ জন এবং ২২ সেপ্টেম্বর আরও ১৯ জন সাংসদকে তিনি বহিষ্কার করেন। দলের অনেক নেতা-কর্মী, যারা অসৎ পথ অবলম্বন করেছিল, তাদের কঠিন শাস্তি দিতে থাকেন। কিছুদিন পর সরকার বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বাংলাদেশ রাইফেলসকে সীমান্তে নিয়োজিত করে চোরাচালান ও পাচার বন্ধ করার চেষ্টা করে।

কিছুদিনের মধ্যে টঙ্গী ও নারায়ণগঞ্জে পাকিস্তানিদের ফেলে যাওয়া কলকারখানায়ও শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয়। সদ্য জাতীয়করণ করা এসব কারখানা পরিচালনার মতো সুযোগ্য ব্যবস্থাপকের তখন নিদারুণ অভাব ছিল। এসব কলকারখানা পরিচালনার দায়িত্ব যাঁদের দেওয়া হয়, তাঁরা তা সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারছিলেন না। একই সময় আবার পাকিস্তানে আটকে পড়া কয়েক লাখ বাঙালিকে দেশে ফেরত আনার দাবিতে আন্দোলন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গড়ে উঠতে থাকে। এ সবকিছুর প্রতি সরকারের সমবেদনা ছিল, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করার মতো অবস্থা ছিল না।

ঠিক এই পরিস্থিতিতে জাতীয় রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রশিক্ষণ দিয়ে দায়িত্ব পালনের জন্য পাঠানো একটা চ্যালেঞ্জের ব্যাপার ছিল। জাতীয় রক্ষীবাহিনী অধ্যাদেশ ১৯৭২-এর ৮(১) নম্বর ধারায় বলা হয়েছিল :

> The Bahini shall be employed for the purpose of assisting the civil authority in the maintenance of internal security when required by such authority as may be prescribed.

একই অধ্যাদেশের ৯ নম্বর ধারায় বলা হয় :

> It shall be the duty of every officer or Rakkhi promptly to obey and execute all orders and warrants lawfully issued to him by any competent authority and to apprehend all persons whom he is legally authorized to apprehend and for whose apprehension sufficient grounds exist, and deliver such persons to the custody of the Police.

জাতীয় রক্ষীবাহিনী অধ্যাদেশ ১৯৭২ জারির পর উল্লিখিত বিধান অনুযায়ী কোনো দায়িত্ব স্থানীয় জেলা প্রশাসন অথবা মহকুমা প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত হলেই রক্ষীবাহিনীর কর্মকর্তা ও সদস্যরা একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে সঙ্গে নিয়ে সেই দায়িত্ব পালন করেন। বাহিনীর সদস্য, বিশেষত কর্মকর্তাদের স্বউদ্যোগী হয়ে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত কোনো দায়িত্ব পালন করার সুযোগ ছিল না। কাউকে গ্রেপ্তার করার ক্ষমতাও তাঁদের ছিল না। প্রথম দিকে পুলিশ বাহিনীকে সহায়তা করার জন্য রক্ষীবাহিনী সীমিত আকারে দায়িত্ব পালন করতে থাকে এবং জনগণ ও সংবাদমাধ্যমের প্রশংসা অর্জন করে।

আগেই উল্লেখ করেছি, দেশ মুক্ত, স্বাধীন হওয়ার কিছুদিন পর থেকেই আইনশৃঙ্খলা-পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে থাকে। ফলে দেশের সর্বত্র রক্ষীবাহিনীর চাহিদা বাড়তে থাকে। ঢাকা শহরে ছিনতাই, ডাকাতি, খুন ও অন্যান্য সন্ত্রাসী তৎপরতা বন্ধ করার জন্য জুন মাসের শেষ সপ্তাহে সরকার সান্ধ্য আইন (কারফিউ) জারির মাধ্যমে অস্ত্র উদ্ধার অভিযান শুরু করে। এই সময় পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে জাতীয় রক্ষীবাহিনী ও বাংলাদেশ রাইফেলসের সদস্যদেরও মোতায়েন করা হয়। সেই অভিযানে বহু অবৈধ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়।

এ সময় একাত্তরের পরাজিত শক্তি, স্বাধীনতাবিরোধী কিছু চক্র, চীনপন্থী কিছু বাম রাজনীতিবিদ, পার্বত্য চট্টগ্রামের কয়েকজন আদিবাসী নেতা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতেগোনা কিছু লেখক ও সাংবাদিক, এমনকি সরকার-সমর্থক ছাত্রলীগের একটি অংশ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে সদ্য স্বাধীন দেশটাকে যেন দাঁড়াতেই দিতে চায়নি। কেউ কেউ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সব দল নিয়ে বিপ্লবী জাতীয় সরকার গঠনের দাবি তোলেন। মানবেন্দ্র লারমা দাবি করেন পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্তশাসন। কেউ লেখেন, সিলেটিরা বাঙালি নয়। কেউ দাবি করেন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র কায়েমের। আবার অনেকে ব্যস্ত হয়ে পড়েন টঙ্গী, নারায়ণগঞ্জ ও আদমজী জুটমিলে শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টি করার তৎপরতায়। অনেকে ধারণা করেন, পাকিস্তান আমলে আদমজীতে দাঙ্গা লাগিয়ে যেমন করে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল, সেভাবে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকারকেও তারা ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করতে পারবে।

ধীরে ধীরে হলেও সরকার পুলিশ, বিডিআর, রক্ষীবাহিনী ও মাঝেমধ্যে সেনাবাহিনী নিয়োগ করে দেশে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যবস্থা করতে থাকে। তার পরও দেখা গেল, ঢাকার নারায়ণগঞ্জ[১], লৌহজং, দোহার, মানিকগঞ্জ[২], মুন্সিগঞ্জ[৩] ও নরসিংদী[৪] এলাকায়; খুলনার খালিশপুর, বাগেরহাট[৫] ও সুন্দরবন এলাকায়; রাজশাহীর তানোর, বাগমারা ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ[৬] এলাকায়; যশোরের নড়াইল[৭], ফুলতলা, শৈলকুপা ও কালীগঞ্জ এবং ঝিনাইদহ[৮] এলাকায়; কুষ্টিয়ার চুয়াডাঙ্গা[৯] ও মেহেরপুর[১০] এলাকায়; বরিশালের উজিরপুর, গৌরনদী[১১], ঝালকাঠি[১২], পটুয়াখালী[১৩] ও গৌরনদী এলাকায়; পাবনার বেলকুচি ও শাহজাদপুর এলাকায়; বগুড়ার জয়পুরহাট[১৪], রংপুরের নীলফামারী[১৫] ও গাইবান্ধা[১৬] এলাকায়; ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ[১৭] ও নেত্রকোনা[১৮] এলাকায় এবং চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল, কক্সবাজার[১৯] ও আনোয়ারা এলাকায় সন্ত্রাসী তৎপরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে এই সব এলাকায় স্থানীয় প্রশাসন বারবার রক্ষীবাহিনীর সদর দপ্তরে এবং সরকারের কাছে পুলিশকে সহায়তা করার জন্য রক্ষীবাহিনী পাঠানোর দাবি জানায়। রক্ষীবাহিনীর পরিচালক এ এন এম নূরুজ্জামান রক্ষীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ না দিয়ে দায়িত্ব পালনে ঢাকার বাইরে পাঠাতে অনাগ্রহী ছিলেন। কিন্তু প্রশাসনের চাপে কিছু কিছু এলাকায় রক্ষীবাহিনী পাঠাতেই হয়। বাহিনীর সদস্যরাও উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে দায়িত্ব পালন করতে থাকে। বিশেষ করে, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে তারা যথেষ্ট সাহস ও পারদর্শিতা দেখায়। এ জন্য তারা স্থানীয় জনগণের প্রশংসা ও প্রশাসনের আস্থা অর্জন করে।

জুন মাসের শেষে দেশের বৃহত্তম শিল্পপ্রতিষ্ঠান আদমজী জুটমিলের পরিস্থিতি কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ২৭ জুন শ্রমিকেরা ধর্মঘট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুরু করলে পুলিশের পক্ষে পরিস্থিতি মোকাবিলা কঠিন হয়ে পড়ে। এ সময় সরকার আদমজীতে রক্ষীবাহিনী নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়। শ্রমিকনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে ধর্মঘটের বিষয়গুলো মীমাংসা করার দায়িত্ব পড়ে সরোয়ার হোসেন মোল্লা ও আমার ওপর। সরোয়ার ও আমি রক্ষীবাহিনীর একদল সদস্য নিয়ে আদমজীতে যাই। রক্ষীবাহিনী দেখে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়। আমরা কোনো ধরনের বলপ্রয়োগ না করে বিবদমান দুই পক্ষকে নিয়ে আলোচনায় বসি। কিছুক্ষণ আলোচনার পর দেখা গেল, দাবিদাওয়া কোনো বিষয় নয়, আসল বিষয় শ্রমিক নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব এবং প্রশাসনের দুর্বলতা। এই দ্বন্দ্বের সূত্র খুঁজতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই—মিলে যে কয়েক হাজার শ্রমিক কাজ করেন, বেতনের তালিকায় রয়েছে তার চেয়ে দ্বিগুণ শ্রমিকের নাম। উদ্বৃত্ত শ্রমিকের নামে বরাদ্দ বেতন শ্রমিকনেতা এবং সরকারের নিয়োগ পাওয়া ব্যবস্থাপকেরা ভাগ করে নেন। এতে আদমজী জুটমিলের যে ভরাডুবি হবে, আমরা তা স্পষ্টত বুঝতে পারি। এ ছাড়া শ্রমিকদের মধ্যে বিশেষ কয়েকটি জেলার প্রাধান্য নিয়েও সমস্যা ছিল। বিষয়টি আমরা বুঝতে পেরেছি দেখে শ্রমিক নেতাদের মধ্যে সাইদুল হক সাদু ও অন্যরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নেন। ২৯ জুন তাঁরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করেন। পরে অবশ্য সমস্যাগুলো আবার দানা বেঁধে উঠতে থাকে। ১ জুলাই আদমজীতে শ্রমিক সংঘর্ষে চারজন নিহত ও ১৫ জন আহত হয়। কর্তৃপক্ষ মিল বন্ধ ঘোষণা করে। চালু হওয়ার কিছুদিন পর ৬ সেপ্টেম্বর আদমজী জুট মিলে আবার বড় ধরনের সংঘর্ষ হয়। ওই এলাকায় সরকার সান্ধ্য আইন জারি করে। এরপর পরিস্থিতি শান্ত হয়। একপর্যায়ে (২০ ডিসেম্বর ১৯৭২) আদমজীর প্রধান নির্বাহী এম এ আউয়াল, মহাব্যবস্থাপক শফিউর রহমানসহ চারজনকে দুর্নীতির দায়ে অপসারণ এবং গ্রেপ্তার করা হয়।

১৯৭২ সালের আগস্ট মাসে রক্ষীবাহিনীর ২১ জন লিডার, কয়েকজন উপলিডার ও সহকারী লিডার ভারতে প্রশিক্ষণ শেষে দেশে ফিরে আসেন। আস্তে আস্তে তাঁদের ঢাকার বাইরে নিয়োগ দেওয়া শুরু হয়। এ সময় একদিন (৩১ আগস্ট) যশোরের বারোবাজারে চীনপন্থী উগ্র রাজনৈতিক দলের সশস্ত্র ক্যাডার ও পুলিশের মধ্যে গোলাগুলিতে ১২ জন হতাহত হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য জেলা প্রশাসক অলিউল ইসলাম[২০] দ্রুত রক্ষীবাহিনী পাঠানোর অনুরোধ জানান। সরকারি নির্দেশে সেখানে লিডার সর্দার মিজানুর রহমানের নেতৃত্বে রক্ষীবাহিনীর একদল সদস্য পাঠানো হয়। এ সময় যশোর ও কুষ্টিয়া এলাকায় চীনপন্থী পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি, পূর্ব বাংলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কমিউনিস্ট পার্টিসহ আরও কয়েকটি সন্ত্রাসী দল খুবই তৎপর ছিল। এদের নকশালি বলা হতো। তারা সুযোগ পেলেই পুলিশ, স্থানীয় নেতা ও জোতদারদের ওপর আক্রমণ চালাত। স্থানীয় হাটবাজারও এদের হামলা ও চাঁদাবাজি থেকে রেহাই পেত না। পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীর যৌথ অপারেশনে এই সব এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা-পরিস্থিতি খানিকটা উন্নত হয়।

রাজশাহীর তানোর এলাকাতেও নকশাল বাহিনী, সর্বহারা, সাম্যবাদী দলগুলোর তৎপরতা ও তাণ্ডব বাড়তে থাকে। এলাকার সাধারণ মানুষের মনে ত্রাসের সৃষ্টি হয়। এ সময় লিডার লুৎফর রহমানের নেতৃত্বে রক্ষীবাহিনীর একটি দল সেখানে পাঠানো হয়। তারা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে মিলে শক্ত অভিযান চালিয়ে বেশ কিছু নকশাল বাহিনী, সাম্যবাদী ও সর্বহারা দলের সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয় এবং বিধি মোতাবেক সময়মতো নিকটবর্তী থানায় তাদের হস্তান্তর করে। কিন্তু দেখা যায়, গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পুলিশ স্থানীয় কোর্টে মামলা করার কিছুদিন পরই তারা নানা উপায়ে মুক্তি পেয়ে যায় এবং ভিন্ন এলাকায় গিয়ে তাদের শ্রেণীসংগ্রাম অব্যাহত রাখে। ফলে উদ্ভূত সমস্যাগুলো থেকেই যায়।

এ সময় বিভিন্ন মহলে এ রকম একটি আলোচনা শুরু হয় যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও সুন্দরবন এলাকা স্বাধীন হয়নি। কারণ, বিভিন্ন সন্ত্রাসী দল সুন্দরবনে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের তৎপরতা দমনে তেমন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। সেখানে বাংলাদেশ সরকারের তেমন নিয়ন্ত্রণ নেই। এ অবস্থায় সুন্দরবন এলাকায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং পুলিশের পাশাপাশি রক্ষীবাহিনীও মোতায়েন করা হয়। লিডার সর্দার মিজানুর রহমান রক্ষীবাহিনীর দলটিকে নেতৃত্ব দিতে থাকেন। দীর্ঘদিন অপারেশন করে সেখান থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ উদ্ধার এবং অনেক সশস্ত্র সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযান শুরু হওয়ার পর অনেকে পালিয়ে যায়।

স্বাধীনতার পর আরেকটি ঘটনায় রাজনীতিতে অস্থিরতা দেখা দেয়। ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে সরকার-সমর্থক বাংলাদেশ ছাত্রলীগের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেওয়ায় ছাত্রলীগ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৯ জুলাই সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ও পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। একটি নূরে আলম সিদ্দিকী ও আবদুল কুদ্দুস মাখনের নেতৃত্বে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আদর্শে অনুগত থাকে। তাঁরা ঘোষণা করেন, যেকোনো মূল্যে মুজিববাদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অপরটি আ স ম আবদুর রব ও শাজাহান সিরাজের নেতৃত্বে 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে'র ওপর আস্থা রেখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করে। তারা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে মত ব্যক্ত করে। এর আগে এপ্রিল মাসে বাস্তহারাদের এক সভায় আ স ম আবদুর রব ঘোষণা করেছিলেন, 'সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন হলে আবার অস্ত্র ধরব।' ২৩ অক্টোবর, ১৯৭২ মেজর (অব.) আবদুল জলিল[২১] ও আ স ম আবদুর রবের নেতৃত্বে গঠিত হয় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)। একটি গণতান্ত্রিক দেশে এতে কোনো অসুবিধা ছিল না। অসুবিধা ও সমস্যা শুরু হলো যখন বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক তত্ত্ব বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তারা সশস্ত্র 'গণবাহিনী' গঠন করে। জাসদের গণবাহিনী বাংলাদেশের স্বাধীনতায় অবিশ্বাসী চীনপন্থী পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল), পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল), সাম্যবাদী দল, পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি ও অন্যান্য সন্ত্রাসী দলের কাতারে মিশে দেশের ভেতরে হত্যা, লুট ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাতে থাকে। গণবাহিনীর মধ্যে যারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিল, তাদের বিরুদ্ধেও রক্ষীবাহিনী একইভাবে অভিযান পরিচালনা করেছে।

এ সময় বাংলাদেশের একমাত্র জ্বালানি তেল শোধনাগার চট্টগ্রামের ইস্টার্ন রিফাইনারিতে শ্রমিক ও কর্মকর্তাদের মধ্যে নানা কারণে অসন্তোষ দেখা দেয়। একপর্যায়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে লিডার আকরাম হোসেনের নেতৃত্বে সেখানেও রক্ষীবাহিনী মোতায়েন করা হয়। রক্ষীবাহিনী ও শ্রমিকদের মধ্যে সংঘটিত সংঘর্ষে দুজন শ্রমিক নিহত হন। ফলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তখন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আমাদের কয়েকজনকে চট্টগ্রামে যেতে হয়। সকল পক্ষকে একত্র করে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আমরা পরিস্থিতি শান্ত করতে এবং ইস্টার্ন রিফাইনারির তেল শোধনের কাজ শুরু করতে সক্ষম হই। কয়েক দিন পর চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয়। তখন সেখানে লিডার আকরাম হোসেন ও লিডার শেখ দলিল উদ্দিনের নেতৃত্বে রক্ষীবাহিনীকে পাঠানো হয়। তাদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং বন্দরের কার্যক্রম অব্যাহত থাকে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সবচেয়ে বড় রপ্তানি দ্রব্য ছিল পাট ও পাটজাতদ্রব্য। ১৯৭২ সালের শেষের দিকে সমাজবিরোধী একটি অংশ পাটশিল্পকে ধ্বংস করার জন্য উঠেপড়ে মাঠে নামে। নভেম্বর মাসে এক দিনে নারায়ণগঞ্জের ২৭টি পাটের গুদামে আগুন ধরিয়ে দুষ্কৃতকারীরা দেশের বিরাট আর্থিক ক্ষতি সাধন করে। ফলে পাট শিল্পকারখানা ও গুদামগুলোর নিরাপত্তার জন্য রক্ষীবাহিনী নিয়োগ করা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাভারে রক্ষীবাহিনীর প্রশিক্ষণ ক্যাম্প উদ্বোধন করছেন পরিচালক এ এন এম নূরুজ্জামান

১৯৭২, ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার মাধ্যমে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও পুনর্গঠনের কাজ অব্যাহত রাখা সরকারের জন্য একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ ছিল। দেশে শুরু হয় নানামুখী অরাজকতা। চীনপন্থী বাম উগ্রপন্থী, নকশাল বাহিনী, সর্বহারারা রাজনৈতিক নেতাদের হত্যা, পুলিশের থানা ও ফাঁড়ি লুট এবং হাটবাজারে হামলা করে জনমনে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে থাকে। জনগণের নির্বাচিত স্থানীয় নেতারা ছাড়াও অনেক নির্বাচিত সাংসদ তাদের হাতে নিহত হন। ১৯৭২ সালের ৬ জুন সাংসদ আবদুল গফুর নিহত হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর সঙ্গে ছিল কামাল ও রিয়াজ নামের দুজন। তারাও নিহত হয়। আবদুল গফুর ১৯৭০ সালের নির্বাচনে খুলনা থেকে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৭৩ সালের ৩ জানুয়ারি নিহত হন সাংসদ সওগাতুল আলম সগির। তিনি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে মঠবাড়িয়া থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৭৩ সালের ৩ মে সাংসদ নুরুল হক নিহত হন। তিনি ১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য হিসেবে নড়িয়া থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৭৪ সালের ১০ জানুয়ারি নিহত হন সাংসদ মোতাহার উদ্দিন আহমদ। তিনি ১৯৭০ সালে ভোলা থেকে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। সাংসদ গাজী ফজলুর রহমান নিহত হন ১৯৭৪ সালের ১৬ মার্চ। তিনি ছিলেন নরসিংদীর মনোহরদী এলাকা থেকে নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য। ১ আগস্ট ১৯৭৪ সাংসদ অ্যাডভোকেট ইমান আলী নিহত হন। তিনি জাতীয় পরিষদের সদস্য এবং ময়মনসিংহ আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। ২৭ ডিসেম্বর ১৯৭৪ কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ঈদের নামাজ পড়ার সময় নিহত হন সাংসদ গোলাম কিবরিয়া। তিনি ১৯৭০ সালে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি সাংসদ আবদুল খালেক নিহত হন। তিনি প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন নেত্রকোনা থেকে। এ ছাড়া সাংসদ আবদুল মুকিম, আমিন উদ্দিনসহ (ফরিদপুর) আওয়ামী লীগের আরও অনেক নেতা-কর্মী[২২] বিভিন্ন সময়ে নিহত হন। এসব হত্যাকাণ্ডের পেছনে সমাজের দুষ্কৃতকারী, চরম বামপন্থী, নকশাল বাহিনী, সর্বহারা ও জাসদের গণবাহিনীর হাত ছিল।

১৯৭২ সালে ২৯ জন, ১৯৭৩ সালে ৭৭ জন, ১৯৭৪ সালে ৫২ জন এবং ১৯৭৫ সালের জুলাই পর্যন্ত ৪৪ জন জনপ্রতিনিধি, ছাত্রনেতা, শ্রমিকনেতা, মুক্তিযোদ্ধা, পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীর সদস্যকে হত্যা করা হয়। এ ছাড়া দেশে অনেক অরাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডও ঘটে। ১৯৭৪ সালের ১ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদে উপস্থাপিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাপ্টেন (অব.) এম মনসুর আলীর তথ্য থেকে জানা যায়, ১৯৭৩ সালেই দেশে ১ হাজার ৮৯৬টি[২৩] হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল।

১৯৭২ ও ১৯৭৩ সালে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা দেশের ৫৪টি থানা ও পুলিশ ফাঁড়ি লুট[২৪] করে বহু অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে যায়। পুলিশের পক্ষে থানা ও ফাঁড়ি রক্ষা করাই তখন অসম্ভব ছিল, জনগণের জানমাল তারা কীভাবে রক্ষা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঁ থেকে লেখক, আবুল হাসান খান ও সরোয়ার হোসেন মোল্লা

রক্ষীবাহিনীর এক অনুষ্ঠানে পরিচালক এ এন এম নূরুজ্জামান ও অন্যান্য কর্মকর্তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করবে। ১৯৭৩ সালের ২০ আগস্ট বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজংয়ে সশস্ত্র দুর্বৃত্তদের সঙ্গে রক্ষীবাহিনীর প্রায় তিন ঘণ্টা গুলিবিনিময় হয়। দুর্বৃত্তরা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। আহত অবস্থায় কয়েকজন ধরা পড়ে।

২ সেপ্টেম্বর মানিকগঞ্জের আরিচায় ফেরিতে সশস্ত্র দুর্বৃত্তদের সঙ্গে রক্ষীবাহিনীর সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে চারজন নিহত হয়। বেশির ভাগ থানায় ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সন্ত্রাসীদের হামলা থেকে রক্ষা করার জন্য ২৪ সেপ্টেম্বর ১৫০টি থানায় জাতীয় রক্ষীবাহিনীর সদস্য মোতায়েন করা হয়। ৩ অক্টোবর পাবনার শাহজাদপুরে সশস্ত্র দুর্বৃত্তদের সঙ্গে রক্ষীবাহিনীর গুলিবিনিময় হয়। এ সংঘর্ষে নিহত হয় ৮ জন।

১৯৭২ সালের শেষ থেকে রক্ষীবাহিনীর সাংগঠনিক কার্যক্রম ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। রক্ষীবাহিনীর লিডার মোজাফফর হোসেন, মো. লুৎফর রহমান, আকরাম হোসেন, নীতিভূষণ সাহা, তায়েব উদ্দিন খান, রাখালচন্দ্র সাহা, আলমগীর হাওলাদার, শেখ দলিল উদ্দিন, আখতারুজ্জামান, সর্দার মিজানুর রহমান, শরীফ ওয়ালিউর রহমান, সৈয়দ রফিকুল ইসলাম (বীর প্রতীক), গাজী বেলায়েত হোসেন, নুরুল হক তালুকদার, লিয়াকত আলী, আলাউদ্দিন ও আবদুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে বাহিনীর সাধারণ সদস্যরা অত্যন্ত সততা, সাহস ও নিষ্ঠার সঙ্গে এ দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। ১৫০টি থানায় রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের পাশে পেয়ে পুলিশ বাহিনীর সদস্যরাও উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন। এর ফলে কয়েক মাসের মধ্যেই দেশে আইনশৃঙ্খলা-পরিস্থিতির উন্নতি হয়। সন্ত্রাসী দলগুলোর পুলিশের থানা আক্রমণ ও লুটপাট বন্ধ হয়। এতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় রক্ষীবাহিনী কী অসাধারণ অবদান রেখেছিল। এই অবদান এই বাহিনীর প্রয়োজনীয়তাকেও তুলে ধরে।

জাতীয় রক্ষীবাহিনী দেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে পুলিশ, বিডিআর এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীকে সহায়তা করতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। এ বাহিনীর উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব ছিল :

ক. ঘেরাও ও অস্ত্র তল্লাশি অভিযান,
খ. সমাজ ও রাষ্ট্রবিরোধীদের বিরুদ্ধে অভিযান,
গ. আদমজীনগর, নারায়ণগঞ্জ, টঙ্গী, খুলনা ও চট্টগ্রামের শিল্প এলাকাগুলোতে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার অভিযান,
ঘ. চট্টগ্রাম, খুলনা ও চালনার সমুদ্র ও নৌবন্দর রক্ষার দায়িত্ব,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঙ. সারা দেশে এসএসসি, এইচএসসি এবং ডিগ্রি পরীক্ষা সুচারুভাবে সম্পন্ন করায় সহযোগিতা প্রদান,
চ. সারা দেশে লুণ্ঠিত পুলিশ ফাঁড়ি ও থানার নিরাপত্তা বিধান,
ছ. ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রিজার্ভ ফোর্স হিসেবে দায়িত্ব পালন,
জ. সারা দেশে লুকায়িত অবৈধ অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার,
ঝ. পরিত্যক্ত বাড়িঘরের অবৈধ দখলদারদের অপসারণ,
ঞ. ট্রেন ও স্টিমারে টিকিটবিহীন চলাচল বন্ধ করা এবং
ট. সারা দেশে সন্ত্রাসী তৎপরতার বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী, বিডিআর ও পুলিশের সঙ্গে যৌথ অভিযান পরিচালনা ইত্যাদি।

চলাচলের জন্য প্রয়োজনীয় গাড়ি ও অভিযানের জন্য দরকারি অস্ত্রশস্ত্র ও যোগাযোগ-সরঞ্জামের স্বল্পতা সত্ত্বেও রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা অত্যন্ত নিষ্ঠা, দক্ষতা ও দেশপ্রেমের সঙ্গে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ, প্রশাসন ও সংবাদমাধ্যমের প্রশংসা ও আস্থা অর্জন করেছিলেন। তবে কয়েকটি মহল থেকে, বিশেষ করে দেশবিরোধী চক্র, সন্ত্রাসী ও চরম বামপন্থীদের সমর্থকদের কাছে রক্ষীবাহিনীর তৎপরতা মোটেই সহনীয় ছিল না। কারণ, রক্ষীবাহিনীর তৎপরতা ও কার্যক্রমের ফলেই দেশ একটি শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল। তা না হলে দেশ সম্মুখীন হতো মহা সংকটের।

১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে সরোয়ার হোসেন মোল্লা ও আমাকে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা কোর্সে ছয় মাসের জন্য ভারতে পাঠানো হয়। কোর্স শেষে আমরা দুজনেই ১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে দেশে ফিরে আসি। তখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাঙালি সদস্যরা পাকিস্তান থেকে দেশে ফিরে আসছিলেন। তাঁদের মধ্য থেকে এ এম খান[২৫], সাবিহ উদ্দিন আহমেদ[২৬], এ কে এম আজিজুল ইসলাম[২৭], শরিফ উদ্দিন আহমেদ[২৮] ও সালাহউদ্দিন আহমেদকে[২৯] প্রেষণে জাতীয় রক্ষীবাহিনীতে নিয়োগ দেওয়া হয়। রক্ষীবাহিনীর পরিচালক এ এন এম নূরুজ্জামান (তখন তিনি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছেন) তাঁদের দায়িত্ব ভাগ করে দেন। এ এম খানকে উপপরিচালক (মেডিকেল); সাবিহ উদ্দিন আহমেদকে প্রথমে উপপরিচালক (অপারেশন) পরে উপপরিচালকের (সিগন্যালস) দায়িত্ব দেওয়া হয়। আজিজুল ইসলামকে প্রথমে উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ), পরে জোনাল কমান্ডার করে চট্টগ্রামে পাঠানো হয়। শরিফ উদ্দিন আহমেদকে যানবাহনের দায়িত্বে সহকারী পরিচালক করা হয়। আমরা দুজন ফিরে এলে সরোয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হোসেন মোল্লা ও আমি আগের পদে, অর্থাৎ উপপরিচালক (অপারেশন) ও উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ) হিসেবে কাজ করতে থাকি।

ভারতে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা কোর্সে প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশে ফিরে একটা বিষয় খেয়াল করে অবাক হয়ে যাই। দেখি, আমার সরকারি বাড়িতে যে লাল টেলিফোনটা ছিল, তা সংযোগহীন। লাল টেলিফোনের মাধ্যমে আমাদের পরিচালক ও রাষ্ট্রের অন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে সহজে যোগাযোগ করা যেত। ওই লাল টেলিফোনের মাধ্যমে আমাদের পরিচালকসহ রাষ্ট্রের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। আমিও তাঁদের সঙ্গে প্রয়োজনে মাঝেমধ্যে যোগাযোগ করতাম। প্রথমে ভেবেছিলাম, আমার অনুপস্থিতির কারণে হয়তো সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। কারণ, ফোনের সেটটি বাসায় ছিল। পরে জানতে পারি, সরকারি সিদ্ধান্তে লাল ফোনের লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে। ওই সংযোগ পুনরায় চালুর ব্যাপারে আমি আর চেষ্টা করিনি।

তথ্যনির্দেশ

১. নারায়ণগঞ্জ তখন ঢাকার মহকুমা
২. মানিকগঞ্জ তখন ঢাকার মহকুমা
৩. মুন্সিগঞ্জ তখন ঢাকার মহকুমা
৪. নরসিংদী তখন ঢাকার মহকুমা
৫. বাগেরহাট তখন খুলনার মহকুমা
৬. চাঁপাইনবাবগঞ্জ তখন রাজশাহীর মহকুমা
৭. নড়াইল তখন যশোরের মহকুমা
৮. ঝিনাইদহ তখন যশোরের মহকুমা
৯. চুয়াডাঙ্গা তখন কুষ্টিয়ার মহকুমা
১০. মেহেরপুর তখন কুষ্টিয়ার মহকুমা
১১. ভোলা তখন বরিশালের মহকুমা
১২. ঝালকাঠি তখন বরিশালের মহকুমা
১৩. পটুয়াখালী তখন বরিশালের মহকুমা
১৪. জয়পুরহাট তখন বগুড়ার মহকুমা
১৫. নীলফামারী তখন রংপুরের মহকুমা
১৬. গাইবান্ধা তখন রংপুরের মহকুমা
১৭. কিশোরগঞ্জ তখন ময়মনসিংহের মহকুমা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮. নেত্রকোনা তখন ময়মনসিংহের মহকুমা
১৯. কক্সবাজার তখন চট্টগ্রামের মহকুমা
২০. অলিউল ইসলাম : পরে বাংলাদেশ সরকারের সচিব।
২১. মেজর (অব.) আবদুল জলিল : পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা। ১৯৭১ সালের প্রথমার্ধে বর্তমান পাকিস্তানে (তখন পশ্চিম পাকিস্তান) কর্মরত থাকা অবস্থায় ছুটি নিয়ে দেশে আসেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে যুদ্ধে যোগ দেন। পরে ৯ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। স্বাধীনতার পর সুনির্দিষ্ট অভিযোগে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে চাকরিচ্যুত হন।
২২. ১৯৭২-১৯৭৫ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগের যাঁরা নিহত হয়েছেন। পরিশিষ্ট ৬ দেখুন
২৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪।
২৪. থানা ও পুলিশ ফাঁড়ি লুট এবং রক্ষীবাহিনীর ওপর আক্রমণ। পরিশিষ্ট ৭ দেখুন।
২৫. এ এম খান : তখন মেজর, পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল।
২৬. সাবিহ উদ্দিন আহমেদ : তখন মেজর, পরে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল।
২৭. এ কে এম আজিজুল ইসলাম : তখন মেজর, পরে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল।
২৮. শরিফ উদ্দিন আহমেদ : তখন ক্যাপ্টেন, পরে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল।
২৯. সালাহউদ্দিন আহমেদ : তখন ক্যাপ্টেন, পরে মেজর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রক্ষীবাহিনী নিয়ে বিতর্ক

জাতীয় রক্ষীবাহিনীর তরতাজা সদস্যরা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সামরিক প্রশিক্ষণ ছাড়াই বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেছেন। মুক্ত স্বাধীন দেশে পরিপূর্ণ প্রশিক্ষণ ও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছাড়াই প্রাণপণে নতুন দেশ গড়া এবং দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু যারা এ দেশটাই চায়নি এবং মনে পাকিস্তানের জন্য সুপ্ত প্রেম লালন করে, তারা তো দেশে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় থাকুক এবং পুনর্গঠনের মাধ্যমে দেশটি উন্নতির দিকে এগিয়ে যাক, সেটা চায়নি। স্বাধীনতার পর তারা নিজেদের ভোল পাল্টে জনগণের মধ্যে মিশে যায়। পরে দেশপ্রেমিক জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বিভেদ ছড়ানোর জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। এদের সঙ্গে যোগ দেয় কিছু কিছু সংবাদপত্র ও অতিবিপ্লবী মুক্তিযোদ্ধা। তারা রক্ষীবাহিনীর সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে।

প্রথমেই গুজব ছড়ানো হয় রক্ষীবাহিনীর পোশাক নিয়ে। রক্ষীবাহিনী কী পরিস্থিতিতে জলপাই সবুজ পোশাক ব্যবহার শুরু করে, সে ব্যাপারে আগে কিছুটা উল্লেখ করেছি। রক্ষীবাহিনীর দ্বিতীয় ব্যাচের সদস্যদের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজের সময় সরকার স্পষ্টতই ঘোষণা করেছিল যে পোশাকের রং যত দূর সম্ভব তাড়াতাড়ি পরিবর্তন করা হবে। দ্বিতীয় ব্যাচের কুচকাওয়াজ উপলক্ষে প্রকাশিত স্যুভেনিরেও এর উল্লেখ ছিল। বাহিনীর চতুর্থ ব্যাচের সদস্যদের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ উপলক্ষে প্রকাশিত স্যুভেনিরেও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় যে রক্ষীবাহিনীর পোশাকের রং হবে ধূসর নীল। চতুর্থ পাসিং আউট উপলক্ষে প্রকাশিত স্যুভেনিরের[১] ২০ অনুচ্ছেদে এ কথার উল্লেখ ছিল। তার পরও অনেকে ধারণা করতেন যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রক্ষীবাহিনী যে জলপাই সবুজ রঙের পোশাক পরে, ভারতের সেনাবাহিনীও পরে একই রঙের পোশাক। সুতরাং, রক্ষীবাহিনী সেজে ভারতীয়রা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করবে।

সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, রক্ষীবাহিনীর জন্য খাকি ছাড়া অন্য রকম সুবিধাজনক রঙের পোশাক ঠিক করা হবে। তবে জলপাই সবুজ পোশাক রাখা হবে না। তখন আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের ধারণা ছিল, অস্ত্রধারী কোনো বাহিনী মানেই খাকি পোশাকধারী। কারণ, গ্রামগঞ্জের মানুষ ১৯৭১ সালের আগে বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীর সদস্যদের তেমন দেখেনি। তাদের সংখ্যাও খুব কম এবং তারা দেশের কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে মোতায়েন থাকে। রক্ষীবাহিনীর প্রাথমিক পোশাকের সমালোচনাকারীরা কখনো বলেননি বা লেখেননি যে ভারতের বিশাল নৌবাহিনীর মতো বাংলাদেশের নৌবাহিনীও সাদা পোশাক পরে এবং ভারতীয় নৌবাহিনী বাংলাদেশের নৌবাহিনীর বেশে সমুদ্রপথে আমাদের দেশে প্রবেশ করতে পারে।

বিভিন্ন বাহিনী ও যুদ্ধ সম্পর্কে যাঁরা অভিজ্ঞ, তাঁরা জানেন, খাকি পোশাক মরুভূমি বা খরা এলাকার যুদ্ধপোশাক। জলপাই সবুজ পোশাক সাধারণত সবুজ অঞ্চলে সামরিক পোশাক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন আমাদের প্রতিবেশী মিয়ানমার এবং এশিয়ার অনেক দেশ, যেমন মালয়েশিয়া, লাওস, ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়ার সামরিক বাহিনী সবুজ অঞ্চলে জলপাই সবুজ বা জঙ্গল-রঙা সবুজ পোশাক পরে। ভারতের পশ্চিম সীমান্তে বহু এলাকা মরুভূমি-অধ্যুষিত। ওই এলাকায় আমাদের দেশের মতো সবুজের সমারোহ নেই। সেখানে ভারতীয় সেনারা পরে খাকি পোশাক। ভারতের উত্তর সীমান্তে হিমালয় এলাকায় যখন সাদা ধবধবে বরফ পড়ে, সেখানে সীমান্ত রক্ষায় নিয়োজিত ভারতীয় সেনারা সাদা পোশাক পরে। আর পূর্ব এলাকায় অর্থাৎ বাংলাদেশ, চীন ও মিয়ানমার সীমান্তের সবুজ এলাকায় ভারতীয় সেনাবাহিনী পরে জলপাই সবুজ পোশাক। এর এক সম্ভাব্য কারণ, ক্যামোফ্লেজ বা প্রতিপক্ষের দৃষ্টি এড়ানোর চেষ্টা। এটা একটা সামরিক কায়দা। কাজেই পোশাকের রং অত গুরুত্বপূর্ণ নয়, যত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশীর সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান বজায় রাখা, যুদ্ধ-পরিস্থিতি এড়িয়ে চলা এবং প্রয়োজনে দেশের জন্য বীরবিক্রমে যুদ্ধ করা।

আবার কোনো কোনো মহল বলত, রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের বেশির ভাগই ভারতীয়। কারণ, রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের মতো কালো মানুষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশে নেই। আসলে জলপাই সবুজ বা জঙ্গল-রঙা সবুজ পোশাক পরে সারা দিন খর রোদে দাঁড়িয়ে যাঁরা দীর্ঘক্ষণ দায়িত্ব পালন করেন, রোদের তাপে সবুজ পোশাকে তাঁদের বেশি কালো দেখায়। রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা যদি ভারতীয়ই হবেন, তাহলে ১৯৭৫ সালে যখন রক্ষীবাহিনীর সব সদস্যকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে নেওয়া হলো, তখন কি ভারতীয়রা সেনাবাহিনীতে প্রবেশ করেছে?

কয়েক বছর পর বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যুদ্ধের পোশাক হিসেবে জলপাই রঙের ক্যামোফ্লেজ পোশাক পরতে শুরু করে। অবাক হয়ে দেখি, রক্ষীবাহিনীর পোশাকের সমালোচনাকারীরা আর সেনাবাহিনীকে সমালোচনা করছে না। ওই পোশাক পরে ভারতীয় সেনাবাহিনী যে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারে, সে চিন্তা তাদের হয়নি।

এ প্রসঙ্গে একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা লিখতেই হয়। ১৯৭২ সালের ঘটনা। বঙ্গবন্ধু বিদেশে। ২৬ জুলাই তিনি চিকিৎসার জন্য বিদেশে যান এবং প্রায় দুই মাস দেশের বাইরে ছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

৩ সেপ্টেম্বর মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী একটি ভুখামিছিল নিয়ে রমনা পার্কের পাশে তৎকালীন গণভবনে যান। সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দীন আহমদ সেখানে মওলানা ভাসানীর জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। এ সময় গণভবনের সামনে পুলিশের সঙ্গে রক্ষীবাহিনীর একদল রক্ষীও মোতায়েন ছিল। আমি নিজেও তখন সেখানে ছিলাম। ভুখামিছিল গণভবনের কাছে পৌঁছালে মওলানা ভাসানী, কাজী জাফর আহমদ, রাশেদ খান মেনন ও হায়দার আকবর খান রনোকে ভেতরে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ ছিল আমাদের ওপর। সেখানে নিয়োজিত রক্ষীবাহিনীর একটি দলকে আমি নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলাম, মওলানা ভাসানীকে স্বাগত জানানোর সময় তাঁকে যেন সামরিক কায়দায় সালাম জানানো হয়। গণভবনের গেটে তাঁকে সালাম জানানোর ফলে মওলানা ভাসানী খুব খুশি হন এবং সবার খোঁজখবর নিতে থাকেন। রক্ষীবাহিনীর প্রায় প্রত্যেক সদস্যকে তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমার বাড়ি কোন জেলায়, কোন গ্রামে, ইত্যাদি। রক্ষীবাহিনীর সদস্যরাও জবাব দিতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর মওলানা ভাসানী তাঁর পাশে থাকা কাজী জাফর আহমদ, রাশেদ খান মেননকে বলেন, 'তোমরা না কও রক্ষীবাহিনীর সবাই ভারতীয়। আমি তো দ্যাখতাছি এরা আমাগো পোলা।' কাজী জাফর, রাশেদ খান মেনন কোনো কথা না বলে চুপ থাকেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওই ভুখামিছিলের উদ্দেশ্যই ছিল সরকারকে বেকায়দায় ফেলা। কারণ, দেশে তখন অনেকটা দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করছিল। মওলানা ভাসানী যখন গণভবনের ভেতরে বসে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে খাদ্যাভাব আর দুর্ভিক্ষ নিয়ে কথা বলছিলেন, তখন গণভবনের বাইরে ওই মিছিল থেকে স্লোগান উঠছিল : 'কেউ খাবে কেউ খাবে না/ তা হবে না তা হবে না'। এ সময় হঠাৎ আমার মনে হলো যে মওলানা ভাসানীকে আপ্যায়ন করা প্রয়োজন। তিনি খেতে খুব ভালোবাসেন। আমি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের বলে তাঁর সামনে ভালো মিষ্টি, স্যান্ডউইচ দেওয়ার ব্যবস্থা করি। খাবার দেখে মওলানা ভাসানী খুব খুশি হন এবং সঙ্গে সঙ্গে তা খেতে থাকেন। কাজী জাফর আর রাশেদ খান মেনন অবশ্য তাঁকে খেতে মানা করছিলেন। এ সময় উপস্থিত ক্যামেরাম্যানরা মওলানা ভাসানীর খাওয়ার ছবি তোলেন। পরদিন এ ছবি ও খবর বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় ছাপা হয়।

৪ সেপ্টেম্বর *দৈনিক ইত্তেফাক*-এ প্রকাশিত খবরে বলা হয় :

> গণভবনে ভাসানী— : গতকাল (রবিবার) মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর পল্টনে আয়োজিত জনসভা শেষে একটি মিছিল বাহির করা হয়। মিছিলটি বিকাল ৫-৪৫ মিনিটে গণভবনের সামনে উপস্থিত হয় এবং মিছিলের সঙ্গে একখানি খোলা জীপে করিয়া মওলানা ভাসানী কাজী জাফরসহ অন্যান্য ন্যাপ নেতা তথায় আগমন করেন। বিকাল ৫-৫০ মিনিটে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী সৈয়দ নজরুল ইসলামের নিকট একখানি স্মারকলিপি পেশ করেন। এই সময় গণভবনে অধিকাংশ বিভাগীয় মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতা উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী শ্রী ফণীভূষণ মজুমদার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আবদুল মান্নান, শ্রমমন্ত্রী জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী, অর্থমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দীন আহমদ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহমদ, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব জিল্লুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আবদুর রাজ্জাক এম, সি, এ প্রমুখ।
>
> মুদ্রিত স্মারকলিপিটি পেশ করার পর আলোচনা প্রসঙ্গে মওলানা ভাসানী বলেন যে, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সর্বদলীয় দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা না হইলে দেশের বর্তমান সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নহে। তিনি বলেন যে, ভুখ মিছিল নতুন কিছু নয়। ইহা গণতান্ত্রিক অধিকার। তিনি বলেন যে, সারা জীবনই আমি বিরোধী দল করিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসিয়াছি এবং ইহা ছাড়া আমি আর কিছু করিতেও পারি না। মওলানা ভাসানী বলেন যে, নক্সালদের লাইনে যাই নাই আর কোন দিন যাইবও না। যাহাদের একটি হাল ও ২ বিঘা জমি আছে, তাহাদেরকেই শ্রেণীশত্রু বলিয়া নক্সালরা হত্যা করিতেছে। ইহা আমি পছন্দ করি না। আমি কোন কিছুই জ্বালাইব না ও পোড়াইব না। সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিটে মওলানা ভাসানীকে কিছু স্যাণ্ডুইস ও পেপে কাটিয়া পরিবেশন করা হয়।

মওলানা ভাসানী স্যাণ্ডুইস খাইতে খাইতে বলেন, সকলকেই সুখ-দুঃখ সমানভাবে ভাগ করিয়া লইতে হইবে। তিনি আরও বলেন যে, দেশের যত লোকসংখ্যা তত সংখ্যক রেশন কার্ড বিলি করা দরকার। আলোচনাকালে তিনি বলেন যে, শেখ মুজিব আর আমি এক সঙ্গে চীনসহ মধ্যপ্রাচ্য সফর করিলে সকল দেশই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য। মুজিব দেশে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার সঙ্গে আমি আলোচনা করিব। সৈয়দ নজরুলের সহিত আলোচনার এক পর্যায়ে মওলানা সাহেব দাবী করেন যে, অন্যত্র ৫০টি লাশ কাপড়ের অভাবে কলাপাতার কাফন দিয়া দাফন করা হইয়াছে বলিয়া তাঁর নিকট প্রমাণ রহিয়াছে।

তিনি আরও বলেন যে, আমাকে সি, আই, এ'র লোক বলিয়া অনেকেই অভিযোগ করে। কিন্তু আমি ইহা কিছুতেই বরদাশত করিতে পারি না।

নিত্যপ্রয়োজনীয় ও অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের শহর ও গ্রামভিত্তিক পূর্ণ রেশন চালু, ঘুষ, দুর্নীতি বন্ধ, মুনাফাখোর, কালোবাজারী ব্যবসায়ীদের শাস্তি দান, দুর্নীতিবাজ এম, সি, এ আমলা, রাজনৈতিক কর্মীর সম্পত্তির হিসাব-নিকাশ, চোরাচালান রোধ প্রভৃতি সম্বলিত মওলানা ভাসানীর পেশকৃত স্মারকলিপির মধ্যে অন্যতম দাবী হিসাবে মুদ্রণ করা হইয়াছে।

মওলানা ভাসানী যখন খাচ্ছেন, তাজউদ্দীন আহমদ তাঁকে একটা প্রস্তাব দিয়ে বললেন, 'হুজুর, আমাদের সরকারের প্রতি যদি আপনার এতই অনাস্থা, তাহলে আপনিই সরকারের দায়িত্ব নিন, আমরা চলে যাই।' এই প্রস্তাব শুনে কাজী জাফর আর রাশেদ খান মেননের চোখমুখ জ্বলজ্বল করে ওঠে। কিন্তু মওলানা ভাসানী তো ক্ষমতায় যাওয়ার লোক নন। তিনি তাজউদ্দীনকে বোঝাতে লাগলেন—'ক্ষমতায় তোমরাই থাকো। আমাকে শুধু সমালোচনা করতে দাও। আমাকে সমালোচনা করতে না দিলে অন্যরা তো সমালোচনা বন্ধ রাখবে না।'

একপর্যায়ে আবার একটা গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, জাতীয় রক্ষীবাহিনীতে শুধু মুজিব বাহিনী ও টাঙ্গাইল মুক্তিবাহিনীর সদস্যরাই আছে। কথাটা মোটেই ঠিক নয়। প্রথম দিকে মুজিববাহিনীর সদস্য ও টাঙ্গাইল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা আনুষ্ঠানিকভাবে অস্ত্র সমর্পণের পর নিজ নিজ এলাকায় এবং পিলখানায় জাতীয় মিলিশিয়া ক্যাম্পে ব্যাপক হারে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের বেশির ভাগই ছাত্র ছিলেন। কিছুসংখ্যক চাকরিজীবীও ছিলেন। তাঁদের বেশির ভাগই যাঁর যাঁর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও চাকরিস্থলে চলে যান। শুধু যাঁদের চাকরি করার প্রয়োজন ছিল, তাঁরাই রক্ষীবাহিনীতে যোগ দেন। টাঙ্গাইল মুক্তিবাহিনীর প্রায় সবাই টাঙ্গাইল জেলার অধিবাসী ছিলেন, সুতরাং, তাঁদের মধ্যে যাঁরা রক্ষীবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা টাঙ্গাইলেরই ছিলেন। কিন্তু মুজিব বাহিনীর সদস্যরা ছিলেন সারা দেশের, সেখানে কোনো জেলার প্রাধান্য ছিল না। তারপর রক্ষীবাহিনীতে যাঁরা মিলিশিয়া ক্যাম্পগুলো থেকে এসেছিলেন, তাঁরাও এসেছিলেন সারা দেশ থেকেই।

একটা কথা স্পষ্ট করে বলা প্রয়োজন, মেধার ভিত্তিতে নির্বাচিত রক্ষীবাহিনীর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যাচের কর্মকর্তাদের সবাই মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। এরপর আরও চারটা ব্যাচের কর্মকর্তা, যথা চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম ব্যাচের কর্মকর্তাদের সবাই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে মেধার ভিত্তিতে যথাযথভাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁদের অনেকে আবার মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন না। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত রক্ষীবাহিনীর কর্মকর্তাদের মধ্যে সাতটা ব্যাচে মোট কর্মকর্তা ছিলেন ২১৩ জন[২]। এর মধ্যে প্রথম ভিন্ন ব্যাচে ছিলেন মাত্র ৪৮ জন। এঁদের মধ্যে ১০ জন হয় চাকরি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন অথবা বিভিন্ন কারণে চাকরিচ্যুত হন। সপ্তম ব্যাচের প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার আগেই বাকি ১৬৫ জন কর্মকর্তাসহ জাতীয় রক্ষীবাহিনীকে সেনাবাহিনীর সঙ্গে আত্তীকরণ করা হয়। পরবর্তী সময়ে রক্ষীবাহিনীর কর্মকর্তাদের সবাই সেনাবাহিনীতে তাঁদের যোগ্যতা ও দক্ষতা প্রমাণ করতে সক্ষম হন। অনেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর শীর্ষ পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছান।

কোনো কোনো মহল থেকে এমন কথাও শোনা গিয়েছে যে রক্ষীবাহিনী ছিল প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিজস্ব ব্যক্তিগত বাহিনী। বিষয়টি আমি কল্পনাও করতে পারি না। বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় কোনো বাহিনী ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব ব্যক্তিগত বাহিনী ছিল না। বাহিনীর সদস্যদের কেউ কেউ ব্যক্তিবিশেষের অনুগত ছিলেন। সেটা অন্য প্রসঙ্গ। তেলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশের শাসক রাষ্ট্রের সম্পদ ব্যবহার করে এ রকম ব্যক্তিগত বাহিনী সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজস্ব ব্যক্তিগত বাহিনী গড়া সম্ভব ছিল না। আর বঙ্গবন্ধুর নিজের টাকায় তো তা করাই সম্ভব ছিল না। কারণ, তাঁর যা বেতন ও অন্যান্য আয় ছিল, তা দিয়ে রক্ষীবাহিনীর ১২ হাজার সদস্যকে বেতন দেওয়া সম্ভব ছিল না। রাষ্ট্রীয়ভাবে রক্ষীবাহিনী প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা তো দূরের কথা, তাঁর সরকারি বাড়ি ও কার্যালয়—কোনোটারই পাহারা দেওয়ার কাজে নিয়োজিত হয়নি। তাঁর পরিবারের কোনো সদস্যের নিরাপত্তার জন্যও কোনো দিন রক্ষীবাহিনী নিয়োগ করা হয়নি। তাহলে এই বাহিনী তাঁর ব্যক্তিগত বাহিনী হয় কীভাবে? রক্ষীবাহিনী ছিল একটা সরকারি বাহিনী। সরকার এর খরচ মঞ্জুর করত এবং নীতি নির্ধারণ করত। সামরিক বাহিনী ও রক্ষীবাহিনী দুটোই প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের অধীনে ছিল। পুলিশ ও বাংলাদেশ রাইফেলস ছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে। রক্ষীবাহিনী শুধু দেশের অভ্যন্তরে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য পুলিশ ও প্রশাসনকে সহযোগিতা করেছে। সমালোচনার জন্য সমালোচনাই ছিল এ-জাতীয় সমালোচনার উদ্দেশ্য।

ভারতের সিআরপি (Central Reserve Police) নকশাল বাহিনীর সন্ত্রাসীদের যেমন সফলভাবে দমন করেছিল, তার চেয়েও সফলভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন সন্ত্রাসী বাহিনী ও অবৈধ অস্ত্রধারীদের দমন করতে সক্ষম হয়েছিল রক্ষীবাহিনী। এতে নাখোশ হয়ে তথাকথিত গোপন বামপন্থীদের শ্রেণীসংগ্রামের কিছু সমর্থকেরা তখন বলার চেষ্টা করে যে ভারতের সিআরপির আদলে রক্ষীবাহিনী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দেশবিরোধী, দেশের শত্রু, সন্ত্রাসী, হত্যাকারী, চোরাকারবারি ও শিল্পকারখানায় অগ্নিসংযোগকারীদের দমন করা যদি প্রতিপক্ষকে নির্মূল করা হয়, তাহলে পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনীর সঙ্গে রক্ষীবাহিনী সে কাজটি করেছে। কিন্তু রক্ষীবাহিনী কোনো গণতান্ত্রিক, দেশপ্রেমিক, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন করার কাজে কখনো ব্যবহৃত হয়নি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভুল তথ্যের ভিত্তিতে ভুল অভিযানে রক্ষীবাহিনীকে স্থানীয় প্রশাসন ও নেতারা ব্যবহার করেছে, যা মোটেই কাম্য ছিল না। এসব ক্ষেত্রে রক্ষীবাহিনীর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়েছে। অল্পসংখ্যক বিপথগামীর জন্য গোটা বাহিনীর দুর্নাম কাঙ্ক্ষিত নয়। জাতীয় রক্ষীবাহিনীর ১৯৭২ সালের সংশোধিত অধ্যাদেশে সুস্পষ্টভাবে লেখা ছিল যে, রক্ষীবাহিনীর কোনো সদস্য সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে কাউকে গ্রেপ্তার করলে অনতিবিলম্বে একটি রিপোর্টসহ পুলিশের নিকটস্থ থানা বা ফাঁড়িতে তাঁকে হস্তান্তর করতে হবে। ফলে গ্রেপ্তার করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণে রক্ষীবাহিনীর কোনো দায়িত্ব ছিল না। কোনো কোনো সময় দেখা গেছে, কিছু পত্রপত্রিকায় দুষ্কৃতকারীদের গ্রেপ্তারের খবর ছাপা হলেও তাদের বিচার-প্রক্রিয়া, শাস্তিবিধান বা মুক্তির বিষয়ে কোনো খবর ছাপা হয়নি।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে এমনও হয়েছে যে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী বা দলকে নিরস্ত্র করতে গিয়ে রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা নিজেরাই আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছেন। এতে উভয় পক্ষের গোলাগুলির কারণে হতাহতের ঘটনা ঘটে, যা অনেক ক্ষেত্রে এড়ানো সম্ভব হয়নি। অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের সঙ্গে রক্ষীবাহিনীর গুলিবিনিময়ে রক্ষীবাহিনীর সদস্যরাই বিজয়ী হয়েছেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে গুলিবিনিময় করে পাকিস্তানি সেনারাই যেখানে পারেনি; সেখানে বাংলাদেশে সর্বহারা দল, একাত্তরের পরাজিত শক্তি, গণবাহিনী ও বাংলাদেশের অস্তিত্বকে যারা স্বীকার করেনি, তারা কীভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে পারবে? এসব সংঘর্ষে মুক্তিযোদ্ধারা, অর্থাৎ সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত রক্ষীবাহিনীর সদস্যরাই বিজয়ী হন। ফলে দেশে আইনশৃঙ্খলা-পরিস্থিতির উন্নতি হতে থাকে। সর্বহারা ও অন্য সন্ত্রাসীরা দেশে তখন যে হারে থানা, পুলিশ ফাঁড়ি লুট এবং সাংসদসহ রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের হত্যা করছিল, এই অবস্থায় রক্ষীবাহিনী না থাকলে তাদের দমন করা সহজ হতো না। এই সত্য সবাইকে অনুধাবন করতে হবে।

একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন, অবৈধ অস্ত্রধারীদের কাছ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করা সহজ কাজ নয়। কাঁটা দিয়ে যেমন কাঁটা তুলতে হয়, তেমনি অস্ত্র দিয়ে অস্ত্র উদ্ধার করতে হয়। বিপথগামী সন্ত্রাসীরা অস্ত্রহীন ব্যক্তির কাছে কখনো অস্ত্র জমা দেয় না। এটা ঠিক, কিছু কিছু ক্ষেত্রে রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের বাড়াবাড়ি হয়েছে। সেটা হয়েছে অনেকটা অনভিজ্ঞতার কারণে। সমালোচনাকারীরা অনেক ক্ষেত্রে, বিশেষত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রকৃত অপরাধীকেও শান্তিকামী সাধারণ নাগরিক হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছে। আসলে কয়েকটি ঘটনা ছাড়া শান্তিকামী সাধারণ নাগরিকেরা রক্ষীবাহিনীর হাতে নিগৃহীত হয়নি। পরিচালক নূরুজ্জামান এ ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন। তাঁর কাছে এ ব্যাপারে তেমন রিপোর্ট আসেনি।

রক্ষীবাহিনীর অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষার কাজটি সঠিকভাবে এবং কঠোরভাবে সম্পন্ন করা হতো। প্রতিটি রক্ষী সদস্য ও কর্মকর্তা সততা, দক্ষতা ও সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশ নামের দেশটাকে যারা অঙ্কুরেই বিনষ্ট ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অকার্যকর করতে চেয়েছে, এমনকি লাখ লাখ মানুষের আত্মত্যাগকে অস্বীকার করেছে এবং দেশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে নেমেছে, তাদের কঠোর হাতে দমন করা ছিল প্রতিটি বাহিনী ও দেশপ্রেমিক নাগরিকের দায়িত্ব।

জাতীয় রক্ষীবাহিনী অধ্যাদেশ ১৯৭২ অত্যন্ত জরুরি ভিত্তিতে তৈরি ও জারি করা হয়েছিল। তখন দেশে নতুন আইনের খসড়া তৈরি করার মতো যথেষ্ট লোক ছিল না। সে জন্য কার্যক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাদেশটি সংশোধন করার প্রয়োজন দেখা দেয়। রক্ষীবাহিনীর অধ্যাদেশ ১৯৭২ মোতাবেক রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষায় সরকারি প্রশাসনকে সহযোগিতা করার কথা ছিল। কিন্তু সব সময়, বিশেষ করে দেশের দুর্গম এলাকার সন্ত্রাসী দলগুলোকে সরাসরি মোকাবিলা করার সময় একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে সঙ্গে নিয়ে অভিযান পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না। ফলে একটি সংশোধনী এনে রক্ষীবাহিনীর কর্মকর্তাদের সন্দেহভাজন অপরাধীদের গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। অবশ্য কেন এবং কোন পরিস্থিতিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তার যুক্তিযুক্ত কারণ দেখিয়ে একটি প্রতিবেদনসহ নিকটস্থ পুলিশ স্টেশনে তাকে হস্তান্তর করার বিধান ছিল। রক্ষীবাহিনীর কর্মকর্তাদের গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা দেওয়ায় স্বার্থান্বেষী মহলে সমালোচনা শুরু হয়েছিল। অথচ গ্রেপ্তারের ক্ষমতা দেওয়ার পর রক্ষীবাহিনী যথেষ্ট কার্যকারিতার সঙ্গে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিধানে ও দেশে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড দমনে ব্যাপকভাবে সফল হয়। দেশে সন্ত্রাসী তৎপরতা দ্রুত হ্রাস পায়। সন্ত্রাসীরা পালাতে থাকে। বহুলাংশে কমে আসে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। পুলিশের থানা লুট প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। জনমনে স্বস্তি ফিরে আসে। রক্ষীবাহিনীর অভিযানের ফলে দেশের সন্ত্রাসী দলগুলো, বিশেষ করে নকশাল বাহিনী, সর্বহারা, পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল), পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল), সাম্যবাদী দল ও জাসদের গণবাহিনীর তৎপরতা অনেকটা নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার কিছুদিন পর থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভেতরে সরকারবিরোধী মনোভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন মহল থেকে নানা গুজব ছড়ানো হতে থাকে। ১৯৭৩ সালে পাকিস্তান থেকে বাঙালি সেনা কর্মকর্তা ও সেনারা ফিরে আসার পর এটা আরও জোরদার হয়। একটা মহল বলতে থাকে যে, সেনাবাহিনীর প্রতিপক্ষ হিসেবে রক্ষীবাহিনী গঠন করা হয়েছে এবং রক্ষীবাহিনীকে সেভাবেই সাজানো হয়েছে। এমন গুজবও ছড়ানো হয় যে, রক্ষীবাহিনীর বাজেট প্রতিরক্ষা বাহিনীর বাজেটের চেয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক বেশি ইত্যাদি। সেনাবাহিনীর ভেতরে ধ্যানধারণা কেমন ছিল তা বোঝার জন্য তিনজন সেনা কর্মকর্তার বক্তব্য তুলে ধরা যায়।

মুক্তিযোদ্ধা ও প্রথম সেনাপ্রধান কে এম সফিউল্লাহ বীর উত্তম রক্ষীবাহিনী সম্পর্কে বিরূপ কোনো মন্তব্য করেননি। সেনাবাহিনীর ভেতরের তখনকার বাস্তব অবস্থা তুলে ধরেছেন, অর্থাৎ সেনাবাহিনীর সদস্যরা রক্ষীবাহিনী সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করতেন, সে কথাই বলেছেন। ১৯৯৩ সালে *ভোরের কাগজ*-এর সম্পাদক মতিউর রহমানের কাছে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে[৩] তিনি বলেন :

> ...সেনাবাহিনীর সদস্যদের এ রকম মনোভাব ছিল যে, তারা কিছুটা অবহেলিত। যদিও ব্যাপারটা পুরোপুরি সত্য ছিল না। তবে কতকগুলো কার্যকলাপ, যেমন রক্ষীবাহিনীর আবির্ভাবটা অসন্তোষের একটা বড় কারণ ছিল। বিরোধী পক্ষ এর পুরো সুযোগ নেয়। তারা এটা প্রচার করে অনেকের মধ্যে এটা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয় যে, শেষ পর্যন্ত রক্ষীবাহিনী সেনাবাহিনীর জায়গা নিয়ে নেবে। আর এ জন্য কিছু ঘটনা কাজ করেছে। সেটা হলো, সেনাবাহিনীর প্রায় সবকিছুই ছিল পুরোনো বা পূর্ব-ব্যবহৃত। এটা নয় যে, এগুলো তাদের দেওয়া হয়, এগুলো তাদেরই ছিল। দেশে যা ছিল, সেটা দিয়ে সেনাবাহিনীকে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি। কিন্তু রক্ষীবাহিনী যখন তৈরি করা হয়, তখন তাদের জন্য তো কিছু ছিল না। তাদের অস্ত্র, পোশাক, যানবাহন বা অন্য কোনো কিছুই ছিল না। সে জন্য সবকিছুই নতুন করতে হয়। তাই ওদের সবকিছু নতুন ছিল। পোশাক, অস্ত্র, যানবাহন, থাকার জায়গা—সবই নতুন ছিল। এ সবকিছুই সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে কিছুটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। রক্ষীবাহিনীকে যখন দেখত, অন্যরা মনে করত, আমরা অবহেলিত। এর ওপর আরেকটি বড় ব্যাপার ছিল। রক্ষীবাহিনীকে কিছু ক্ষমতা দেওয়া হয়, যা দিয়ে তারা যে কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারত। যার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু কিছু দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল দুই বাহিনীর মধ্যে।
>
> এটা ঠিক, তারা (সৈনিকরা) ভাবে যে, দেশের প্রতিরক্ষা বিষয়টি তো তাদের ওপর ন্যস্ত। যদি তা-ই হয়, তাহলে বিকল্পের কী প্রয়োজন? রক্ষীবাহিনী গঠন করা হয়েছিল মূলত পুলিশকে সাহায্য করার জন্য। পুলিশ তখন কার্যকর ছিল না। তাদের পক্ষে আইনশৃঙ্খলা-পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার মতো অবস্থা ছিল না। এ অবস্থায় হয়তো রক্ষীবাহিনী গঠন করা হয়। পরে এমন প্রচারণা ছিল যে, রক্ষীবাহিনীর সংখ্যা প্রায় এক লাখের কাছে চলে গেছে। ১৫ আগস্টের পরে তো দেখা গেল, তাদের সংখ্যা ছিল ১০-১২ হাজারের মতো। বলা হতো, ওদের কামান দেওয়া হয়েছে। পরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রমাণিত হলো, সেটা ছিল না। এসব অপপ্রচারও সেনাবাহিনীর মধ্যে কাজ করেছে। (*ভোরের কাগজ*, ১৫-১৬ আগস্ট, ১৯৯৩)

মুক্তিযোদ্ধা সেনা কর্মকর্তা মইনুল হোসেন চৌধুরী[৪] তাঁর *এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য* বইতে লিখেছেন :

> এ কথা সত্যি, সে সময় আমাদের পুলিশবাহিনী সংগঠিত ছিল না। এ ছাড়া স্বাধীনতার পর পরিস্থিতির কারণে সমাজে একশ্রেণীর সুযোগসন্ধানী লোকের উদ্ভব হয়। অনেকের হাতে অবৈধ অস্ত্র থাকায় কিছু কিছু এলাকায় আইনশৃঙ্খলা-পরিস্থিতির কিছুটা অবনতি ঘটে। তার ওপর গুপ্ত বামপন্থী দলগুলো পুলিশ ফাঁড়ি, থানা ইত্যাদি আক্রমণ করে অস্ত্রশস্ত্র লুট করত। তা ছাড়া খাদ্য গুদাম, পাটের গুদামে আগুন দেওয়া, রাজনৈতিক, বিশেষ করে আওয়ামী লীগ নেতাদের ওপর আক্রমণ ও তাঁদের হত্যা শুরু করে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রক্ষীবাহিনীকে দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপকভাবে মোতায়েন করতে হয়। তাদের ওপর ভরসা করার একটা বড় কারণ, এই বাহিনীর সদস্যরা ছিল মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী। কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে রক্ষীবাহিনী দ্রুতই সমালোচনার সম্মুখীন হয়। তারা গুপ্ত বামপন্থী দলগুলোর আক্রমণের শিকার হয়। ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারাও অতিমাত্রায় প্রতিক্রিয়া দেখায়। তাই রক্ষীবাহিনী আওয়ামী লীগের সঙ্গে মিলে অন্য রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন চালাত বলে অভিযোগ ওঠে। রক্ষীবাহিনীকে অনেকে আওয়ামী লীগের সশস্ত্র ক্যাডার বলে ধারণা করতে শুরু করে। ফলে রক্ষীবাহিনী নিয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরে তথা পুলিশ, বিডিআর, সেনাবাহিনীতে চরম বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এর প্রথম কারণ, রক্ষীবাহিনী কর্মকর্তাদের ভারতীয় উপদেষ্টাদের তত্ত্বাবধানে সামরিক প্রশিক্ষণদান এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর মতো পোশাক গ্রহণ। দ্বিতীয়ত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ। তা ছাড়া সামরিক বাহিনীকে বঞ্চিত করে রক্ষীবাহিনীকে সরকার উন্নত বেতন, খোরাক, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে বলে প্রচারণা শুরু হয়, যদিও সব অভিযোগ সঠিক ছিল না। (পৃ. ৩৮)

মইনুল হোসেন চৌধুরী আরও লেখেন :

> ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, পুনর্বাসন ও আইন-শৃঙ্খলার দৃষ্টিকোণ থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে একটা সদ্য স্বাধীন দেশে আধা সামরিক কিংবা অন্য কোনো আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা গঠন করা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

তিনি রক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগের কথা লিখে নিজেই আবার সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন, 'সব অভিযোগ সঠিক ছিল না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকারের কূটনৈতিক সাফল্যে পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালি সেনা কর্মকর্তা, সৈনিকসহ সব বাঙালি বাংলাদেশে ফিরে আসতে পেরেছিলেন। তাঁদের একজন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা এম সাখাওয়াত হোসেন[৫]। তিনি *বাংলাদেশ: রক্তাক্ত অধ্যায়, ১৯৭৫-৮১* নামের একটি বই লিখেছেন। তিনিও মইনুল হোসেন চৌধুরীর মন্তব্যের মতোই রক্ষীবাহিনী সম্পর্কে কিছু বিরূপ মন্তব্য করেছেন। রক্ষীবাহিনী সম্পর্কে পাকিস্তান-প্রত্যাগত অমুক্তিযোদ্ধা সেনা কর্মকর্তাদের কেমন বিদ্বেষী মনোভাব ছিল, তা তাঁর লেখা থেকে পাওয়া যায়।

এম সাখাওয়াত হোসেন লিখেছেন :

> সেনাবাহিনীতে মুক্তিযোদ্ধা এবং অমুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে মানসিক দূরত্ব থাকলেও রক্ষীবাহিনীর কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সকলেই একমত পোষণ করত। সকল সদস্যেরই দৃঢ় বিশ্বাস রক্ষীবাহিনীর বাজেট প্রতিরক্ষা বাজেট থেকে অনেক বেশি ছিল। রক্ষীবাহিনীর রসদ থেকে শুরু করে সকল সরঞ্জামের প্রাধিকার ছিল অন্যান্য বাহিনীর ঊর্ধ্বে। তখন সেনাবাহিনীতে ইউনিফর্মের ঘাটতি পূরণের জন্য কিছু কিছু ভারত থেকে আনানো হলেও ওগুলোর সাইজ এত ছোট ছিল যে, যার বেশির ভাগই সঠিক মাপে লাগত না। গুজব রটানো হল যে, ভারত ইচ্ছে করে সে দেশের বাতিলকৃত পোশাক পাঠায় বলেই এরূপ অবস্থা। তবে এটা সত্য যে, তখন জুতা থেকে রাইফেল পর্যন্ত প্রচুর ঘাটতি ছিল আর এ ঘাটতি মিটাতে এসব সরঞ্জাম আমদানি করা হত ভারত থেকে যার বেশিরভাগ দ্রব্যই ছিল নিম্নমানের।

সাখাওয়াত হোসেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে মুক্তিযোদ্ধা ও অমুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যকার মানসিক দূরত্বের কথা উল্লেখ করেছেন এবং তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে রক্ষীবাহিনী সম্পর্কে মুক্তিযোদ্ধা সেনা কর্মকর্তা ও অমুক্তিযোদ্ধা সেনা কর্মকর্তাদের বক্তব্য থেকেই। সত্য উদ্‌ঘাটনের স্বার্থে তাঁদের মতামত খণ্ডন করা প্রয়োজন।

স্বাধীনতার পর নবগঠিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১৮-১৯ জন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার একজন এ এন এম নূরুজ্জামান। তাঁকে জাতীয় রক্ষীবাহিনীকে সংগঠিত করার গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাঁর নেতৃত্বে এবং সার্বিক পরিচালনায়, অর্থাৎ সেনাবাহিনীর একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠন করা হয়। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা আবুল হাসান খান, সাবিহ উদ্দিন আহমেদ, এ কে এম আজিজুল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইসলাম, এ এম খান, শরিফ উদ্দিন আহমেদ ও সালাহউদ্দিন আহমদসহ সেনাবাহিনীর বেশ কয়েকজন সাবেক ও চাকরিরত সুবেদার ও হাবিলদারকে প্রেষণে রক্ষীবাহিনীতে পাঠানো হয়। এই সেনা কর্মকর্তাদের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। সুতরাং, রক্ষীবাহিনীকে সেনাবাহিনীর প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখার কোনো যুক্তি ছিল না। বরং রক্ষীবাহিনী সদ্য স্বাধীন দেশে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, চরম বামপন্থী সন্ত্রাসী দলগুলোর বিরুদ্ধে অভিযান এবং স্বাধীনতার বিরোধীদের দমনের ক্ষেত্রে অসাধারণ সাহস ও উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করেছে। রক্ষীবাহিনী গঠনের ফলে সেনাবাহিনীকে সীমিত কয়েকটি অভিযানে মোতায়েন করা হয়েছিল। অভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে সীমিত পরিসরে মোতায়েন করায় সেনাবাহিনীর সদস্যরা তেমন খুশি ছিলেন না। একবার এর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল সেনাসদর অফিসার মেসে। সেনাবাহিনীর চাকরিতে থাকা অবস্থায় মেজর জয়নাল আবেদীন[৬] নামের একজন সেনা কর্মকর্তা সেনাসদর অফিসার মেসে প্রকাশ্যে সরকার উৎখাতের কথা বলেছিলেন। এ ছাড়া সেনা কর্মকর্তা মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন আহমেদ[৭] ১৯৭৪ সালে চাকরিরত থাকা অবস্থায় সরকারবিরোধী একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেটা তিনি সাপ্তাহিক *হলিডে* পত্রিকায় প্রকাশ করেন, যা ছিল সম্পূর্ণ বেআইনি। চাকরিচ্যুত হওয়ার পর তিনি সর্বহারা দলে যোগ দিয়ে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে গুপ্ত হত্যাকাণ্ড চালাতে থাকেন। আবার বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের[৮] সেনাবাহিনী থেকে বাধ্যতামূলক অবসরে (সেপ্টেম্বর ১৯৭২) গিয়ে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলে (জাসদ) যোগ দেন এবং সঙ্গোপনে সেনাবাহিনীর মধ্যে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা গঠনের চেষ্টা চালান। এতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সেনাবাহিনীর মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব ছিল, অবশ্য তা অস্বাভাবিক ছিল না। একটা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে সবার প্রত্যাশা পূরণ করা সরকারের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল।

স্বাধীনতার পর জ্যেষ্ঠ, যোগ্য, দক্ষ, ত্যাগী ও শক্ত নেতৃত্বের মাধ্যমে সেনাবাহিনীকে সুশৃঙ্খলভাবে গড়ে তোলার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সুদীর্ঘ সংগ্রাম আর মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে প্রাপ্ত স্বাধীন দেশে তখন যে পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল, তাতে সরকারের পক্ষে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছিল। এম এ জি ওসমানীকে এক আদেশে জেনারেল করা হয়। তাঁর সুপারিশে একপর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঠিক করেছিলেন যে খাজা ওয়াসিউদ্দিনকে সেনাপ্রধান নিয়োগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করবেন। কিন্তু তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেননি। মুক্তিযুদ্ধের পর একজন অমুক্তিযোদ্ধাকে সেনাপ্রধান করার চিন্তা যুক্তিযুক্ত বা গ্রহণযোগ্য ছিল না। ওসমানীরও সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান থাকা আইনসম্মত ছিল না। কারণ, তিনি ছিলেন একজন রাজনীতিবিদ ও নির্বাচিত সাংসদ। ফলে সরকারের সামনে ছিল মুক্তিযুদ্ধের তিনজন ফোর্স কমান্ডার, যাঁদের একজনকে সেনাপ্রধান করা যায়। যদিও তাঁরা সেনাপ্রধান হওয়ার মতো জ্যেষ্ঠ ছিলেন না এবং তাঁদের অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট ছিল না। সেনাবাহিনী যতই ছোট হোক, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, মেজর জেনারেল বা তদূর্ধ্ব পদের অধিকারীরা সাধারণত সেনাপ্রধান হন। মুক্তিযুদ্ধের সূচনাকালে উপর্যুক্ত তিনজন ছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মেজর। এর পরবর্তী র‍্যাংক লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদে তাঁরা পদোন্নতি পাওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু না হলে তাঁরা হয়তো কয়েক মাসের মধ্যে ওই পদে পদোন্নতি পেতেন। অবশ্য মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশ সরকার তাঁদের লেফটেন্যান্ট কর্নেল হিসেবে পদোন্নতি দেয়। তিনজনের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন জিয়াউর রহমান। কিন্তু এম এ জি ওসমানী তাঁকে মোটেই পছন্দ করতেন না; মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি তাঁকে একবার মুক্তিবাহিনী থেকে অব্যাহতি দিতে চেয়েছিলেন। ফলে পরবর্তী জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা কে এম সফিউল্লাহকে সেনাপ্রধান এবং জিয়াউর রহমানকে উপ-সেনাপ্রধান করা হয়। দুজনকেই কর্নেল পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়। বিষয়টি নিয়ে জিয়া ও তাঁর সমর্থিত একটি অংশ অসন্তুষ্ট ছিল। ১৯৭৩ সালের ৬ জুন তাঁদের দুজন একসঙ্গে প্রথমে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদে উন্নীত হন। এর কিছুদিন পর তাঁদের দুজনকে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত করা হয়। কিন্তু সেনাবাহিনীর মধ্যে একটা চাপা অসন্তোষ থেকেই যায়। কয়েকজন মেজরও দ্রুত গতিতে কর্নেল ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হন। অন্যদিকে বীর সিপাহিরা সিপাহিই থেকে যান। এতে তাঁদের মধ্যেও দেখা দেয় চাপা অসন্তোষ।

সেনাবাহিনীর ভেতরে পুঞ্জীভূত এসব চাপা অসন্তোষ প্রকাশ করার তেমন সুযোগ ছিল না। ফলে অসন্তোষ প্রকাশের একটা নতুন পথ বের হয় এবং সেটা হচ্ছে জাতীয় রক্ষীবাহিনী। সেনাবাহিনীতে নিম্নমানের ব্যারাক সে দোষ রক্ষীবাহিনীর; নিম্নমানের খাবার, সে দোষও রক্ষীবাহিনীর; পোশাক নিম্নমানের, সে জন্যও রক্ষীবাহিনী দায়ী এবং বেতন কম, সে জন্যও দায়ী রক্ষীবাহিনী। অথচ রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের বেতনের স্কেল এবং খাবার ও পোশাকের সুবিধা ছিল পুলিশের মতো, সেনাবাহিনীর চেয়ে অনেক কম। রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের থাকার ব্যারাক ছিল না। সাভার ট্রেনিং সেন্টারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাপরাঘর তৈরি করে গাদাগাদিভাবে তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। নতুন দেশে সেনাবাহিনী, বিডিআর, পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীর সরঞ্জাম আমদানি করা হয়েছে ভারত থেকে। কারণ, অন্য দেশ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে আমদানি করার অর্থ সরকারের ছিল না। পুলিশ, বিডিআর ও রক্ষীবাহিনীর জন্য ভারত থেকে আমদানি করা সরঞ্জাম নিম্নমানের ছিল না। কিন্তু সেনাবাহিনী মনে করত, তাদেরগুলো নিম্নমানের। এর কারণ দুটি। প্রথমত, সেনাবাহিনীর বেশির ভাগ সদস্য পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে ছিল। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সরঞ্জামের বেশির ভাগ আমদানি করা হতো আমেরিকা থেকে। সেগুলোর মান ভারতীয় সরঞ্জামের চেয়ে অনেক উন্নত ছিল। ফলে তাদের কাছে ভারতীয় সরঞ্জাম, পোশাক-আশাক নিম্নমানের মনে হতে পারে। দ্বিতীয় কারণ হতে পারে, যারা ভারত থেকে আমদানির দায়িত্বে ছিলেন, তাঁরা দুর্নীতি করে নিম্নমানের সরঞ্জাম কিনেছিলেন। এ কথা অনেকের হয়তো জানা যে, টিসিবির ক্ষেত্রে ঘটেছিল এমন ঘটনা।

এটা ঠিক যে, রক্ষীবাহিনীর লিডারদের প্রশিক্ষণ ভারতে হতো। এ বিষয় নিয়ে যাঁরা চিন্তিত ছিলেন, তাঁরা কিন্তু চিন্তা করে দেখেননি যে ওই সময় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অনেক কর্মকর্তা ও সেনাকেও ভারতেই প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যাচের কর্মকর্তাদের সবাই ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলেন। তাঁরা অত্যন্ত সাহস ও দেশপ্রেমের সঙ্গে বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করতে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেন। এ ছাড়া পাকিস্তান-প্রত্যাগত সেনা কর্মকর্তা ও মুক্তিযোদ্ধা সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে হোসেইন মুহম্মদ এরশাদ, সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম[৯], দানিয়েল ইসলামসহ[১০] অনেক কর্মকর্তা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ভারতে। আমাদের সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা ভারতে প্রশিক্ষণ নিতে পারলে রক্ষীবাহিনীর কর্মকর্তারা প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন না কেন? এখানে উল্লেখ্য, ১৯৭৫ সাল থেকে রক্ষীবাহিনীর কর্মকর্তাদের সেনাবাহিনীতেও প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো শুরু হয়। ওই বছর লিডার এন এ রফিকুল হোসেন[১১] এবং এম এম ইকবাল আলমকে[১২] জুনিয়র ট্যাকটিক্স কোর্স ও ইউনিট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কোর্সে পাঠানো হয়েছিল।

কোনো কোনো মহল, বিশেষ করে সেনাবাহিনীর পাকিস্তান প্রত্যাগত কর্মকর্তা যারা ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে পারেননি, আবার কারও কারও যুদ্ধে অংশ নেওয়ার ইচ্ছেও ছিল না, তাদেরই অনেকে এই মর্মে গুজব ছড়াতে শুরু করেন যে রক্ষীবাহিনীর বাজেট সেনাবাহিনীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

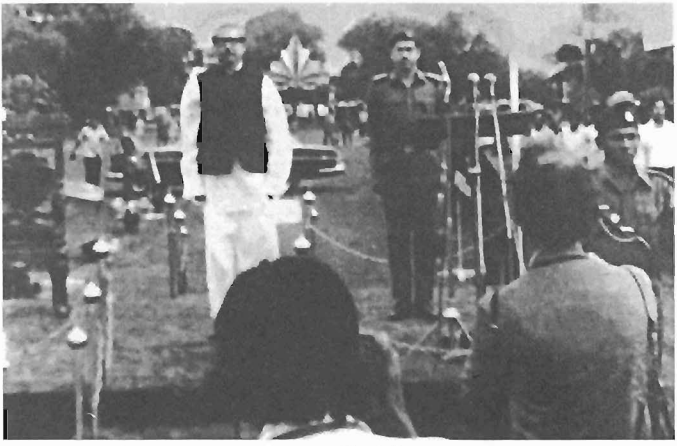

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মঞ্চে দাঁড়িয়ে রক্ষীবাহিনীর সালাম গ্রহণ করছেন। তাঁর পাশে পরিচালক এ এন এম নূরুজ্জামান

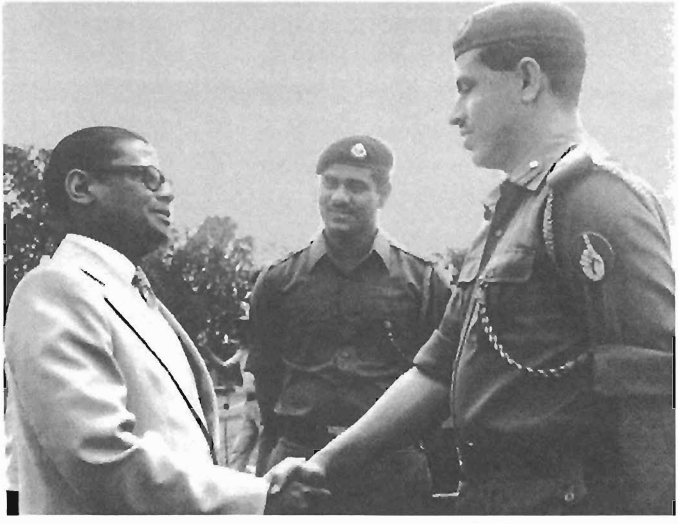

সাভার প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে স্বাগত জানাচ্ছেন রক্ষীবাহিনীর পরিচালক এ এন এম নূরুজ্জামান। মাঝে লেখক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাজেটের চেয়ে অনেক বেশি। এটা ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। আমার মনে আছে, ১৯৭৩-৭৪ অর্থবছরে রক্ষীবাহিনীর বাজেট ছিল সর্বসাকল্যে ৯ কোটি টাকা এবং সেনাবাহিনীর বাজেট ছিল ৯২ কোটি টাকা, যা আবার বাড়িয়ে ১২২ কোটি টাকা করা হয়েছিল। দুই বাহিনীর লোকবল হিসেবেও সেনাবাহিনীর জন্য বাজেটে অর্থ বরাদ্দ বেশি ছিল। আসলে পাকিস্তান প্রত্যাগত সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের অনেক খেদ ছিল, যা প্রকাশ্যে বলার মতো সাহস তাঁদের ছিল না। তাঁরা সাহসী হলে তো পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন। যেমন অংশ নিয়েছিলেন আবু তাহের বীর উত্তম, এম এ মঞ্জুর বীর উত্তম, মো. জিয়াউদ্দিন আহমেদ বীর উত্তম, এ এফ এম সামসুল আরেফিন[১৩] ও সাজ্জাদ আলী জহিরের[১৪] মতো অনেক বাঙালি সেনা কর্মকর্তা। যাদের সাহস নেই তারা একটা কাজ খুব ভালো করতে পারে, সেটি হলো সাহসীদের সমালোচনা। একজন সেনা কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ ও বেতন দেওয়া হয় দেশের জন্য যুদ্ধ করতে। যুদ্ধে নিহত হলে তাদের শহীদ হিসেবে গণ্য করা হয়, বীরত্ব দেখালে পদক দিয়ে সম্মানিত করা হয়। শত্রুর হাতে গ্রেপ্তার হলে বা শত্রুর কবলে থাকলে, তার একটাই দায়িত্ব থাকে। সেটা হচ্ছে শত্রুর কবল থেকে পালিয়ে আসা।

সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতায় পাকিস্তান থেকে সেনা কর্মকর্তারা ফিরে এলে দেখা গেল তাঁদের পরিবারের থাকার ব্যবস্থা বাংলাদেশে নেই। কারণ, পাকিস্তান শাসনামলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে পর্যাপ্ত সেনানিবাস এবং সেনা কর্মকর্তা ও সেনাদের থাকার মতো বাসস্থান বা ব্যারাক ছিল না। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল অনেক সেনানিবাস এবং পর্যাপ্ত বাসস্থান ও ব্যারাক। ১৯৪৭ সালের পর পাকিস্তান সরকার পশ্চিম পাকিস্তানে অনেক সেনানিবাস, সেনা কর্মকর্তা ও সেনাদের জন্য পর্যাপ্ত বাসস্থান-ব্যারাক নির্মাণ করে। পূর্ব পাকিস্তানে সে হারে করেনি। বাংলাদেশ সরকার অস্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে তাঁদের জন্য টিনের ঘর তৈরি করার অর্থ মঞ্জুর করে। কিন্তু সেই সব ঘর নির্মাণে অনেক দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে, তা-ও পাকিস্তান থেকে ফিরে আসা কয়েকজন সেনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে। তাঁরা ওই ঘর নির্মাণের দায়িত্বে ছিলেন। প্রত্যাগত সেনা কর্মকর্তা ও তাঁদের পরিবার ১৯৭১ সালের অক্টোবর-নভেম্বরের আগ পর্যন্ত পাকিস্তানে খুব আরাম-আয়েশে ছিলেন। কিছু কর্মকর্তা, যাঁরা পাকিস্তানিদের সহযোগিতা করেছেন, তাঁরা তো একেবারে শেষ পর্যন্ত আরাম-আয়েশেই ছিলেন। তাঁদের নাম আর উল্লেখ করলাম না। বাংলাদেশের টিনের ঘর তাঁদের ভালো লাগেনি। সরকারের হাতে অর্থ ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। যা বরাদ্দ করা হয়েছিল তা-ও সেনাবাহিনী সঠিকভাবে ব্যয় করতে পারেনি। এ ক্ষেত্রেও তাঁদের ক্ষোভ সৃষ্টি হয় বাংলাদেশের নতুন বাহিনী, মুক্তিযোদ্ধাদের বাহিনী জাতীয় রক্ষীবাহিনীর ওপর, যে বাহিনীর সদস্যরা ছাপরার নিচে গাদাগাদি করে থাকত।

সেনাবাহিনীতে এমন কথাও প্রচলিত ছিল, রক্ষীবাহিনীকে সেনাবাহিনী থেকে বেশি অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর মধ্যে এ ধারণা থাকার কথা কে এম সফিউল্লাহও তাঁর সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেছেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের মর্মান্তিক ঘটনার পর রক্ষীবাহিনীকে তার সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদসহ যখন সেনাবাহিনীর সঙ্গে আত্তীকরণ করা হয়, তখন কী দেখা গেল? রক্ষীবাহিনীর হাতে তেমন কোনো অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদই নেই। অস্ত্রের মধ্যে ছিল শুধু এসএমজি, রাইফেল, এলএমজি ও কয়েকটি মর্টার। তবে হ্যাঁ, নিজস্ব জায়গায় রক্ষীবাহিনীর কিছু স্থাবর সম্পত্তি ছিল। যেমন সাভারের প্রশিক্ষণকেন্দ্র, চট্টগ্রামের ভাটিয়ারীর জোনাল হেডকোয়ার্টার্স, খুলনার গিলতলা, সিলেটের বটেশ্বর, বগুড়া ও ঢাকার মিরপুরসহ আরও কয়েকটি জায়গায় জমি ও স্থাপনা ছিল। এসব স্থাবর সম্পত্তি সেনাবাহিনীকে হস্তান্তর করা হয়েছিল। এই সব সম্পদ বা সম্পত্তি রক্ষীবাহিনীর সুযোগ্য ও দূরদর্শী পরিচালক এ এন এম নূরুজ্জামানের অসাধারণ নেতৃত্ব, দক্ষতা, পরিশ্রম এবং প্রচেষ্টার ফলে হয়েছিল।

আসলে কোনো বাহিনীর প্রতিপক্ষ হিসেবে বা কারও ব্যক্তিগত বাহিনী হিসেবে রক্ষীবাহিনী গঠিত হয়নি। মুক্তিযুদ্ধ শেষে মুক্তিযোদ্ধাদের দেশের কাজে লাগিয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ বাহিনীকে সহযোগিতা করে গুপ্ত সর্বহারা, চরম বামপন্থী সন্ত্রাসী, অবৈধ অস্ত্রধারী ও আলবদর, আলশামস ও রাজাকার বাহিনীর মতো বাহিনীগুলোকে দমন করা এবং তাদের কাছ থেকে অস্ত্র উদ্ধার করে বাংলাদেশ নামের নতুন দেশটিকে একটা স্থায়ী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে জাতীয় রক্ষীবাহিনী অসাধারণ অবদান রেখেছে। শুধু তা-ই নয়, ১৯৭৫ সালের পর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পাঁচটি ব্রিগেডকে পাঁচটি ডিভিশনে উন্নীত করতে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে জাতীয় রক্ষীবাহিনী।

জাতীয় রক্ষীবাহিনীকে একটি সুশৃঙ্খল, সক্ষম ও কার্যকর বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এ এন এম নূরুজ্জামান দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। এ জন্য আমাদেরও কঠোর পরিশ্রম করতে হতো। ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সারা দেশে রক্ষীবাহিনী মোতায়েন করা সম্ভব হয় এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশের আইনশৃঙ্খলা-পরিস্থিতির উন্নতিতে বাংলাদেশ পুলিশের সহযোগী ও সহায়ক-শক্তি হিসেবে দারুণ সাফল্য অর্জন করে। এ কারণে প্রশংসাকারী ও সমালোচনাকারী উভয়ের দৃষ্টিই পড়ে রক্ষীবাহিনীর ওপর। এতে বাংলাদেশ পুলিশ ও বিডিআরের মধ্যে কোনো ঈর্ষার ভাব লক্ষ করা যায়নি। তবে সেনাবাহিনীর মধ্যে ঈর্ষার ভাব ছিল প্রথম থেকেই। এর কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, সেনাবাহিনীর মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব ছিল। অপ্রীতিকর হলেও কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। যেমন—

ক. বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে অভিজ্ঞতা ও একতার অভাব ছিল। তা ছাড়া নেতৃত্বের শীর্ষে থাকা তিন কর্মকর্তার মধ্যে ছিল বিভেদ ও মতানৈক্য। ফলে কে এম সফিউল্লাহর ঐকান্তিক চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও তাঁর নেতৃত্ব সব স্তরের সেনাসদস্যের পূর্ণ আস্থা ও অবিভাজ্য আনুগত্য অর্জনে সমর্থ হয়নি।

খ. সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে কে এম সফিউল্লাহ নিজ পদ ও দায়িত্বে সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু তাঁর চেয়ে একটু জ্যেষ্ঠ জিয়াউর রহমান ও পাকিস্তান-প্রত্যাগত জ্যেষ্ঠ সেনা কর্মকর্তারা মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না।

গ. জিয়াউর রহমান দিন গুনছিলেন তিনি কখন এবং কীভাবে সেনাপ্রধান হবেন। সে জন্য তাঁর প্রতি আস্থাশীল ব্যক্তিদের নিয়ে সেনাবাহিনীর মধ্যে নিজের একটা বলয় তৈরি করতে সচেষ্ট ছিলেন তিনি।

ঘ. সেনাবাহিনীর চিফ অব দ্য জেনারেল স্টাফ (সিজিএস) খালেদ মোশাররফের (তখন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল) লক্ষ্যই ছিল জিয়াউর রহমানকে পাশ কাটিয়ে কে এম সফিউল্লাহর মেয়াদের পর সেনাপ্রধান হওয়া। এ ব্যাপারে নিজের পথ সুগম করতে তিনি ১৯৭৪ সালেই জিয়াউর রহমানকে পূর্ব জার্মানিতে[১৫] রাষ্ট্রদূত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাজি করিয়েছিলেন। এতে শঙ্কিত হয়ে জিয়াউর রহমান রাজনীতিক মো. জিল্লুর রহমান[১৬], তোফায়েল আহমেদ, নূরুল ইসলাম চৌধুরী[১৭], গাজী গোলাম মোস্তফা, আনোয়ার হোসেন মঞ্জু[১৮] প্রমুখ আওয়ামী লীগের নেতার কাছে তদবির করেছিলেন।

জিয়াউর রহমান এমনকি আমার কাছেও তদবির করেছিলেন। বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। কারণ, এর পরিণতিতে বাংলাদেশের ইতিহাস পরিবর্তিত হয়েছিল এবং এ জন্য আমি নিজেকে সব সময় অপরাধী মনে করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিয়াউর রহমানের স্ত্রী খালেদা জিয়ার[১৯] বড় বোন ছিলেন খুরশিদ জাহান হক[২০]। চকলেট আপা নামে তিনি পরিচিত ছিলেন। তিনি কয়েক বছর টাঙ্গাইল কুমুদিনী মহিলা কলেজে পড়াশোনা করেন। আমার মেজো বোন ফেরদৌস জাহান, খন্দকার আসাদুজ্জামানের[২১] স্ত্রী কুলসুম আপা এবং ড. আর এ গনির[২২] স্ত্রী এলি আপাও তখন টাঙ্গাইল কুমুদিনী মহিলা কলেজে পড়াশোনা করতেন। তাঁরা চারজন বান্ধবী ছিলেন। এ ছাড়া আমার বাবা মৌ. আবদুর রাহীম ইছাপুরী ছিলেন খুরশিদ জাহান হকের স্থানীয় অভিভাবক। ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত খুরশিদ জাহান হক মাঝেমধ্যে ছুটির দিনগুলোতে আমাদের বাসা ইছাপুরী লজে থাকতেন। সেই সূত্রে তাঁর পরিবারের সঙ্গে আমাদের খানিকটা ঘনিষ্ঠতা হয় এবং তা পরেও অক্ষুণ্ন ছিল।

১৯৭৪ সালে একদিন, এখন তারিখ মনে নেই, ছুটির দিনে চকলেট আপা তাঁর বাসায় দুপুরবেলা আমাকে খেতে যেতে বলেন। তিনি ও তাঁর স্বামী ইস্কাটনে থাকতেন। ভাবলাম, অনেককেই হয়তো তিনি দাওয়াত দিয়েছেন। কিন্তু গিয়ে দেখি, বাসায় শুধু চকলেট আপা ও তাঁর স্বামী মোজাম্মেল হক (তখন ট্যানারিজ করপোরেশনের ফাইন্যান্স ডিরেক্টর) আছেন। আর কেউ নেই। ভাবলাম, আর কাউকে হয়তো বলেননি। তাঁদের সঙ্গে গল্প করছিলাম। কিছুক্ষণ পর সেখানে জিয়াউর রহমান ও তাঁর স্ত্রী খালেদা জিয়া উপস্থিত হন। এই সময় চকলেট আপা আমাকে বললেন, 'জিয়া তোর সঙ্গে কথা বলতে চায়।' আমাদের দুজনকে ড্রয়িংরুমে রেখে তাঁরা সবাই ভেতরে চলে গেলেন। জিয়াউর রহমানের সঙ্গে এর আগেও অনেকবার দেখা হয়েছে। বিভিন্ন পারিবারিক অনুষ্ঠানে, বিশেষ করে চকলেট আপার বাসায় ও এলি আপার ধানমন্ডির বাসায়। সব সময় তাঁকে একটু গম্ভীর মনে হয়েছে। কিন্তু এই দিন তাঁকে অনেকটা স্বাভাবিক ও বন্ধুসুলভ মনে হলো। তিনি এটা-সেটা আলাপের পর বললেন, সরকার তাঁকে পূর্ব জার্মানিতে রাষ্ট্রদূত করে পাঠাতে চায়। কিন্তু তিনি সেখানে যেতে চান না। তিনি ভেবেছেন, আমি বঙ্গবন্ধুর খুব কাছের মানুষ। আমি বললে বঙ্গবন্ধু সেই আদেশ বাতিল করতে পারেন। আমি তাঁকে বোঝালাম, বঙ্গবন্ধুর কাছে সুপারিশ করার মতো অবস্থান আমার নেই এবং আমি বললেও এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধু কোনো গুরুত্ব দেবেন না। তার চেয়ে আপনি আগরতলা মামলায় যাঁরা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে অভিযুক্ত ছিলেন, তাঁদের বলেন। বঙ্গবন্ধু তাঁদের কথার গুরুত্ব দিতে পারেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার কথামতো জিয়াউর রহমান আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত এম শওকত আলী ও ডা. শামসুল আলমের[২৩] কাছে যেতে পারেননি। শুধু ডা. খুরশিদ উদ্দিন আহমেদকে[২৪] নিয়ে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলেন এবং তাঁর বদলি আদেশটি বাতিল করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে এর পরিণতি যা হয়েছিল, তা নিয়ে খুরশিদ উদ্দিন আহমেদ ও আমি, দুজনই নিজেদের সব সময়ই অপরাধী মনে করি।

ঙ. আবার সেনাবাহিনীতে খালেদ মোশাররফের চেয়ে জ্যেষ্ঠ ছিলেন মীর শওকত আলী[২৫]। তিনি সে সময় যশোরে ব্রিগেড কমান্ডার ছিলেন। যশোরের কই মাছ ছিল বঙ্গবন্ধুর প্রিয়। মীর শওকত আলী বঙ্গবন্ধুর জন্য নিয়মিত যশোরের কই মাছ পাঠাতে থাকেন এবং তাঁর আসল কাজ রেখে কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা করেন। এ জন্য কৃষিপদকও পেয়েছিলেন। খালেদ মোশাররফকে ব্রিগেডিয়ার ও সিজিএস করায় তিনি মনঃক্ষুণ্ন হন। সে জন্য তাঁর আনুগত্য ছিল জিয়াউর রহমানের প্রতি।

চ. পাকিস্তান-প্রত্যাগত জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের মধ্যে খাজা ওয়াসিউদ্দিনকে কুয়েতে রাষ্ট্রদূত করে পাঠানো হয়। অন্যদের মধ্যে খলিলুর রহমান[২৬], মাজেদুল হক[২৭], কাজী গোলাম দস্তগীর[২৮], হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ও অন্যরা মাথা গুঁজে চাকরি করতে থাকেন। তাঁরা সবাই এ ভেবে অপেক্ষায় ছিলেন যে, সুযোগ একটা এসে যেতে পারে।

ছ. ১৯৭৩ সালের পর মুক্তিযোদ্ধা সেনা কর্মকর্তা ও পাকিস্তান-প্রত্যাগত অমুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দ্বন্দ্ব লেগেই ছিল। সরকারের পক্ষে মুক্তিযুদ্ধের বীরদের আর্থিক সুবিধা দেওয়ার মতো সামর্থ্য ছিল না। তাই তাঁদের দুই বছর জ্যেষ্ঠতা দেওয়া হয়েছিল। এ নিয়ে অমুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে অসন্তুষ্টি বাড়তে থাকে।

জ. পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে সেনাসদস্যদের যেসব সুযোগ-সুবিধা ছিল, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে সেসব সুযোগ-সুবিধা দেওয়া সরকারের পক্ষে সহজ ছিল না। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের কঠিন বাস্তবতা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন অনেক সেনা কর্মকর্তা। যাঁরা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, তাঁরা তাঁদের পেশাগত জীবনে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

ঝ. সাধারণ সেনাসদস্যদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠতে থাকে নানা কারণে। একটা উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে কর্মকর্তাদের 'ব্যাটম্যান' হিসেবে সাধারণ সৈনিকদের কাজ করতে অনাগ্রহ। এ ছাড়া বেতন, বাসস্থান ও অন্যান্য বিষয়ে সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে অসন্তোষ ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

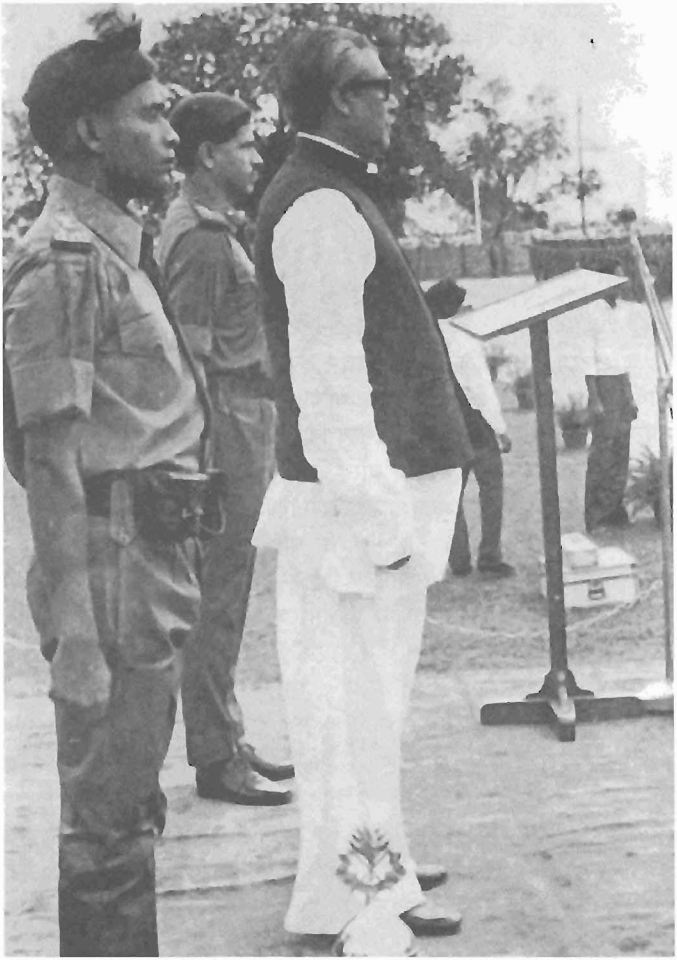

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের সালাম গ্রহণ করছেন। পেছনে প্যারেড কমান্ডার লিডার মোজাফ্ফর হোসেন এবং বাহিনীর পরিচালক এ এন এম নুরুজ্জামান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরও কারণ ছিল। সব মিলে সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে শৃঙ্খলার অভাব লক্ষণীয় ছিল। দৃশ্যত ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তাদের উদ্যোগ, পরিশ্রম ও দূরদৃষ্টির অভাবে সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন ও অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা সম্ভব হয়নি, যা সম্ভব হয়েছিল এ এন এম নূরুজ্জামানের নেতৃত্বে জাতীয় রক্ষীবাহিনীতে। এর ফলে সেনাসদস্যদের মধ্যে ঈর্ষাভাব সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না।

অথচ অভিজ্ঞ, বিচক্ষণ, একাগ্র, পেশাদার ও গুণাবলিসম্পন্ন নিঃস্বার্থ নেতৃত্ব গড়ে তুলতে পারলে ওই সময় সীমিত সম্পদের মধ্যেও দ্রুত একটা শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব ছিল। কিন্তু সেনা নেতৃত্বের মধ্যে দেশপ্রেম, সাহস ও দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও নিজেদের মধ্যে দলাদলির কারণে তাদের দৃষ্টি ছিল অন্যত্র। সে জন্য সব ব্যর্থতার দায়ভার নবগঠিত রক্ষীবাহিনীর ওপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা দৃশ্যমান ছিল।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করছি। জাতীয় রক্ষীবাহিনীর প্রধান কার্যালয় ও সাভার প্রশিক্ষণকেন্দ্রে দায়িত্ব পালনের জন্য কয়েকজন রক্ষী সদস্যকে বাহিনীর রক্ষীপুলিশ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। তাদের পোশাক রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের মতোই থাকে, তবে তাদের ব্যারেট (টুপি) দেওয়া হয় লাল রঙের। এতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রতিক্রিয়া হয়। সেনাসদর আর মিলিটারি পুলিশ এতে আপত্তি জানায়। তখন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল ছিলেন হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। তিনি রক্ষীবাহিনীর পরিচালককে একটা চিঠি লিখে জানান, মিলিটারি পুলিশ লাল ব্যারেট পরে, তাই রক্ষীপুলিশ লাল ব্যারেট পরতে পারে না। আমরা সুন্দর করে একটা ছোট উত্তর লিখলাম যে, সেনাসদর হয়তো খেয়াল করেনি যে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরাও লাল ব্যারেট পরেন। উপপরিচালক সরোয়ার হোসেন মোল্লা স্বাক্ষরিত চিঠিটি অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেলের কাছে পাঠানো হয়। তারপর সেনাসদর এ ব্যাপারে আর উচ্চবাচ্য করেনি।

রক্ষীবাহিনী সম্পর্কে সেনাবাহিনীর পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যেও তখন এবং ১৯৭৫ সালের পর কয়েক বছর নানা বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়। প্রয়াত এনায়েতুল্লাহ খানের সর্বদা সমালোচনাকারী পত্রিকা সাপ্তাহিক *হলিডে*, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের মুখপত্র দৈনিক *গণকণ্ঠ* ও ভাসানী ন্যাপের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত সাপ্তাহিক *হক-কথা* পত্রিকায় রক্ষীবাহিনী সম্পর্কে প্রচুর লেখালেখি হয়। কয়েকজন রাজনীতিকও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রক্ষীবাহিনী বিলুপ্ত হওয়ার কয়েক বছর পর রাজনীতিক মওদুদ আহমদ তাঁর *Bangladesh: The Era of Sheikh Mujibur Rahman* বইতে রক্ষীবাহিনী সম্পর্কে অনেক কিছু লিখেছেন। এর বেশির ভাগই মিথ্যা, আংশিক সত্য ও অর্ধসত্য। তবে তিনি স্বীকার করেছেন, 'যা-ই হোক, জাতীয় রক্ষীবাহিনী কোনো ভালো কাজ করেনি, এ কথা ঠিক নয়। বিপুল পরিমাণ বেআইনি অস্ত্র এরা উদ্ধার করেছে এবং আটক করেছে প্রচুর পরিমাণে চোরাচালানকৃত পণ্য। কালোবাজারি এবং অবৈধ গুদামজাতকারীরা রক্ষীবাহিনীর নাম শুনেই আতঙ্কবোধ করত।' তাঁর বইতে রক্ষীবাহিনীর প্রশংসা এটুকুই। বাকি অংশে রক্ষীবাহিনী সম্পর্কে যা লিখেছেন, তার সবই সমালোচনামূলক। এসব সমালোচনার জবাব ইতিমধ্যেই দিয়েছি। তবে মওদুদ আহমদ সম্পর্কে এ কথা অবশ্যই বলতে হয়, একজন তুখোড় আইনজীবী হিসেবে তিনি যেকোনো বিষয়ের পক্ষে যেমন যুক্তি দিয়ে বলতে পারেন, তেমনি যুক্তি দিয়ে বলতে পারেন বিপক্ষেও। কাজেই তাঁর কথায় পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখা মুশকিল।

আমাদের দেশে কিছু কথা প্রচলিত আছে, যার মধ্য দিয়ে বাঙালির অন্তর্নিহিত চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে। যেমন, 'যত দোষ নন্দ ঘোষ', 'যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা' ইত্যাদি। জাতীয় রক্ষীবাহিনী সম্পর্কে যত সমালোচনা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে, তা বিশ্লেষণ করলে উপরিউক্ত প্রবাদকথা যথাযথ বলে মনে হয়। আমাদের দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার পর থেকেই আমরা খেয়াল করছি, একশ্রেণীর বাঙালি দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধাদের দোষত্রুটি খুঁজে বের করতে ব্যস্ত। তারা কিন্তু ১৯৭১ সালে যারা ইসলামের নামে পাকিস্তানকে সমর্থন করেছে, তাদের সমালোচনা করেনি। এমনকি তারা মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগী রাজাকার, আলবদর ও আলশামস বাহিনীর নির্মম নির্যাতন আর নিষ্ঠুরতার কথাও বলেনি। আসলে জাতীয় রক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে যত অভিযোগ, তার বেশির ভাগই ছিল পাকিস্তানি মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি ও দেশবিরোধী চরম বামপন্থী সন্ত্রাসী দলগুলোর সুপ্ত সমর্থকদের আজগুবি বয়ান।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি কথা। স্বাধীনতার পর পাকিস্তানিদের ফেলে যাওয়া বাড়িঘর প্রভাবশালী ব্যক্তিরা দখল করতে থাকে। কেউ রাজনৈতিক, কেউ প্রশাসনের ছত্রচ্ছায়ায় বাড়িঘর ও অন্যান্য সম্পত্তি দখল করতে থাকে। আবার মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত অনেককে সরকার অস্থায়ীভাবে থাকার জন্য পাকিস্তানিদের ফেলে যাওয়া বাড়িঘর বরাদ্দ দেয়। যারা অবৈধ দখলদার ছিল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের অপসারণ করার জন্য সরকার পুলিশের পাশাপাশি নিয়োগ করে রক্ষীবাহিনীকেও। এ কাজে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ মোতাবেক বেশ কিছুদিন অপসারণের অভিযান চলে। এ নিয়ে তখন, বিশেষত অবৈধ দখলদারদের সম্পর্কে বিভিন্ন পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হতো। কোনো অভিযোগ উঠলেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো। এ সময় ভুল তথ্যের ভিত্তিতে বৈধভাবে বরাদ্দ পাওয়া কয়েকজনকে বাড়ি থেকে পুলিশ বা রক্ষীবাহিনী কর্তৃক উচ্ছেদের ঘটনাও ঘটে। একবার অভিনেত্রী সুমিতা দেবী আমাকে জানান, শহীদ জহির রায়হানের স্ত্রী হিসেবে সরকার মোহাম্মদপুরে তাঁকে একটা বাড়ি দিয়েছে। কিন্তু পুলিশ তাঁকে সেই বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে পথে বসিয়েছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে তখনকার ঢাকার এসপি মুক্তিযোদ্ধা মাহবুবউদ্দিন আহমেদ[২৯] ও জেলা প্রশাসক সৈয়দ রেজাউল হায়াতকে[৩০] বলে সুমিতা দেবীকে তাঁর নামে বরাদ্দ দেওয়া বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করি। কিন্তু রক্ষীবাহিনী কাউকে তার জন্য বরাদ্দ করা বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে, এমন তথ্য আমার কাছে কখনো আসেনি।

কিছুদিন আগে খ্যাতনামা লেখক মুহম্মদ জাফর ইকবালের একটি লেখা পড়ে আমি খুব লজ্জিত ও বিব্রত বোধ করি। তিনি আমার ও আমার স্ত্রীর খুব প্রিয় একজন লেখক এবং তাঁর প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে। তিনি লেখেন, রক্ষীবাহিনী তাঁর বিধবা মাকে সরকারিভাবে বরাদ্দ করা বাড়ি থেকে উৎখাত করে সত্যিকার অর্থে পথে নামিয়ে দেয়। তাঁর বাবা ফয়জুর রহমানকে ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি চিন্তাই করতে পারি না, একটি শহীদ পরিবারকে বাড়িছাড়া করা হবে। তা-ও আবার সেই বাহিনী কর্তৃক, যে বাহিনীতে আমি চাকরি করেছি এবং যেটি ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের বাহিনী। বিষয়টি আমার একেবারে অগোচরে ছিল। তখন হয়তো আমি অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত বা দেশের বাইরে ছিলাম। এত দিন পরে বিষয়টি জানার পর একটা অপরাধবোধ আমাকে কুরে কুরে খেতে থাকে।

এই অপরাধবোধ থেকেই একদিন আমি রক্ষীবাহিনীর পরিচালক প্রয়াত এ এন এম নূরুজ্জামানের স্ত্রী দিল আফরোজ জামানের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলি। তিনি আমাকে জানান যে ঘটনাটি পুরোপুরি সত্যি নয়। কারণটা তাঁর মা আয়েশা ফয়েজের লেখা বই *জীবন যে রকম* পড়লে স্পষ্টভাবে জানা যাবে। কয়েক দিন পর মিসেস জামান আমাকে বইটা সংগ্রহ করে দেন। সেই বই পড়ে জানতে পারলাম, রক্ষীবাহিনী সত্যিই বরাদ্দ করা বাড়ি থেকে তাঁকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বের করে দিয়েছিল। কিন্তু খবরটা পেয়েই আমাদের পরিচালক নিজে মুহম্মদ জাফর ইকবালের মা আয়েশা ফয়েজকে ফোন করেন এবং বরাদ্দ করা ওই বাড়িতেই তাঁর থাকার ব্যবস্থা করেন। *জীবন যে রকম* বইটা পড়ে আমি সত্যিই আমাদের পরিচালক এ এন এম নূরুজ্জামানের সংবেদনশীল মনোভাবের জন্য গর্ব অনুভব করি। কিন্তু আমার প্রিয় লেখক মুহম্মদ জাফর ইকবাল বিষয়টি তাঁর লেখায় উল্লেখ করেননি। ফলে আমিও তাঁর লেখা পড়ে বিভ্রান্ত হই। আমার নিজের যখন এ অবস্থা, তখন সাধারণ মানুষের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। প্রকৃতপক্ষে রক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে যত অপপ্রচার করা হয়েছে, তার সব সত্য নয়। কিছু সত্য, কিছু কিছু অর্ধসত্য এবং বেশির ভাগ নির্জলা মিথ্যা। এ জন্যই এই ঘটনার অবতারণা করলাম।

তথ্যনির্দেশ

১. রক্ষীবাহিনীর চতুর্থ ব্যাচের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ উপলক্ষে প্রকাশিত স্যুভেনিরের মুখবন্ধ। পরিশিষ্ট ৮ দেখুন।

২. যাঁরা রক্ষীবাহিনীর কর্মকর্তা ছিলেন। পরিশিষ্ট ৯ দেখুন।

৩. কে এম সফিউল্লাহর সাক্ষাৎকার। পরিশিষ্ট ১০ দেখুন।

৪. মইনুল হোসেন চৌধুরী বীর বিক্রম: পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালে মেজর এবং দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে কর্মরত ছিলেন। এর অবস্থান ছিল জয়দেবপুরে। মার্চে অসহযোগ আন্দোলনের সময় ১৯ মার্চ জয়দেবপুরে সাধারণ জনগণের ওপর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আক্রমণচেষ্টা তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে মোকাবিলা করেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন তাতে। মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রথমে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের, পরে দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা অনন্য। পরে মেজর জেনারেল হন। সেনাবাহিনীতে কর্মরত থাকাকালে প্রেষণে তিনি বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০০ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন।

৫. এম সাখাওয়াত হোসেন: ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, পরে সামরিক বিষয়ে বিশ্লেষক ও নির্বাচন কমিশনার (২০০৭-১১)।

৬. জয়নাল আবেদীন: পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল ও বরখাস্ত।

৭. মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন আহমেদ বীর উত্তম। ১৯৭১ সালে সেনাবাহিনীর মেজর হিসেবে পাকিস্তানে (তখন পশ্চিম পাকিস্তান) কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলে জুলাই মাসে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে তাতে যোগ দেন। তাঁকে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর জেড ফোর্সের অধীন প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা অনন্য। চাকরিতে থাকা অবস্থায় ১৯৭৪ সালে সাপ্তাহিক *হলিডে* পত্রিকায় নিবন্ধ লেখার জন্য শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে তাঁকে চাকরিচ্যুত করা হয়। তখন তাঁর পদবি ছিল লেফটেন্যান্ট কর্নেল।

৮. আবু তাহের বীর উত্তম : ১৯৭১ সালে সেনাবাহিনীর মেজর হিসেবে পাকিস্তানে (তখন পশ্চিম পাকিস্তান) কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে জুলাই মাসে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে তাতে যোগ দেন। তাঁকে ১১ নম্বর সেক্টরের সেক্টর অধিনায়ক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। ১৪ নভেম্বর কামালপুর যুদ্ধে আহত হন। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা অনন্য। ১৯৭২ সালের এপ্রিলে বিদেশে চিকিৎসা শেষে দেশে ফেরেন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল পদে নিয়োগ পান। জুন মাসে ৪৪ ব্রিগেড অধিনায়ক নিযুক্ত হন। সেনাসদরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করায় ১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁকে সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করা হয়। এরপর তিনি জাসদে যোগ দেন। সহসভাপতি ছিলেন। জাসদে থাকাকালে গণবাহিনী গঠন করেন। ১৯৭৩ সালে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়াধীন ড্রেজার সংস্থার পরিচালক নিযুক্ত হন। ১৯৭৫ সালের নভেম্বরের অভ্যুত্থান ও পাল্টা অভ্যুত্থানের ঘটনায় তাঁকে ২৫ নভেম্বর আটক করা হয়। ১৯৭৬ সালে সামরিক আদালতের বিচারে ১৭ জুলাই তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। তাঁর মৃত্যুদণ্ড ২১ জুলাই কার্যকর করা হয়।

৯. সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম বীর প্রতীক : ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে লেফটেন্যান্ট এবং দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তাতে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে প্রথমে ৩ নম্বর সেক্টরে, পরে 'এস' ফোর্সের অধীনে যুদ্ধ করেন। ১৯৯৬ সালে মেজর জেনারেল হিসেবে কর্মরত থাকা অবস্থায় কথিত অভ্যুত্থানের অভিযোগে তাঁকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করা হয়। তখন তিনি যশোরের জিওসি ছিলেন। বর্তমানে রাজনীতিক। বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি।

১০. দানিয়েল ইসলাম : পরে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হন।

১১. এন এ রফিকুল ইসলাম : ১৯৭৫ সালে রক্ষীবাহিনী বিলুপ্ত হওয়ার পর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হন। পরে মেজর জেনারেল হন।

১২. এম এম ইকবাল আলম। রক্ষীবাহিনী বিলুপ্ত হওয়ার পর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হন। পরে উন্নীত হন কর্নেল পদে।

১৩. এ এফ এম সামসুল আরেফিন : ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেফটেন্যান্ট ছিলেন। পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে ৯ নম্বর সেক্টরের শমশেরনগর সাবসেক্টরে যুদ্ধ করেন। পরে মেজর হন। বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধ গবেষক।

১৪. সাজ্জাদ আলী জহির বীর প্রতীক: ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট ছিলেন। পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে ২ নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করেন। মুক্তিবাহিনীর আর্টিলারি ইউনিট মুজিব ব্যাটারির সহ-অধিনায়ক ছিলেন। পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদে উন্নীত হন। বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধ গবেষক।

১৫. বর্তমানে পূর্ব জার্মানি নামে কোনো দেশ নেই। পূর্ব জার্মানি পরে পশ্চিম জার্মানির সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। পশ্চিম জার্মানি নামেও দেশ নেই। একীভূত পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির বর্তমান নাম ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানি।

১৬. কয়েকবার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। ১৯৯৬-২০০১ সালে বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী। ২০০৯ সালে স্বল্প সময়ের জন্য মন্ত্রী। পরে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি (২০০৯-২০১৩)।

১৭. নূরুল ইসলাম চৌধুরী: ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বৃহত্তর চট্টগ্রামা এলাকা থেকে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সদস্য হন ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে। বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভায় প্রতিমন্ত্রী ছিলেন।

১৮. আনোয়ার হোসেন মঞ্জু: একাধিকবার বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী। বর্তমানে *দৈনিক ইত্তেফাক*-এর সম্পাদক ও জাতীয় পার্টির (জেপি) সভাপতি।

১৯. খালেদা জিয়া: সাবেক প্রধানমন্ত্রী। বর্তমানে সাংসদ, জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারপারসন।

২০. খুরশিদ জাহান হক: ২০০১-০৬ সালে খালেদা জিয়ার শাসনামলে মন্ত্রী।

২১. খন্দকার আসাদুজ্জামান: মুক্তিযোদ্ধা। বাংলাদেশ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত সচিব। বর্তমানে সাংসদ।

২২. ড. আর এ গনি: ১৯৭৮-৮২ সালে জিয়াউর রহমান ও বিচারপতি আবদুস সাত্তারের মন্ত্রিসভায় প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) স্থায়ী কমিটির সদস্য।

২৩. ডা. শামসুল আলম: আগরতলা মামলার ২৪ নম্বর আসামি ছিলেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মেজর, পরে কর্নেল।

২৪. ডা. খুরশিদ উদ্দিন আহমেদ: আগরতলা মামলার ৩৪ নম্বর আসামি। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন এবং মেডিকেল কোরে চাকরি করতেন। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেডিকেল কোরে অন্তর্ভুক্ত হন। পরে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৫. মীর শওকত আলী বীর উত্তম : ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মেজর ও অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে ঝাঁপিয়ে পড়েন যুদ্ধে। বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রতিরোধযুদ্ধে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পরে ৫ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক নিযুক্ত হন। ১৯৭৫ সালে কর্নেল। পরবর্তী সময়ে লেফটেন্যান্ট জেনারেল, রাষ্ট্রদূত। ১৯৯১-৯৫ সালে খালেদা জিয়ার মন্ত্রিসভায় মন্ত্রী।

২৬. খলিলুর রহমান : ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এবং তখন পশ্চিম পাকিস্তানে (বর্তমান পাকিস্তান) কর্মরত ছিলেন। ১৯৭৩ সালে পাকিস্তান থেকে ফিরে আসার পর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হন। মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতি পান। ১৯৭৫ সালে বিডিআরের মহাপরিচালক হন।

২৭. মাজেদুল হক : ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এবং তখন পশ্চিম পাকিস্তানে (বর্তমান পাকিস্তান) কর্মরত ছিলেন। ১৯৭৩ সালে পাকিস্তান থেকে ফিরে আসার পর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হন। পরে মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতি পান। ১৯৭৮-৮২ সালে জিয়াউর রহমান ও বিচারপতি আবদুস সাত্তারের মন্ত্রিসভায় এবং ১৯৯১-১৯৯৬ সালে খালেদা জিয়ার মন্ত্রিসভায় মন্ত্রী হন।

২৮. কাজী গোলাম দস্তগীর : ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কর্নেল এবং তখন পশ্চিম পাকিস্তানে (বর্তমান পাকিস্তান) কর্মরত ছিলেন। ১৯৭৩ সালে পাকিস্তান থেকে ফিরে আসার পর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হন। পরে মেজর জেনারেল ও রাষ্ট্রদূত হন।

২৯. মাহবুবউদ্দিন আহমেদ বীর বিক্রম : ১৯৭০ সালে ঝিনাইদহ মহকুমার মহকুমা পুলিশ প্রশাসক (এসডিপিও) ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ৮ নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করেন। জুলাই থেকে ভোমরা সাবসেক্টরের অধিনায়ক ছিলেন। স্বাধীনতার পর ঢাকা জেলার পুলিশ প্রশাসক (এসপি) ছিলেন। বর্তমানে ব্যবসায়ী।

৩০. সৈয়দ রেজাউল হায়াত : মুক্তিযোদ্ধা, বাংলাদেশ সরকারের সচিব, চার্টার্ড ইনস্টিটিউট অব লজিস্টিক অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টের প্রেসিডেন্ট, সেক্টর কমান্ডারস ফোরামের সহসভাপতি, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা ফোরামের সভাপতি এবং *ডেইলি স্যান* ও বাংলাদেশ হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা ছিলেন। মৃত্যু ১৬ এপ্রিল ২০১২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিরাজ শিকদার ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

সিরাজ শিকদার পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টির নেতা ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে 'শ্রেণীশত্রু খতম' করার অভিযানে বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জে সর্বহারা দলের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা স্থানীয় জোতদার ও রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের নির্বিচারে হত্যা করতে শুরু করে। তারা মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে রক্ষীবাহিনীর লিডার ফারুক হোসেনকে প্রকাশ্য হাটে নির্মমভাবে হত্যা[১] করে। বিভিন্ন থানা ও পুলিশ ফাঁড়িতে গেরিলা হামলা করে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করতে থাকে এবং দেশের কয়েকটি বিশেষ জায়গায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করার চেষ্টা করে। এ সময় মুক্তিযোদ্ধা সেনা কর্মকর্তা মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন আহমেদ (তখন লেফটেন্যান্ট কর্নেল) চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়ে সিরাজ শিকদারের সর্বহারা দলে যোগ দেন। ১৯৭৪ সালে সর্বহারা পার্টির সন্ত্রাসীরা নলছিটির সাংসদ আবদুল মুকিমকে এবং ১৯৭৫ সালে নেত্রকোনার সাংসদ আবদুল মালেক ও মনোহরদীর সাংসদ গাজী ফজলুর রহমানসহ বহু রাজনৈতিক নেতা-কর্মীকে হত্যা করে। ১৯৭৪ সালেই বাংলাদেশ পুলিশ ও জাতীয় রক্ষীবাহিনী কখনো যৌথভাবে, কখনো আলাদাভাবে সর্বহারা পার্টির বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে। একপর্যায়ে সারা দেশে কোণঠাসা হয়ে পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টির সশস্ত্র ক্যাডাররা পার্বত্য চট্টগ্রামের (বর্তমান খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি ও বান্দরবান জেলা সমন্বয়ে ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম) দুর্গম স্থানে ঘাঁটি স্থাপন করে। বাংলাদেশ পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীর এই অভিযান ১৯৭৫ সালেও অব্যাহত ছিল।

১৯৭৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর সিরাজ শিকদার গ্রেপ্তার এবং কয়েক দিন পর নিহত হন। বাংলাদেশের অনেকেই মনে করেন, সিরাজ শিকদারকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রক্ষীবাহিনী হত্যা করেছে। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা অপবাদ। এ ঘটনার সঙ্গে রক্ষীবাহিনী কোনোভাবেই জড়িত ছিল না। শুধু কিছু সময়ের জন্য তাঁকে রক্ষীবাহিনীর শেরেবাংলা নগরের কার্যালয়ে রাখা হয়েছিল। তাঁর ব্যাপারে রক্ষীবাহিনীর আর কোনো সংশ্লিষ্টতা ছিল না। কিন্তু এর সম্পূর্ণ দায় চাপানো হয়েছে রক্ষীবাহিনীর ওপর।

পুলিশ সিরাজ শিকদারকে গ্রেপ্তার করে চট্টগ্রামে। সেখান থেকে তাদের তত্ত্বাবধানে তাঁকে ঢাকায় আনা হয় এবং পুলিশ হেফাজতে হোয়াইট হলে[২] রাখা হয়। ১৯৭৫ সালের ১ জানুয়ারি সকালবেলা শেরেবাংলা নগরে অবস্থিত আমাদের অফিসে এসে জানতে পারি, মধ্যরাতে সিরাজ শিকদারকে আমাদের অফিসার্স মেসে আনা হয়েছে। খবরটা পেয়েই আমি সহকর্মী সরোয়ার হোসেন মোল্লার সঙ্গে ঘটনাটি নিয়ে কথা বলি। আলোচনার পর দুজন একমত হই, সিরাজ শিকদারকে রক্ষীবাহিনীর অফিসার্স মেসে রাখা ঠিক হবে না। আমরা দুজন একসঙ্গে আমাদের পরিচালক এ এন এম নূরুজ্জামানের অফিসকক্ষে যাই। পরিচালককে আমরা বলি, সিরাজ শিকদারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে, সে জন্য তাঁকে পুলিশের হেফাজতেই রাখা হোক। আমাদের এখানে নয়। রক্ষীবাহিনীকে নিয়ে এমনিতেই সমালোচনার শেষ নেই। তার ওপর যাঁকে আমরা গ্রেপ্তার করিনি, তাঁর দায়িত্ব কেন নেব। উত্তরে পরিচালক এ এন এম নূরুজ্জামান বলেন, স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিআইজি ই এ চৌধুরীর অনুরোধে তিনি সিরাজ শিকদারকে এখানে রাখার অনুমতি দিয়েছেন। কারণ, সিরাজ শিকদারের মতো সর্বহারা পার্টির একজন দুর্ধর্ষ নেতাকে হোয়াইট হলে রাখা নিরাপদ নয়।

পুলিশের বেশির ভাগ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাই তখন পুলিশের চেয়ে রক্ষীবাহিনীর ওপর বেশি ভরসা করতেন, বিশেষ করে, সিরাজ শিকদারের মতো বড় সর্বহারা নেতাকে নিরাপদে রাখার ব্যাপারে। সরোয়ার ও আমি দুজনই জোর দিয়ে পরিচালককে বলি, সিরাজ শিকদারকে রক্ষীবাহিনীর অফিসার্স মেসে রাখা ঠিক হবে না। এ এন এম নূরুজ্জামান আমাদের কথা দেন, তিনি ই এ চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলবেন এবং সিরাজ শিকদারকে অন্য কোথাও স্থানান্তরের অনুরোধ করবেন।

পরিচালকের সঙ্গে কথা বলে সরোয়ার ও আমি রক্ষীবাহিনীর অফিসার্স মেসে সিরাজ শিকদারকে দেখতে যাই। সেখানে তিনি পুলিশের পাহারাতেই ছিলেন। নির্দিষ্ট কক্ষে গিয়ে দেখি, সিরাজ শিকদার মাটিতে বসে আছেন। একটা টেবিলে তাঁকে সকালের নাশতা দেওয়া হয়েছে। তিনি খাননি। কক্ষের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেতরে একটা বিছানা ও একটা ছোট টেবিল। কোনো চেয়ার নেই। আমরা তিনটি চেয়ার আনার ব্যবস্থা করি। তার একটিতে বসতে দিই সিরাজ শিকদারকে। সরোয়ার তাঁকে জিজ্ঞেস করে সিগারেট খাবেন কি না। তিনি হাঁ-সূচক উত্তর দিলে সরোয়ার তাঁকে একটা সিগারেট ও ম্যাচ দেয়। সিরাজ শিকদার দেশলাই জ্বালিয়ে সিগারেট ধরান। কয়েকবার টান দিয়ে একটু স্বাভাবিক হন। এর আগে বসে ছিলেন বেশ গম্ভীর ভাব নিয়ে। আমরা তাঁকে নাশতা খেতে বলি। তিনি নাশতা খেতে শুরু করেন।

একপর্যায়ে আমরা তাঁর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করি। আমরা দুজন যে তাঁর সঙ্গে এত ভালো আচরণ করছি, তিনি তা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তাঁর কথায় বোঝা গেল, তিনি নিশ্চিত, তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর সহকর্মীরা বাংলাদেশে বুর্জোয়া সরকারকে উৎখাত করে সর্বহারাদের সরকার গঠন করতে পারবে। তিনি বারবার একটা কথাই বলছিলেন, 'I know my fate is decided'.

সিরাজ শিকদারের সঙ্গে ১৪-১৫ মিনিট কথা বলে আমরা বেরিয়ে আসি। এ সময় আমাদের একজন কর্মকর্তা জানান যে পাশের ঘরে সর্বহারা পার্টির আরেক নেতা আছেন। তাঁকে না দেখেই আমরা দুজন অফিসকক্ষে ফিরে আসি। তিনি আসলে কে ছিলেন, নাথা ব্যস্ততায় আর জানা হয়নি। এখন আমার অনুমান ওই নেতা হয়তো কুরিয়ার অর্থাৎ যে সিরাজ শিকদারের পথপ্রদর্শক ছিল। রবিন নামে যে নেতা সিরাজ শিকদারকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন তিনিও হতে পারেন। রবিন প্রসঙ্গ পরে বলছি।

বিকেলবেলা জানতে পারি যে সিরাজ শিকদারকে আমাদের অফিসার্স মেস থেকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। এতে আমরা একটু স্বস্তি পাই। সন্ধ্যায় ই এ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হলে অভিযোগ করি, কেন তিনি সিরাজ শিকদারকে আমাদের অফিসার্স মেসে রেখেছিলেন। তাঁকে গ্রেপ্তারের সঙ্গে রক্ষীবাহিনী বিন্দুমাত্র জড়িত নয়, অথচ তাঁকে এক রাত আমাদের মেসে রাখার ফলে অনেকেই আমাদের সম্পৃক্ততার কথা ভাবতে পারে। ই এ চৌধুরী একজন দক্ষ ও বিচক্ষণ কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি আমাদের স্নেহও করতেন। আমাদের অভিযোগের জবাবে শুধু বললেন, 'কেন তাঁকে ওখানে রাখা হয়েছিল পরে তোমাদের জানাব।'

দুদিন পর সকালে পত্রিকা খুলেই দেখি সিরাজ শিকদার নিহত। সরকারি এক প্রেসনোটে বলা হয়, সিরাজ শিকদার মানিকগঞ্জের দিকে তাঁর এক 'হাইড আউট'৩ দেখিয়ে দেবেন, সেই কারণে পুলিশ তাঁকে নিয়ে সেদিকেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাচ্ছিল। কিন্তু পথে সাভারের কাছে তিনি পালাতে চেষ্টা করলে পুলিশের গুলিতে নিহত হন। বিষয়টা নিয়ে আমার একটু খটকা লাগে। কারণ, আমি ভেবেছিলাম, বিভিন্ন হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে তাঁকে বিচারের সম্মুখীন করা হবে।

তাঁর মৃত্যু নিয়ে তখন বিভিন্ন পত্রিকায় সত্য-মিথ্যা আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়। অনেকে হত্যার সঙ্গে রক্ষীবাহিনীকে জড়াতে চেষ্টা করে। কিন্তু আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই, এ ব্যাপারে রক্ষীবাহিনীর বিন্দুমাত্র সংশ্লিষ্টতা ছিল না।

ওই ঘটনার বেশ কিছুদিন পর ই এ চৌধুরীর কাছ থেকে আমি সিরাজ শিকদারের গ্রেপ্তারের কাহিনি জানতে পারি। আসলে পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টির অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও কিছুটা নারীঘটিত কারণে সিরাজ শিকদার ধরা পড়েন। সিরাজ শিকদারের সর্বহারা পার্টির একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন রবিন নামের একজন প্রকৌশলী। তাঁর আসল নাম জানা হয়নি। তাঁর একজন প্রেমিকা ছিল। সিরাজ শিকদারের দুজন স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তাঁর দৃষ্টি পড়ে রবিনের ওই প্রেমিকার ওপর। এ নিয়ে তাঁদের দুজনের মধ্যে মনোমালিন্য হয়। তাঁরা তখন সিলেটে ছিলেন। এরপর তাঁরা দুজন সিলেট থেকে আলাদাভাবে চট্টগ্রামে রওনা হন। কিন্তু রবিন সিলেট থেকে চট্টগ্রামের পথে ঢাকায় আসেন এবং তাঁর এক বিশ্বস্ত বন্ধুর মাধ্যমে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। রবিনের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ সাদা পোশাকে কুমিল্লা থেকেই সিরাজ শিকদার ও তাঁর কুরিয়ারকে অনুসরণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু তারা তাঁর হদিস পায়নি। চট্টগ্রাম রেলস্টেশনে অপেক্ষমাণ গোয়েন্দা পুলিশের কর্মকর্তারা সিরাজ শিকদার ও তাঁর কুরিয়ারকে সন্দেহ করে। সিরাজ শিকদার স্টেশন থেকে একটা স্কুটার নিলে সাদা পোশাকের পুলিশ কর্মকর্তারা তাঁর পিছু নেয় এবং একপর্যায়ে তাঁকে সন্দেহজনক ব্যক্তি হিসেবে গ্রেপ্তার করে। তখনো কিন্তু পুলিশ নিশ্চিত ছিল না যে, তারা সত্যিই সিরাজ শিকদারকে গ্রেপ্তার করেছে। পরে রবিনই নিশ্চিত করেন, পুলিশ যাঁকে গ্রেপ্তার করেছে, তিনি-ই সিরাজ শিকদার। সিরাজ শিকদারের সিলেট থেকে চট্টগ্রামে যাওয়ার সঠিক তথ্য দেওয়ায় সরকার কয়েক দিন পর পুরস্কারস্বরূপ রবিনকে তাঁর স্ত্রী বা প্রেমিকাসহ কানাডায় পাঠিয়ে দেয়।

এদিকে সিরাজ শিকদার গ্রেপ্তার হওয়ার পর, খবর পেয়ে বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তৎপর হয়ে ওঠে। হোয়াইট হলে সিরাজ শিকদারকে রাখা নিরাপদ হবে না—এই মর্মে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সরকারের কাছে তথ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরবরাহ করে। কারণ দেখায়, যেকোনো সময় সর্বহারা পার্টির সশস্ত্র ক্যাডাররা হোয়াইট হল থেকে সিরাজ শিকদারকে ছিনিয়ে নিতে পারে। আর না হলে সর্বহারারা ভারতীয় হাইকমিশনার অথবা মার্কিন রাষ্ট্রদূতের ওপর হামলা চালাতে পারে। এই তথ্যগুলো কতটুকু সত্য ছিল, কেউ পরখ করে দেখেছে কি না, জানা নেই। ঠিক এ কারণেই সে রাতে সিরাজ শিকদারকে রক্ষীবাহিনীর অফিসার্স মেসে নিয়ে আসা হয় এবং ভারতীয় হাইকমিশনার ও মার্কিন রাষ্ট্রদূতের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়।

১৯৭৫ সালের পরও সিরাজ শিকদারের হত্যার প্রসঙ্গ নিয়ে পত্রপত্রিকায় অনেক কিছু লেখা হয়েছে। এর কিছুটা ছিল আংশিক সত্য বা অর্ধসত্য। বাকিটা ছিল মিথ্যা ও কল্পনা। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর সরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত সাপ্তাহিক *বিচিত্রা* ধারাবাহিকভাবে কয়েক বছর বঙ্গবন্ধুর শাসনামলের ব্যাপক সমালোচনা করে। *বিচিত্রার* ১৯৭৮ সালের ১৯ মে-র সংখ্যায় সিরাজ শিকদারের গ্রেপ্তার ও হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন ছাপা হয়। শিরোনাম ছিল 'সিরাজ শিকদার হত্যার নেপথ্য কাহিনী'। *বিচিত্রা* ছিল রক্ষীবাহিনীর কঠোর সমালোচক। ওই প্রতিবেদন পড়লেই বোঝা যাবে, রক্ষীবাহিনী এ ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল না।

AMARBOI.COM

আরও কিছু অভিযোগ

রক্ষীবাহিনীতে কর্মরত থাকার সুবাদে এই বাহিনীর অপারেশন-সংক্রান্ত সব ঘটনাই যে আমার জানা ছিল, এমন নয়। কিছু ঘটনা হয়তো আমার জানা। অনেক ঘটনা আমি নিজেও জানি না। আবার জানা অনেক ঘটনা এত দিনে আমি ভুলে গেছি। উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনা হয়তো আমার মনে আছে। এ জন্য রক্ষীবাহিনী সম্পর্কে লেখার আগে আমি কয়েক দিন গণগ্রন্থাগারে গিয়ে ১৯৭২-৭৫ সালের পত্রপত্রিকা দেখি। পুরোনো পত্রপত্রিকা দেখার সময় রক্ষীবাহিনীর অপারেশন-সংক্রান্ত কিছু ঘটনা আমার নজরে পড়ে। এসব ঘটনার বেশির ভাগ সম্পর্কে আমি অবহিত ছিলাম না। কয়েকটি সম্পর্কে হয়তো অবহিত ছিলাম, কিন্তু সেগুলো তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। পুরোনো পত্রিকা দেখার সময় একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা আমার নজরে পড়ে। তখন আমি প্রশিক্ষণের জন্য দেশের বাইরে ছিলাম। দেশে ফিরেও এ সম্পর্কে কিছু শুনিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটনাটি ঘটে ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। এ সময় শরীয়তপুরের বামপন্থী নেতা শান্তি সেনের স্ত্রী অরুণা সেন রক্ষীবাহিনীর হাতে নির্যাতিত হন। এ নিয়ে পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়েছিল। বেশ সমালোচনাও হয় পত্রপত্রিকায়। এ ছাড়া চীনপন্থী বাম দলের মুখপত্র *সংস্কৃতি* (প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, মে-জুন ১৯৭৪) পত্রিকায় অরুণা সেনের একটি বিবৃতিও ছাপা হয়। পুরোনো পত্রিকা দেখার সময় *সংস্কৃতি* পত্রিকার ওই সংখ্যাও আমার নজরে পড়ে। তাঁর বিবৃতিটি আমি পড়ি। ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের লেখা পড়ে আমার যেমন প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, এ ক্ষেত্রেও তেমনটাই হয়। এ কারণেই প্রসঙ্গটি উল্লেখ করলাম। পরে ওই ঘটনার বিষয়ে আমি জানার চেষ্টা করি। কিন্তু এত বছর পর প্রকৃত ঘটনা আমি বিস্তারিত জানতে পারিনি।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি কথা না বললেই নয়। ১৯৭২-৭৫ সালে রাজনৈতিক মহলে, বিশেষত চীনপন্থী চরম বাম দলগুলো রক্ষীবাহিনীর সমালোচনায় সবচেয়ে মুখর ছিল। তারা তিলকে তাল বানিয়ে প্রচার অভিযানে অভ্যস্ত ছিল। একবার শুনেছিলাম, নরসিংদী জেলার জনৈক মজিবুর রহমানকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ১৯৭৪ সালে গ্রেপ্তার করেছিল। পরে তিনি মুক্তি পান। এ ঘটনা নিয়ে তখন চীনপন্থী রাজনৈতিক দল মিথ্যা ও অর্ধসত্য মিলিয়ে রক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে। বেশ কয়েক বছর আগে তদানীন্তন ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা জমিদার আকবর খান রনো (বর্তমানে দল পরিবর্তন করে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিতে আছেন) একটি লেখায় পুনরায় ওই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে প্রকারান্তরে রক্ষীবাহিনীর ওপর এর দায় চাপানোর চেষ্টা করেছেন। এ রকম আরও কিছু ঘটনা আছে, যা আমার সব জানা নেই। যা-ও জেনেছি, এত বছর পর সব আমার মনে থাকার কথা নয়। আর এখন জানার পর প্রকৃত তথ্য আমার পক্ষে উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব নয়।

এসব ঘটনা কিছুটা সত্য, অর্ধসত্য বা আংশিক সত্য। রক্ষীবাহিনীর কর্মকর্তারা ছিলেন তখন নবীন। এ কারণে এবং পেশাগত অভিজ্ঞতার অভাবে কয়েকজন লিডার, ডেপুটি লিডার ও অ্যাসিস্ট্যান্ট লিডার স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে অপারেশন করেন। এ রকম কয়েকটি ঘটনার পর পরিচালক এ এন এম নূরুজ্জামান সতর্ক হন। সরকারদলীয় স্থানীয় নেতারা যাতে রক্ষীবাহিনীর সদস্য, বিশেষত নেতৃত্ব পর্যায়ে কাউকে প্রভাবিত করতে না পারেন, সে ব্যাপারে তিনি সজাগ থাকতেন। এ ব্যাপারে লিডারদের কঠোর নির্দেশ দিতেন তিনি। এর ফলে রক্ষীবাহিনীর জেলা ও মহকুমা পর্যায়ের কমান্ডাররা দৃঢ়ভাবে দায়িত্ব পালনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহস সঞ্চয় করেন। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে দায়িত্ব পালন এবং অপরাধীদের ওপর নির্যাতন করার জন্য কয়েকজন লিডার, ডেপুটি লিডার, অ্যাসিস্ট্যান্ট লিডারসহ রক্ষীবাহিনীর অনেক সদস্যকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। অনেককে চাকরিচ্যুত করা হয় এবং অনেককে কারাগারে পাঠানো হয়। এর ফলে ১৯৭৪ সালের প্রথমার্ধ থেকেই রক্ষীবাহিনী একটি সুশৃঙ্খল বাহিনীতে পরিণত হয় এবং রক্ষী সদস্যরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় অনেক উপযোগী হয়ে ওঠেন।

প্রকৃতপক্ষে রক্ষীবাহিনীতে আমার মুখ্য দায়িত্ব ছিল বাহিনীর সব স্তরের সদস্যদের প্রশিক্ষণের বিষয়টি দেখা। ফলে সাপ্তাহিক *হলিডে*, সাপ্তাহিক *হক-কথা*, দৈনিক *গণকণ্ঠ*সহ কয়েকটি পত্রপত্রিকায় রক্ষীবাহিনীর বিভিন্ন অপারেশনের এবং সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার বিষয়ে যেসব সত্য-মিথ্যা কাহিনি ছাপা হয়েছে, তার সব বিবরণ আমার জানা হয়নি। সে জন্য সেগুলোর সত্যিকার বিবরণ আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়।

রক্ষীবাহিনী পরিচালিত অপারেশনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে যেসব অভিযোগ উঠেছিল, সেগুলোকে কেন্দ্র করে তখন অনেক মামলাও হয়েছিল। এসব মামলাসহ রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের আইনি দিকটা দেখতেন আমাদের উপপরিচালক (প্রশাসন) আবুল হাসান খান। তিনি খুব অভিজ্ঞ সেনা কর্মকর্তা ছিলেন। বর্তমানে তিনি পরলোকে। রক্ষীবাহিনীর পরিচালক এ এন এম নূরুজ্জামানও মারা গেছেন। ফলে রক্ষীবাহিনীর অনেক তথ্যই অজানা থেকে গেল।

AMARBOI.COM

বিরাগভাজন হওয়ার কয়েকটি ঘটনা

কোনো বাহিনীর হয়ে দেশে আইনশৃঙ্খলা ও শান্তি বজায় রাখতে গিয়ে ওই বাহিনীর কর্মকর্তাদের অনেক সময় সরকারি দলের নেতা, কর্মী ও জনপ্রতিনিধিদের বিরাগভাজন হতে হয়। এ বিষয়ে অবশ্যই পুলিশ বাহিনীর অভিজ্ঞতা অন্যান্য বাহিনীর সদস্যদের চেয়ে বেশি। জাতীয় রক্ষীবাহিনীর একজন উপপরিচালক হিসেবে আমি নিজেও কয়েকজন জনপ্রতিনিধির বিরাগভাজন হয়েছিলাম।

ভারত থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আসার পর কাজে যোগ দিয়ে আমি আমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে থাকি। কিছুদিন পর, একদিন সন্ধ্যায় আমি অফিসে কাজ করছি। আমাদের বাহিনীর পরিচালক এ এন এম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নূরুজ্জামান আমাকে ডেকে পাঠান। তাঁর কাছে যাওয়ার পর তিনি আমাকে দ্রুত প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে বললেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে শেরেবাংলা নগরের নতুন গণভবনে যাই। গণভবন ও আমাদের সদর দপ্তরের মধ্যে তেমন দূরত্ব ছিল না। কয়েক মিনিটের মধ্যে আমি গণভবনে পৌঁছাই। প্রধানমন্ত্রীর সচিবের কাছে যাওয়ার পর তিনি বঙ্গবন্ধুকে আমার উপস্থিতির কথা জানান। বঙ্গবন্ধু সচিবের মাধ্যমে আমাকে তাঁর কক্ষে যেতে বলেন। আমি প্রধানমন্ত্রীর অফিসকক্ষে প্রবেশ করে দেখতে পাই, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও সাবেক রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী সোফায় বসে আছেন।[৪]

বঙ্গবন্ধুর চেহারা দেখে আমার মনে হলো, তিনি খুব রাগান্বিত। এতে আমি একটু আশ্চর্য হয়ে গেলাম। ভাবলাম, আমি কি কোনো ভুল করে ফেলেছি? আমি বঙ্গবন্ধুর সামনে যেতেই তিনি আমাকে বললেন, 'শোন, চৌধুরী সাহেবের পৈতৃক বাড়ি লতিফ দখল করেছে। ওই বাড়ি আজ রাতের মধ্যেই খালি করতে হবে।'

সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপারটা বুঝে গেলাম। এ লতিফ টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী থানা থেকে নির্বাচিত সাংসদ আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী[৫]। একই থানার নাগবাড়ী গ্রামে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর বিশাল পৈতৃক বাড়ি। লতিফ সিদ্দিকী ওই বাড়ি দখল করেছেন। আমি কোনো কিছু না ভেবেই সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবন্ধুকে বললাম, 'খালি হয়ে যাবে, স্যার।' এরপর বঙ্গবন্ধু আমাকে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর কাছ থেকে সব জেনে কাজ করতে বললেন। নির্দেশ দিলেন বাড়ি খালি করে পরদিন সকালে যেন তাঁকে রিপোর্ট করি। তারপর আমাকে সাবেক রাষ্ট্রপতির কাছে রেখে বঙ্গবন্ধু পাশের ঘরে গেলেন।

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এমনিতেই খুব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং গম্ভীর মানুষ ছিলেন। তিনি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, তখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক। এ সুবাদে তিনি আমাকে ভালো করেই চিনতেন। তখন থেকেই আমাকে খুব স্নেহ করতেন। এ ছাড়া স্বাধীনতার পর ১০ জানুয়ারি (১৯৭২) দেশে ফিরে বঙ্গবন্ধু যখন তাঁকে রাষ্ট্রপতি করবেন বলে মনস্থ করেন, তখন আমাকেই তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন।

একান্ত ব্যক্তিগত এবং প্রাসঙ্গিক না হলেও উল্লেখযোগ্য বলে ঘটনাটির অবতারণা করছি। ১১ জানুয়ারি ১৯৭২ রাতে আমরা কয়েকজন ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাই। তখন রাত আনুমানিক সাড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়টা। ভেতরে প্রবেশ করেই জানতে পারলাম, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ প্রমুখ ঊর্ধ্বতন নেতার সঙ্গে বঙ্গবন্ধু দোতলায় গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করছেন। আমরা নিচতলায় বসতে যাচ্ছি, এমন সময় দেখি, বঙ্গবন্ধু ও অন্য নেতারা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছেন। আমরা উঠে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধুসহ তাঁদের সবাইকে সালাম দিলাম। বঙ্গবন্ধু নেতাদের বিদায় দিয়ে আমাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমরা সবাই বঙ্গবন্ধুর পা ছুঁয়ে সালাম করলাম। মনে হলো, আমাদের পেয়ে তিনি খুব খুশি হয়েছেন। আমাদের কাছে নানা বিষয়ে জানতে চাইলেন। তবে কিছুক্ষণ কথা বলার পর মনে হলো, তিনি বেশ ক্লান্ত। তাই বেশিক্ষণ কথা না বলে আমি তাঁকে বললাম, 'আপনাকে শুধু দেখতে এসেছি।' এ কথা বলে সবাই বিদায় নিচ্ছি, বঙ্গবন্ধু আমাকে কাছে টেনে নিয়ে কানে কানে বললেন, 'তোর ভিসিকে তাড়াতাড়ি এখানে নিয়ে আয়।'

উল্লেখ্য, আবু সাঈদ চৌধুরী ৭ জানুয়ারি লন্ডন থেকে ঢাকায় ফেরেন। সেদিন আমি তাঁর বাসায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তিনি আমার কাছে টাঙ্গাইলের খবর জানতে চান। আমি সংক্ষেপে কিছু ঘটনা জানাই।

১১ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু ভবন থেকে বেরিয়ে আমার সহযোদ্ধা নূরুন্নবী ছাড়া সবাই টাঙ্গাইলে রওনা হলেন। আমি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে রাতেই বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর বাসায় হাজির হলাম। সঙ্গে নূরুন্নবী। তাঁর বাসায় গিয়ে জানতে পারি, তিনি শহীদ মুনীর চৌধুরীর স্ত্রী ও সন্তানদের সমবেদনা জানাতে তাঁর বাসায় গেছেন। কখন ফিরবেন, ঠিক নেই। এ অবস্থায় আমি শহীদ মুনীর চৌধুরীর বাসায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। তাঁর বাসা ছিল ভূতের গলিতে। এটা অবশ্য আমি জানতাম না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে আমার এক বন্ধুর সাহায্য নিয়ে আমি ওই বাসায় যাই। সেখানে আমি আবু সাঈদ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করি। বিনীতভাবে তাঁকে জানাই, বঙ্গবন্ধু আমাকে পাঠিয়েছেন। আমরা আপনার বাসায় গিয়েছিলাম। না পেয়ে এখানে এসেছি। তিনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। আপনাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা এসেছি। এরপর তিনি মুনীর চৌধুরীর স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমাদের সঙ্গে নিয়ে বঙ্গবন্ধু ভবনে রওনা হন।

আমরা যখন সেখানে পৌঁছাই, তখন রাত প্রায় ১১টা। বঙ্গবন্ধু সবে রাতের খাবার সেরে উঠেছেন। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সঙ্গে সৌজন্য বিনিময়ের পর বঙ্গবন্ধু তাঁকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর শয়নকক্ষে যান। নূরুন্নবী আর আমি নিচে অপেক্ষা করতে থাকি। একটু পর বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিচে নেমে এসেই আমাকে জড়িয়ে ধরেন। আমি তখন কারণ বুঝতে পারিনি। পরদিন রেডিওতে খবর শুনে কারণটা বুঝতে পারি। তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হয়েছেন।

যা হোক, বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী তাঁর বাড়ি দখলের বিষয়টি নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে একটু বিব্রত বোধ করছিলেন। তা করারই কথা। কারণ, কোনো দেশের সাবেক রাষ্ট্রপতির বাড়ি বেদখল হওয়ার ঘটনা একটা অচিন্তনীয় বিষয়। আমি নিজেও বেশ লজ্জা বোধ করছিলাম। আমি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর কাছ থেকে সব শুনে তাঁকে আশ্বাস দিলাম যে রাতের মধ্যেই তাঁর বাড়ি খালি হয়ে যাবে। এরপর আমি অফিসে ফিরে আসি। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী তাঁর বাসভবনে ফিরে যান। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আবু সাঈদ চৌধুরীর পৈতৃক বাড়িটি পুড়িয়ে দিয়েছিল। তাঁর পারিবারিক বিষয়সম্পত্তি দেখাশোনার জন্য সামসুদ্দিন (মুচু মিয়া) নামের একজন ম্যানেজার হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁকে পাকিস্তানি সেনারা নির্মমভাবে হত্যা করেছিল।

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ, সাবেক রাষ্ট্রপতির পৈতৃক বাড়ি দখলদার সাংসদদের কাছ থেকে উদ্ধার করতে হবে। তাই আমি কৌশল ঠিক করলাম, উদ্ধার অভিযানটা পরিচালনা করতে হবে সংগোপনে। টাঙ্গাইল জেলায় কোনো দিন কোনো অভিযানে রক্ষীবাহিনী পাঠানো হয়নি। আশপাশে রক্ষীবাহিনীর কোনো ক্যাম্প ছিল না। কাছাকাছি ময়মনসিংহে রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্প ছিল। সেখানে বাহিনীর কর্মকর্তা হিসেবে ছিলেন লিডার সরোয়ার হোসেন। তাঁর বাড়ি ছিল কালিহাতী থানার পাশেই বাসাইল থানায়। মুক্তিযুদ্ধকালে সরোয়ার কালিহাতী এলাকায় যুদ্ধ করেন। ফোন করে তাঁকে নির্দেশ দিলাম দুই ট্রাক রক্ষী সদস্য প্রস্তুত করে রাত একটার মধ্যে নাগবাড়ী পৌঁছাতে এবং সাবেক রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর বাড়ি ঘেরাও করে ভেতরে যাকেই পাওয়া যাবে তাদের সবাইকে ট্রাকে উঠিয়ে সরাসরি ময়মনসিংহে নিয়ে যেতে। আরও নির্দেশ দিলাম গভীর রাতে অপারেশন করার জন্য। গ্রামের লোকজন যাতে এ অপারেশনের বিষয়ে জানতে না পারে, তার জন্য নীরবে কাজ করতে হবে। কোনো গুলি করা যাবে না। তারপর ময়মনসিংহে ফিরে সকালেই আমাকে জানাতে হবে।

যে রকম নির্দেশ, সে রকম কাজ। সকাল ছয়টার দিকে ময়মনসিংহে ফিরে লিডার সরোয়ার হোসেন আমাকে ফোন করে জানালেন, অপারেশন সফল। তাঁরা নাগবাড়ীতে গিয়ে দেখেন গ্রামটি নীরব, নিস্তব্ধ। লোকজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবাই ঘুমে, এমনকি সাবেক রাষ্ট্রপতির বাড়ি যারা দখল করে আছে, তারাও ঘুমে। মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে তাদের সবাইকে (যত দূর মনে পড়ে ১৫-১৬ জন) ধরে কোনো হট্টগোল ছাড়াই রক্ষী সদস্যরা ফিরে আসেন। আমি সরোয়ারকে দুপুরের আগেই একটা রিপোর্ট লিখে গ্রেপ্তার করা ব্যক্তিদের পুলিশের কাছে হস্তান্তর করার জন্য বলি।

এরপর অফিসে গিয়েই আমি সাবেক রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে ফোন করে জানাই, তাঁর বাড়ি খালি হয়ে গেছে। সেখানে তাঁর লোকজন যেতে পারে। তারপর প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে রিপোর্ট করতে গণভবনে যাই। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর পৈতৃক বাড়ি দখলমুক্ত হয়েছে জেনে তিনি খুব খুশি হন এবং নিজেই তাঁকে ফোন করেন।

এদিকে আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী সকালেই খবর পেয়ে যান বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর পৈতৃক বাড়ি থেকে তাঁর লোকজনকে কে বা কারা রাতের অন্ধকারে ধরে নিয়ে গেছে। এ খবর পেয়ে লতিফ সিদ্দিকী এদিক-সেদিক খোঁজ নিতে থাকেন, কিন্তু কোনো খবর পান না। কারণ, টাঙ্গাইলের পুলিশ সুপার (এসপি) বা কালিহাতী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কেউই বিষয়টি জানতেন না। দু-তিন দিন বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ না পেয়ে আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাপ্টেন (অব.) এম মনসুর আলীর সঙ্গে দেখা করেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁকে জানান, তিনিও এ বিষয়ে কিছু জানেন না। তবে তাঁর কাছ থেকেই হয়তো লতিফ সিদ্দিকী খবর পান, বিষয়টা আমি জানি।

দু-তিন দিন পর একদিন আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী আমার বাসায় আসেন এবং বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চান। আমি তাঁকে বলি যে ব্যাপারটা ঘটেছে অনেক উঁচু পর্যায়ের সিদ্ধান্তে। এর বেশি আমি জানি না। এটা জানতে হলে প্রধানমন্ত্রীর কাছে যেতে হবে। আমার কাছে সদুত্তর না পেয়ে লতিফ সিদ্দিকী অত্যন্ত রাগান্বিত হন। তারপর চলে যান আমার বাসা থেকে। আর কোনো দিন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সম্পত্তির ধারেকাছে যাননি তিনি।

আরেকটি ঘটনা। একবার বরিশাল থেকে রক্ষীবাহিনীর সদর দপ্তরে খবর এল, শহরের তিন-চার মাইল দূরে কোনো এক গ্রামে (নামটা আমার মনে নেই। শুধু ঘটনাটা মনে আছে) সন্ত্রাসীরা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র জমা রেখেছে। আমাদের পরিচালক এ এন এম নূরুজ্জামান তথ্যটির গুরুত্ব অনুধাবন করে আমাকে ওই অস্ত্র উদ্ধার অভিযান চালাতে বরিশালে পাঠান। আমি লঞ্চযোগে বরিশালে গিয়ে সার্কিট হাউসে উঠি। বরিশালে আগে থেকেই রক্ষীবাহিনীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক কোম্পানি রক্ষী সদস্য ছিল। তাদের নেতৃত্বে ছিলেন লিডার আলমগীর হাওলাদার। তাঁকে ও ডেপুটি লিডারদের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল, তাঁদের কাছে এমন কোনো তথ্য নেই যে ওই গ্রামের কোথাও অস্ত্র জমা আছে। আমার একটু খটকা লাগল! ভাবলাম, পরিচালক তাহলে কোথা থেকে তথ্যটা পেলেন! যা হোক, আমি লিডারকে দুই প্লাটুন রক্ষী তৈরি রাখতে বলি। কারণ, যেকোনো সময় অপারেশনে যেতে হতে পারে।

সন্ধ্যার পর আমির হোসেন আমু ও আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ (বর্তমানে তাঁরা দুজনই আওয়ামী লীগের নেতা) আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাঁদের সঙ্গে আরেকজন ছিলেন। তাঁকে আমি চিনতাম না। তাঁরা দুজন তাঁকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন ক্যাপ্টেন বেগ[৬] নামে। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারলাম, ওই গ্রামে অস্ত্রশস্ত্র জমা থাকার বিষয়টি তাঁরাই আমাদের পরিচালককে দিয়েছেন। কোথা থেকে তথ্য পেয়েছেন, সে সম্পর্কে আমার প্রশ্নের জবাব তাঁরা ঠিকমতো দিতে পারলেন না। কিন্তু তাঁরা নিশ্চিত ছিলেন, ওই গ্রামে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র জমা আছে। পরিচালকের নির্দেশ, তাই আমি ঠিক করলাম, দুই প্লাটুন রক্ষী নিয়ে রাত দুইটায় আমি অপারেশনে যাব। সঙ্গে থাকবেন লিডার আলমগীর হাওলাদার। ঠিক হলো, গ্রামের যে বাড়িতে অস্ত্র আছে, সেই বাড়ি চিনিয়ে দিতে ক্যাপ্টেন বেগ আমার সঙ্গে যাবেন।

যথাসময়ে গ্রামে গিয়ে চিনিয়ে দেওয়া বাড়িটি আমরা ঘেরাও করি। চারদিকে পাহারা লাগিয়ে তল্লাশি শুরু হলো। বাড়ির প্রতিটি ঘর তল্লাশি করে কোনো কিছু পাওয়া গেল না। তখন বেগ বলে উঠলেন, বাড়ির পুকুরে পাওয়া যেতে পারে। ইতিমধ্যে গ্রামের কয়েকজন মুরব্বি এসে সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁরা নামাজের জন্য উঠে হইচই শুনে দেখতে এসেছিলেন। আমি তাঁদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম, যাঁদের বাড়ি আমরা তল্লাশি করছি, তাঁরা একেবারে নিরীহ লোক। সন্ত্রাসী তৎপরতার সঙ্গে তাঁদের কোনো সম্পর্ক নেই। আরও জানতে পারলাম, জমিজমা-সংক্রান্ত বিরোধ বা অন্য কোনো কারণে হয়তো তাঁদের বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ তোলা হয়েছে।

এদিকে বেগকে আমার কেন যেন সন্দেহ হতে লাগল। লিডার আলমগীর হাওলাদারও তাঁকে পছন্দ করলেন না। কারণ, তিনি তল্লাশি অভিযানে অতি উৎসাহী ছিলেন। আমি যখন কয়েকজন রক্ষীকে পুকুরে নেমে তল্লাশি করতে বলি, পারলে তিনি নিজেই তখন পুকুরে নামেন। অনেকক্ষণ তল্লাশি করে যখন কিছুই পাওয়া গেল না, তখন বাড়ির একটা ছেলেকে ধরে বেগ নির্যাতন শুরু করেন। এ সময় আমি অপারেশন বন্ধ করার নির্দেশ দিলাম। একপর্যায়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেগকে ধমক দিয়ে বললাম, অপারেশনে এসেছি আমরা, সে কেন ছেলেটাকে নির্যাতন করছে। ছেলেটাকে বেগের কাছ থেকে উদ্ধার করে ছেড়ে দিয়ে আমরা ফিরে আসি। বুঝতে আমার একটুও সময় লাগল না যে, রক্ষীবাহিনীর অল্পবয়সী সদস্যদের ব্যবহার করে আওয়ামী লীগের স্থানীয় অসৎ নেতারা গ্রামের মানুষের মধ্যকার বিবাদ থেকে ফায়দা লুটতে চায়। এতে দুর্নাম হয় রক্ষীবাহিনীর।

সকালে পরিচালককে ফোনে জানাই, আমি নিজে অপারেশনে গিয়ে দেখেছি যে অস্ত্র মজুত থাকার খবর সত্য নয়। সম্ভবত গ্রামের শত্রুতার জের ধরে এক পক্ষের সমর্থনে অস্ত্র মজুতের বিষয়টি এসেছে। আমি বেগের বিষয়টিও তাঁকে জানাই এবং অভিযোগ করি কীভাবে আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতারা আর্থিক ফায়দা নিতে রক্ষীবাহিনীকে ব্যবহার করছেন। এরপর বরিশালের স্থানীয় প্রশাসনের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি, বেগ ও তাঁর প্রশ্রয়দাতা স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের অত্যাচারে বরিশালের জনগণ, বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের অনেকে অতিষ্ঠ।

বিকেলবেলা আমি বরিশালে নিয়োজিত রক্ষী সদস্যদের সঙ্গে কথা বলি। রাতের অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করে স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের নেতাদের কথায় বা তথ্যের ভিত্তিতে কোনো অপারেশনে না যাওয়ার জন্য আমি তাঁদের কড়া নির্দেশ দিই। তাঁদের আরও বলি, তাঁরা কেবল জেলা প্রশাসন ও পুলিশের তথ্যের ভিত্তিতেই অপারেশনে যাবেন। ঢাকায় ফিরে পরিচালক এ এন এম নূরুজ্জামানকে আমি বিস্তারিত রিপোর্ট প্রদান করি। এরপর তিনি প্রতিটি জেলায় নির্দেশ পাঠান যে প্রশাসনের সঠিক তথ্যের ভিত্তিতেই শুধু রক্ষীবাহিনী অভিযান পরিচালনা করবে, এর অন্যথা হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জাতীয় রক্ষীবাহিনীর লিডার, উপলিডার, সহকারী লিডারসহ রক্ষীবাহিনীর সব সদস্যের বয়স ছিল ২৫ বছরের নিচে। সে জন্য পরিচালক এ এন এম নূরুজ্জামান সব সময়ই উদ্বিগ্ন থাকতেন। কারণ, দেশের বিভিন্ন স্থানে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশকে সহায়তা করার জন্য রক্ষীবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। যথাযথ যোগাযোগমাধ্যমের অভাবে সবার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হতো না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই টেলিফোনে নির্দেশ দেওয়া হতো। পরিচালক প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যার পর বিভিন্ন স্থানে নিয়োজিত লিডার ও ডেপুটি লিডারদের সঙ্গে কথা বলতেন এবং আদেশ-উপদেশ দিতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার বরিশাল সফরের কয়েক দিন পর পরিচালক কথা প্রসঙ্গে আমাকে বলেন, 'তুমি কী করে এসেছ, বরিশালের নেতারা তোমার ওপর খেপে আছেন।' উত্তরে আমি বললাম, 'স্যার, চিন্তা করবেন না। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে বলার সাহস ওদের হবে না।' এ প্রসঙ্গে আরেকটা বিষয় না লিখে পারছি না। এ কথায় নতুন করে আবার বিরাগভাজন হব, তার পরও লিখছি। বরিশালের সাধারণ মানুষের ওপর, বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের ওপর কী পরিমাণ নির্যাতন হয়েছিল তা বোঝা গিয়েছিল যেদিন বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার হত্যা করা হয় সেদিন। সারা বাংলাদেশের মানুষ সেদিন শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল, অনেকে ঘটনাটা বিশ্বাসই করতে পারেনি। দেশটা ছিল নীরব, নিথর, স্তব্ধবাক। কিন্তু বরিশাল শহরে কয়েক হাজার লোকের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ মিছিল বের হয়েছিল। তবে সেটা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে বলে নয়, তাঁরা আনন্দ মিছিল বের করেছিলেন বরিশালের নির্যাতনকারীদের হাত থেকে তাঁরা রক্ষা পেয়েছেন ভেবে।

রক্ষীবাহিনীর লিডাররা ছিলেন নবীন, এ কারণে এবং পেশাগত অভিজ্ঞতার অভাবে তাঁদের কয়েকজন স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে অপারেশন করেন। এ রকম কয়েকটি ঘটনার পর পরিচালক এ এন এম নূরুজ্জামান সতর্ক হন। তিনি সজাগ থাকতেন, সরকারদলীয় স্থানীয় নেতারা যাতে রক্ষীবাহিনীর অভিযানে হস্তক্ষেপ বা প্রভাবিত করতে না পারেন। তিনি এ ব্যাপারে লিডারদের কঠোর নির্দেশ দিতেন। এর ফলে রক্ষীবাহিনীর জেলা ও মহকুমা পর্যায়ের কমান্ডাররা দৃঢ়ভাবে দায়িত্ব পালনের সাহস সঞ্চয় করেন। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে দায়িত্ব পালন করার জন্য এবং অপরাধীদের ওপর নির্যাতন করার জন্য কয়েকজন লিডার, ডেপুটি লিডার, সহকারী লিডারসহ রক্ষীবাহিনীর অনেক সদস্যকে বিচারের মুখোমুখি হতে হয়। অনেককে চাকরিচ্যুত করা হয় এবং অনেককে পাঠানো হয় কারাগারে।

অনেক ক্ষেত্রে অবৈধ কাজে লিপ্ত স্থানীয় নেতা, এমনকি সাংসদদের গ্রেপ্তার করতেও রক্ষীবাহিনী দ্বিধা করেনি। নওগাঁ ও নাটোর এলাকায় অপারেশন চালাতে গিয়ে লিডার লুৎফর রহমানের নেতৃত্বে রক্ষী সদস্যরা সাংসদ মো. জাহাঙ্গীর আলমকে গাঁজা পাচারকালে এবং সাংসদ আশরাফ হোসেনকে অবৈধ অস্ত্র রাখার দায়ে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়। ফলে সরকারের একটি অংশেও রক্ষীবাহিনী-বিরোধী প্রচারণা শুরু হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোফায়েল আহমেদ প্রসঙ্গ

স্বাধীন বাংলাদেশে সরকার পরিচালনা করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তদানীন্তন ছাত্রনেতাদের মধ্যে তোফায়েল আহমেদকে তাঁর রাজনৈতিক সচিব হিসেবে বেছে নেন। এর মুখ্য কারণ, ১৯৬৯ সালের ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানের নেতা হিসেবে তোফায়েল আহমেদ অসাধারণ সাফল্য ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তা ছাড়া যুবসমাজের মধ্য থেকে দেশ পরিচালনায় দক্ষ নেতৃত্ব গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন বঙ্গবন্ধু। সে জন্য ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি প্রায় প্রত্যেক জেলা থেকে ছাত্র ও যুবসমাজের অনেককে মনোনয়ন দেন। তাঁরা কেউ কেউ পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য ও কেউ কেউ পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। শুধু তোফায়েল আহমেদ নন, যুবসমাজের মধ্য থেকে অনেককেই বঙ্গবন্ধু প্রতিমন্ত্রী ও সমতুল্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করেন।

জাতীয় রক্ষীবাহিনী শুরু থেকেই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে ছিল। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব রুহুল কুদ্দুস রক্ষীবাহিনী-সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁকে সাচিবিক সহায়তা করতেন প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের যুগ্ম সচিব মনোয়ারুল ইসলাম। অফিসের কাজে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে যেতে হলে জাতীয় রক্ষীবাহিনীর পরিচালক এ এন এম নূরুজ্জামান সব সময়ই যুগ্ম সচিব মনোয়ারুল ইসলামের কামরায় অথবা তাঁর সহপাঠী নুরুল ইসলাম অনুর কামরায় যেতেন। নুরুল ইসলাম অনু ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব। সরোয়ার ও আমি একসঙ্গে বা আলাদাভাবে কোনো কাজে

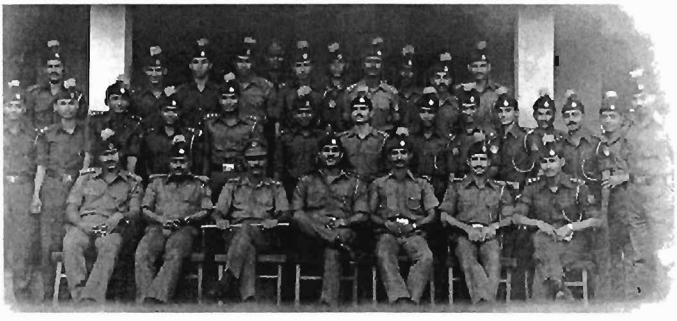

পাসিং আউট শেষে তোলা রক্ষীবাহিনীর একটি ব্যাচের লিডারদের ছবি। প্রথম সারিতে বসা লেখক (বাঁ থেকে চতুর্থ) ও সরোয়ার হোসেন মোল্লা (বাঁ থেকে তৃতীয়)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে গেলে সাধারণত তাঁদের কাছেই যেতাম। কিন্তু জাতীয় রক্ষীবাহিনী-সম্পর্কিত কোনো নথি বা ফাইল প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব[৭] তোফায়েল আহমেদের কাছে যেতে দেখিনি। কোনো দিন কোনো নথি বা ফাইলে তাঁর স্বাক্ষর দেখিনি।

আসলে তোফায়েল আহমেদের অসাধারণ জনপ্রিয়তা এবং প্রধানমন্ত্রীর নৈকট্য ক্ষমতাসীন অনেকের কাছেই ঈর্ষার কারণ ছিল। সে কারণে ওই সময় অনেকে তোফায়েল আহমেদের জনপ্রিয়তায় ও বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে ফাটল ধরাতে সচেষ্ট ছিলেন। তখন নানা ধরনের গুজব ছড়ানো হতো। এমন গুজবও ছড়ানো হয় যে তোফায়েল আহমেদ রক্ষীবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন। এটা একেবারেই মিথ্যা। তবে সরকারের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে এবং প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হিসেবে সরকারের সব দায়িত্বের দায়ভার মন্ত্রিসভার ছোট-বড় সব সদস্যের মতো তোফায়েল আহমেদেরও ছিল। এ জন্য রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততা দেখানোর সুযোগ নেই।

তবে একবার তিনি রক্ষীবাহিনীর কার্যালয়ে এসেছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের পর দেশের উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীসহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা স্বেচ্ছায় দায়িত্ব ত্যাগ করে আত্মগোপন করেন; সরকারকে সংগঠিত করে হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আমাদের উদ্যোগ ব্যর্থ হয়—এ রকম এক কঠিন মুহূর্তে আমরা শুধু তোফায়েল আহমেদকে কাছে পেয়েছিলাম, যিনি আত্মগোপন না করে বা পালিয়ে না গিয়ে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে রক্ষীবাহিনীর প্রধান কার্যালয়ে এসেছিলেন। তিনি এসেছিলেন বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে। এ ঘটনা থেকেই অনেকে ধারণা করেন, তোফায়েল আহমেদ জাতীয় রক্ষীবাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে দুর্যোগময় মুহূর্তে দেশের সর্বোচ্চ পদে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন। ব্যতিক্রম ছিলেন তোফায়েল আহমেদ।

রক্ষীবাহিনীতে প্রথম দুই ব্যাচের কর্মকর্তাদের অবদান

জাতীয় রক্ষীবাহিনীকে একটা সফল ও কার্যকর বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে প্রধান কার্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছাড়াও মাঠপর্যায়ে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে অত্যন্ত সততা, ন্যায়নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁদের অবদানকে খাটো করে দেখার উপায় নেই। রক্ষীবাহিনীর প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যাচের কর্মকর্তা অর্থাৎ লিডারদের অবদান ছিল উল্লেখ করার মতো। লিডার মোজাফফর হোসেন খুলনা ও বরিশাল এলাকায়; লুৎফর রহমান রাজশাহী, বিশেষ করে নওগাঁ ও নাটোর এলাকায়; আকরাম হোসেন চট্টগ্রাম এলাকায়; তায়েব উদ্দিন খান পাবনা এলাকায়; রাখালচন্দ্র সাহা রংপুর এলাকায়; আলমগীর হাওলাদার বরিশাল ও সিলেট এলাকায়; শেখ দলিল উদ্দিন চট্টগ্রাম ও ঢাকা এলাকায়; আখতারুজ্জামান ঢাকা ও চট্টগ্রাম এলাকায়; সর্দার মিজানুর রহমান যশোর ও কুষ্টিয়া এলাকায়; শরীফ ওয়ালিউর রহমান পাবনা ও বরিশাল এলাকায়; সৈয়দ রফিকুল ইসলাম (বীর প্রতীক) চট্টগ্রামের কুতুবদিয়া, মহেশখালী, উখিয়া এলাকায়; গাজী বেলায়েত হোসেন ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা এলাকায় এবং নুরুল হক তালুকদার বগুড়া, চট্টগ্রাম ও রংপুর এলাকায় তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠা, সততা ও দক্ষতার সঙ্গে পালন করেন। অনেক ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাঁদের কার্যদক্ষতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন, বিশেষ করে কর্নেল শাফায়াত জামিল[৮] ও কর্নেল খন্দকার নাজমুল হুদা। এ ছাড়া রক্ষীবাহিনীর কর্মকর্তাদের মধ্যে লিডার আবদুর রাজ্জাক, আলাউদ্দিন, লিয়াকত আলী, সাখাওয়াত হোসেন, আনোয়ারুল ইসলাম, সিরাজুল ইসলাম, সৈয়দ মনজুরুল আলম, আইনুল কামাল, আবদুল হাকিম তালুকদার, এ টি এম এ হালিমসহ অন্য লিডাররা দেশের বিভিন্ন স্থানে তাঁদের পেশাগত কাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। লিডার আশরাফুল হাফিজ খান ও ফারুক হোসেন দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে শাহাদাত বরণ করেন। লিডার হাবিবুর রহমান একবার আরিচা ফেরিঘাটে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান, যদিও তাঁর ডেপুটি লিডার গুলজার হোসেন ও অন্য দুই রক্ষী সদস্য শহীদ হন।

ভুট্টোর সফর ও পাকিস্তানি ভাবধারায় বিশ্বাসী কিছু বাঙালির কাণ্ড

১৯৭৪ সালের ২৭ জুন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো দুই দিনের সফরে ঢাকা সফরে আসেন। এর আগে ২৩ ফেব্রুয়ারি (১৯৭৪) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইসলামি সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে লাহোর সফর করেন। বঙ্গবন্ধু ওই সম্মেলনে যোগ দিতে প্রথমে রাজি ছিলেন না। কারণ, পাকিস্তান তখনো বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেয়নি। এ সময় কুয়েতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ সাবাহ আল আহমদ আল জা য়রের নেতৃত্বে ইসলামি সম্মেলন সংস্থাভুক্ত (ওআইসি) সাতটি দেশের এক যৌথ প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফর করে। সম্মেলনে যোগদানের ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুকে রাজি করাতে তাঁরা বাংলাদেশে আসেন। অনেক আলাপ-আলোচনার পর বঙ্গবন্ধু লাহোর যান। বঙ্গবন্ধু যেদিন পাকিস্তান যান সেদিন এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে। বিমানবন্দরে জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বঙ্গবন্ধুকে অভ্যর্থনা জানান। এ সময় লাহোর বিমানবন্দর, আশপাশের এলাকা ও রাস্তার দুপাশে লাখ লাখ মানুষ সমবেত হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অভ্যর্থনা জানাতে। সে এক অভাবনীয় দৃশ্য। বঙ্গবন্ধু নিজেও বুঝতে পারেননি তাঁকে লাহোরের জনগণ এমন স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণঢালা সংবর্ধনা জানাবে। এ রকম ঘটনা ঘটবে ভুট্টোও ধারণা করেননি। এ ছাড়া পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোও বিষয়টি আগে থেকে অনুমান করতে পারেনি। এই পরিস্থিতিতে সেদিন এক বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়েন ভুট্টো।

এর কিছুদিন পর জুলফিকার আলী ভুট্টো বাংলাদেশ সফর করেন। চতুর ভুট্টো এ সময় সম্ভবত ওই ঘটনার প্রতিশোধ নেন। তাঁর সফরের সময় ঢাকা বিমানবন্দর এলাকা ও তাঁকে যে পথ দিয়ে হোটেলে নেওয়া হবে সে পথে যাতে লাহোরের মতো লোকসমাগম হয়, তার জন্য তিনি গোপনে ব্যবস্থা নেন। পরে ঘটনাটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়। বাংলাদেশ সফরের আগেই ভুট্টো একটা অগ্রগামী দল ঢাকায় পাঠান। বঙ্গবন্ধু সরকার সরল মনেই পাকিস্তানের অগ্রগামী দলকে বাংলাদেশ সফরের অনুমতি দেয়। ওই দলে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, ইন্টার সার্ভিস ইন্টেলিজেন্সের (আইএসআই) প্রতিনিধিসহ কয়েকজন ব্যবসায়ী ছিলেন। সফর ব্যবস্থাপনা ছাড়াও ওই দল যে তথাকথিত পাকিস্তানি মনোভাবাপন্ন বাঙালিদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করে ভুট্টোর সংবর্ধনার জন্য জনসমাগম করার ব্যবস্থা করেছিল, পরে সেটা বোঝা গিয়েছিল। দেখা গেল, ভুট্টোর আগমনের দিন তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল[১০] পর্যন্ত রাস্তার দুপাশে দল বেঁধে বিভিন্ন মাদ্রাসার ছাত্র এবং পাকিস্তানি ভাবধারার একশ্রেণীর বাঙালি দাঁড়িয়ে আছে। ভুট্টোর গাড়িবহর যখন তাদের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল তখন তারা 'ভুট্টো জিন্দাবাদ', 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি দেয়। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার এবং প্রতিটি দেশপ্রেমিকের জন্য এই দৃশ্য দেখা মোটেই সুখকর ছিল না; বরং বলা যেতে পারে, লজ্জাজনকই ছিল। আর এটা যে স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না, সেটাও আমরা অনেকে বুঝতে পারি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জুলফিকার আলী ভুট্টোর সফরের প্রথম কর্মসূচিতে ছিল ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তিনি জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন। কিন্তু বাংলাদেশে অবস্থানরত পাকিস্তানি মনোভাবাপন্ন বাঙালিদের সংবর্ধনায় ভুট্টো বেঁকে বসেন এবং জানান যে, তিনি সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে যাবেন না। তাঁর এবং সফরসঙ্গীদের ভাবখানা এমন যে বাংলাদেশের অনেক বাঙালিই অখণ্ড পাকিস্তানে বিশ্বাস করে। তাহলে বাংলাদেশের জন্য যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তাঁদের স্মৃতির প্রতি তিনি সম্মান জানাবেন কেন? এ ঘটনা এখনকার প্রজন্ম দূরের কথা, আমাদের বয়সী যাঁরা বেঁচে আছেন, তাঁদের অনেকেও জানেন না। আমিও সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারিনি, পরে জেনেছি। বিষয়টি জানতে পেরে বঙ্গবন্ধু তখন অত্যন্ত দৃঢ় একটা অবস্থান নেন। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন ভুট্টো সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা না জানালে তাঁকে পাকিস্তানে ফিরে যেতে হবে এবং দুই দেশের মধ্যে কোনো সরকারি আলোচনা হবে না।

ঢাকায় যখন ভুট্টোর সফরসঙ্গী দলের সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে এ বিষয়ে সরকারের আলোচনা হচ্ছে, তখন আমি সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ এলাকায় নিরাপত্তা রক্ষায় ব্যস্ত। এ সময় দেখি, বেশ কিছু লোক দল বেঁধে সেখানে আসছে। অথচ স্মৃতিসৌধ কর্মসূচিতে সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণের কোনো সুযোগ ছিল না। একপর্যায়ে পুলিশ কর্মকর্তা এম এম মজুমদার ও আবদুস সালামের সঙ্গে আলোচনা করে আমি উপস্থিত পুলিশ এবং রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের স্মৃতিসৌধসংলগ্ন সড়কে মোতায়েন করি, যাতে সমবেত কেউ ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে; ভুট্টোর গাড়িবহর যাতে বাধা না পায়।

এদিকে লোকসমাগম ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। আমি চিন্তিত হয়ে পড়ি। আমার মনে হলো, ঢাকার মতো এখানেও হয়তো ওই লোকগুলো ভুট্টোকে সংবর্ধনা জানাতে এসেছে। আমি কয়েকজন সদস্যকে সমবেতদের পর্যবেক্ষণ করার নির্দেশ দিলাম। জানতে পারলাম, সমবেত লোকজনের মধ্যে মাদ্রাসা ছাত্রের সংখ্যাই বেশি।

সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ভুট্টোর স্মৃতিসৌধে আসার কোনো খবর নেই। একপর্যায়ে পুলিশের ওয়্যারলেসের মাধ্যমে জানতে পারি ভুট্টো ঢাকা থেকে রওনাই হননি। অন্যদিকে সমবেতদের দেখে আমাদের, বিশেষত আমার, সন্দেহ হলো স্মৃতিসৌধে যাতে বেশি লোকজন হয়, সে জন্যই ভুট্টো ইচ্ছে করে দেরি করছেন। ভুট্টো আসার সঙ্গে সঙ্গে সমবেত লোকজন ঢাকার মতো 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান দিতে পারে। এ অবস্থায় আমি তাৎক্ষণিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু ব্যবস্থা নিই। আমি রক্ষীবাহিনীর সাভার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দ্রুত খবর পাঠালাম। সাদা পোশাকে রক্ষীবাহিনীর আরও কিছু সদস্যকে যত দ্রুত সম্ভব স্মৃতিসৌধে পাঠাতে বললাম। ১৫-২০ মিনিটের মধ্যে তাঁরা চলে আসেন। তাঁদের আমি সমবেত লোকজনের মধ্যে মিশে যাওয়ার নির্দেশ দিই। কেউ 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান দিলে তাঁকে ধরে সঙ্গে সঙ্গেই রক্ষীবাহিনী ক্যাম্পে নিয়ে যেতে বলি। যাঁরা পোশাক পরে দায়িত্ব পালন করছিলেন, তাঁদেরও নির্দেশ দিলাম, যাঁরা স্লোগান দেবে তাঁদের যেন ঘিরে ফেলা হয় এবং স্লোগানদাতাদের যেন গ্রেপ্তার করা হয়।

ভুট্টোর সফরসঙ্গীদের কয়েকজন সকাল থেকেই স্মৃতিসৌধে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন এয়ার মার্শাল নূর খান[১১]। জুন মাসের প্রখর রোদ আর তাপে তিনি দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে একসময় ঘাসের ওপর বসে পড়েন। কারণ, নির্মাণাধীন স্মৃতিসৌধ এলাকায় বসার তেমন কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তখন প্রায় দুপুর, সূর্য মাথার ওপর কিন্তু ভুট্টো আসছেন না। আমি নূর খানের পাশে বসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ভুট্টো আসছেন না কেন? বললেন, তিনি জানেন না। বসে থাকতে থাকতে একসময় খবর এল, ভুট্টো আসছেন। তবে গাড়িতে নয়, হেলিকপ্টারে।

বাংলাদেশ সরকারের চাপে এবং দৃঢ়তায় ভুট্টোকে মাথা নত করতেই হয়। দেরিতে হলেও তিনি জাতীয় স্মৃতিসৌধে আসতে বাধ্য হন। ভুট্টোকে আমি আগেও দেখেছি কিন্তু এবার চেহারা দেখে মনে হলো, তাঁর চোখ-মুখ লাল, গম্ভীর ও বিরক্ত। ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে এসেছেন, তা স্পষ্ট বোঝা গেল তাঁর মুখমণ্ডল ও পোশাকের দিকে তাকিয়ে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনী, মিলিশিয়া আর তাদের দোসর রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনীর নির্মম নির্যাতন আর নিষ্ঠুরতায় যে ৩০ লাখ বাঙালির প্রাণহানি হয়েছিল, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ভুট্টোর বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। তিনি একটা সাধারণ বেশে, মাথায় গলফ টুপি পরে এসেছিলেন।

জুলফিকার আলী ভুট্টো স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক দেওয়ার সময় বাইরে অপেক্ষমাণ লোকজনের মধ্যে কেউ কেউ 'ভুট্টো জিন্দাবাদ', 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি দেওয়ার চেষ্টা করে। এ ধ্বনি ভুট্টোর কানে পৌঁছেনি। এর আগেই লিডার মোজাফফর হোসেনের নেতৃত্বে রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা তাদের ধরে ট্রাকে উঠিয়ে রক্ষীবাহিনী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নিয়ে যায় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। ভুট্টো শহীদ বেদিতে ফুলের স্তবক অর্পণ করে হেলিকপ্টারে ঢাকা ফিরে যান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশ সফর শেষে ভুট্টোর পাকিস্তানে ফেরত যাওয়ার দিন আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে হোটেল থেকে তেজগাঁও বিমানবন্দর পর্যন্ত রাস্তায় কোনো লোক থাকবে না। সে অনুযায়ী রাস্তায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান, যথা বাংলামোটর মোড়, ফার্মগেট এলাকায় পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের মোতায়েন করা হয়। তার পরও ভুট্টোর যাওয়ার সময় দেখা গেল মগবাজার থেকে বাংলামোটরের দিকে একদল লোক আসছে। সাভারের মতো এরাও ছিল মাদ্রাসার ছাত্র। তাদের যথাসময়ে প্রতিহত করা হয়।

তেজগাঁও বিমানবন্দরের উল্টো দিকে বিমানবাহিনীর বর্তমান অফিসার্স মেসের ফ্যালকন হলের পাশে একদল লোক দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের সরে যেতে বললে তারা সরে যায়। কিন্তু একজন মধ্যবয়সী লোক সেখান থেকে কিছুতেই যেতে রাজি হচ্ছিলেন না। দিদারুল আলম নামের রক্ষীবাহিনীর একজন ডেপুটি লিডার সেখানে দায়িত্বে ছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, দু-একজন পথচারী থাকলে তো কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু ভুট্টোর গাড়িবহর যাওয়ার সময় ওই লোক উচ্ছ্বসিত হয়ে দুহাত নেড়ে ভুট্টোকে বিদায় জানাতে থাকে। একপর্যায়ে লোকটি ভুট্টোর গাড়ির কাছে যাওয়ার চেষ্টা করে। দিদারুল আলম এ দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে তার পিঠে রাইফেলের বাঁট দিয়ে আঘাত করে। লোকটা মাটিতে পড়ে যায়।

পরদিন বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে অভিযোগ আসে যে রক্ষীবাহিনী তাদের অফিসার স্কোয়াড্রন লিডার শামিম আহমেদকে নির্যাতন করেছে। আমরা বিমানবাহিনীকে জানাই যে রক্ষীবাহিনী কাজটা ঠিক করেনি। কিন্তু স্কোয়াড্রন লিডার শামিম আহমেদ সাদা পোশাকে ছিলেন। তাঁর পোশাকে বিমানবাহিনী লেখা ছিল না। আমরা আরও জানাই যে সেখানে রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা দায়িত্ব পালনকালে তাঁদের কথায় অন্যরা সবাই চলে যান। কিন্তু স্কোয়াড্রন লিডার শামিম জায়গা ছেড়ে যাননি। তাঁর এত ভুট্টো-প্রেম কেন তদন্ত করে দেখা উচিত। অস্বীকার করার উপায় নেই যে এরকম কিছু ক্ষেত্রে দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

আরও কয়েকটি ঘটনা : বঙ্গবন্ধু-সাভার-শেখ মনি

খুব প্রাসঙ্গিক না হলেও সে সময়ের অবস্থা বোঝার জন্য কয়েকটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি। ১৯৭৩ সালের মাঝামাঝি সাভারে অবস্থিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রক্ষীবাহিনীর প্রশিক্ষণকেন্দ্র সম্প্রসারণের জন্য জমি অধিগ্রহণের কাজ শুরু হয়। এই কাজে প্রশিক্ষণকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে আমি ভূমি মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতাম এবং সময় সময় পরিচালককে অগ্রগতি সম্পর্কে জানাতাম। একদিন বিকেলবেলা আমাদের পরিচালক এ এন এম নূরুজ্জামান আমাকে তাঁর অফিসকক্ষে ডেকে পাঠান। আমি তাঁর কাছে গেলে তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাকে দ্রুত গণভবনে যেতে বলেছেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে শেরেবাংলা নগরের নতুন গণভবনে যাই। সেখানে গিয়ে দেখি বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি প্রবীণ রাজনীতিবিদ কমরেড মণি সিংহের সঙ্গে কথা বলছেন। তাঁদের পাশে আছেন আরেকজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক। তাঁর নামটা এখন মনে পড়ছে না। তবে এটুকু মনে আছে, তিনি পেশায় প্রকৌশলী এবং কমিউনিস্ট পার্টির একজন সদস্য বা শুভানুধ্যায়ী ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাকে দেখেই তাঁর কাছে বসতে বললেন। আমি তাঁর পাশে বসলে তিনি আমাকে সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধ এলাকার হাতে আঁকা একটা ম্যাপ দিয়ে বললেন, শহীদ (আমার ডাক নাম), স্মৃতিসৌধের পাশে একটা জমি আছে। সেটা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। জমিটা এই ভদ্রলোকের অর্থাৎ সেখানে যিনি উপস্থিত ছিলেন। তারপর বঙ্গবন্ধু আমাকে বললেন তিনি ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িটা বিক্রি করে ওই জমিটা কিনতে চান। বঙ্গবন্ধুর কথা শুনে আমি চমকে উঠি এবং তাঁর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি। বঙ্গবন্ধু বলতে থাকেন, তিনি মনে মনে ঠিক করেছেন, প্রধানমন্ত্রিত্ব ছেড়ে অবসরে যাবেন এবং জাতীয় স্মৃতিসৌধের পাশে ওই জমিতে বাড়ি করে বাকি জীবনটা সেখানে কাটাবেন। ওই বাড়িতে একটা সমৃদ্ধ পাঠাগার থাকবে। সেখানে তিনি লেখাপড়া করবেন এবং সরকার কোনো ভুল করলে মাঝেমধ্যে হুংকার ছাড়বেন। আরও বলেছিলেন, বিদেশ থেকে কোনো রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারপ্রধান এলে ওই বাড়িতেই তিনি তাঁকে বা তাঁদের অভ্যর্থনা জানাবেন। বঙ্গবন্ধুর কথাগুলো শুনতে আমার খুবই ভালো লাগছিল। কারণ, বঙ্গবন্ধু যে শীর্ষে উঠেছিলেন, সেই শীর্ষেই তাঁকে চিরকাল আমি দেখতে চেয়েছিলাম।

ঠিক হলো, পরদিন আমি আর ওই ভদ্রলোক সাভারে জমিটা কী অবস্থায় আছে এবং সেখানে যাওয়ার রাস্তা করা যাবে কি না ইত্যাদি দেখতে যাব। পরদিন যথাসময়ে ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমি সাভারে যাই। তখন জাতীয় স্মৃতিসৌধের নির্মাণকাজ চলছিল। আমরা হেঁটে জমিতে যাই। জায়গাটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে চারদিকে তাকিয়ে আমার খুব ভালো লাগল। চারদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ। দেখা গেল, ওই জমি ও স্মৃতিসৌধ এলাকার মাঝখানে কিছুটা নামা জমি। সঠিক পরিকল্পনা করে যদি বাড়িটি তৈরি করা হয় তাহলে বঙ্গবন্ধু ওই বাড়িতে বসেই প্রতিদিন জাতীয় স্মৃতিসৌধ আর চারদিকে সবুজের সমারোহ দেখতে পাবেন। জমিতে দাঁড়িয়ে সেদিন আমার মনে হয়েছিল, বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে যাঁরা বাংলাদেশের জন্য আত্মাহুতি দিয়েছেন, সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তাঁদের পুণ্য স্মৃতির পাশেই তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যদি থাকেন, তাহলে সেটা হবে এক অনন্য ঘটনা। বহু বছর পর এখন মনে হচ্ছে, হয়তো তিনি জাতীয় স্মৃতিসৌধের পাশেই সমাহিত হবেন, এমনটাও ভেবেছিলেন।

সেদিন জমিটা দেখে আমি ঢাকায় ফিরে আসি। প্রথমেই বিষয়টি এ এন এম নূরুজ্জামানের কাছে রিপোর্ট করি। তারপর সহকর্মী সরোয়ার হোসেন মোল্লা ও আবুল হাসান খানকে বলি। সবাই বিষয়টি জেনে খুব আনন্দিত হন। সন্ধ্যার পর রাত আনুমানিক নয়টার দিকে আমি ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাই। বাসার দোতলায় বঙ্গবন্ধুর শোবার ঘরে একটা টুলে বসে বঙ্গবন্ধুকে জমি ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বিবরণ দিই। এই সময় বেগম মুজিব বঙ্গবন্ধুকে খাওয়ার জন্য ডাকেন। বঙ্গবন্ধু আমাকেও তাঁর সঙ্গে খেতে বলেন। খাওয়ার সময়ও বঙ্গবন্ধু জমিটার কথা, আশপাশে রাস্তার অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে আমার কাছে জানতে চান। এমন সময় তাঁর ভাগনে শেখ ফজলুল হক মনি সেখানে আসেন। বঙ্গবন্ধু তাঁকেও খেতে বলেন। কিন্তু তিনি খেতে তেমন আগ্রহ দেখালেন না, তবে খাওয়ার টেবিলে বসলেন।

খাওয়ার সময়ও জমি নিয়ে কথা হয়। কথা বলতে বলতে একপর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার কথাও ওঠে। সে প্রসঙ্গে শেখ মনি বলে ওঠেন, 'মামা, মুক্তিযুদ্ধের সময় সরকার ছিল রাষ্ট্রপতিশাসিত। এ ধরনের সরকারের রাষ্ট্রপতিই প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপরাষ্ট্রপতি হয়ে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। তাজউদ্দীন সাহেবও উপপ্রধানমন্ত্রী হয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি।' অর্থাৎ শেখ মনি বলতে চাচ্ছিলেন, এ ধরনের সরকারে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী এক ব্যক্তিই হন। স্পষ্টতই আমি লক্ষ করলাম, শেখ মনির কণ্ঠে তাজউদ্দীন আহমদের ব্যাপারে অভিযোগের সুর। বঙ্গবন্ধু এ বিষয়ে কোনো কথা বললেন না। তবে শেখ মনি যে তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর একটা দূরত্ব সৃষ্টি করতে চাইছেন, তা মোটামুটি বোঝা গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় নভেম্বর মাসে আমি টাঙ্গাইল মুক্তিবাহিনীর পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে কলকাতায় গিয়েছিলাম। তখন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি ও মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রীসহ সব মন্ত্রী, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে আমি দুটো তথ্য জেনেছিলাম এবং আমার দুটো ধারণা হয়েছিল। প্রথমটি ছিল পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদের ষড়যন্ত্র। এর মাধ্যমে খন্দকার মোশতাক বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জারের কুচক্রে পা দিয়েছিলেন। মোশতাক মুজিবনগর সরকারের মধ্যে ফাটল ধরিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করার অপচেষ্টা চালিয়েছিলেন। তিনি কাজী জহুরুল কাইয়ুম ও কলকাতায় মার্কিন কনস্যুলেটের কর্মকর্তা জর্জ জি বি গ্রিফিনের মাধ্যমে এ অপচেষ্টা চালান। বিষয়টি টের পেয়ে মুজিবনগর সরকার খন্দকার মোশতাককে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্বে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিল। সেই থেকে খন্দকার মোশতাকও তাজউদ্দীন আহমদের পেছনে লেগেছিলেন।

দ্বিতীয়টি ছিল শেখ ফজলুল হক মনিকে নিয়ে। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই শেখ ফজলুল হক মনি ভারতে গিয়ে সেখানকার সরকারের কাছে এই মর্মে দাবি উপস্থাপন করেছিলেন যে বঙ্গবন্ধুর ভাগনে হিসেবে তাঁর অনুপস্থিতিতে তিনিই বিপ্লবী সরকার গঠন করবেন এবং মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দেবেন। কিন্তু ভারত সরকার ঠিকই জানত যে বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দীন আহমদই তাঁর প্রতিনিধিত্ব করবেন। এতে মনঃক্ষুণ্ন হয়ে শেখ মনি ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় বাংলাদেশ সরকারের আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ এবং ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি ও সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান বয়কট করেন। সেদিন বৈদ্যনাথতলার নামকরণ করা হয় মুজিবনগর। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ঘোষণা করেন, দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত মুজিবনগরই বাংলাদেশের রাজধানী। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কার্যক্রম দেশে-প্রবাসে যেখানেই পরিচালিত হোক না কেন, সরকারের নাম হবে 'মুজিবনগর সরকার'। মুজিবনগর সরকারে শেখ মনির কোনো অবস্থান না থাকলেও মুজিব বাহিনী গঠনে ভারত সরকার তাঁকে সহযোগিতা করে। তখন থেকেই শেখ মনি তাজউদ্দীন আহমদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন। আমার ধারণা, হয়তো তাঁর পরিকল্পনায় ছিল যে বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তিনি রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এসব বিষয়ে অবহিত ছিলেন কি না আমি জানি না। তবে একপর্যায়ে তাজউদ্দীন আহমদের মতো একটা শক্ত খুঁটিকে সরিয়ে দিয়ে বঙ্গবন্ধু নিজের ঘরের ভিত্তিই দুর্বল করে ফেলেছিলেন বলে আমার মনে হয়। অথচ আমি ভেবেছিলাম, তাজউদ্দীন আহমদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে সাভারের স্মৃতিসৌধের পাশে বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা হিসেবে বাকি জীবন কাটাবেন।

বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ের ৩০তম বার্ষিকীর অনুষ্ঠান এবং কিছু ঘটনা

১৯৭৫ সালের ৮ মে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ের ৩০তম বার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ঢাকায় নিযুক্ত ইউরোপের কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রদূত যৌথভাবে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। সেখানে আমন্ত্রিতদের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদের কয়েকজন সদস্য, রাজনৈতিক নেতা, সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানসহ জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। আমন্ত্রিত হয়ে জাতীয় রক্ষীবাহিনীর পক্ষ থেকে এ এন এম নূরুজ্জামান, সরোয়ার হোসেন মোল্লা ও আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। অনুষ্ঠানে উপস্থিত পরিচিতজনদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে একপর্যায়ে আবু তাহেরের সঙ্গে আমার দেখা হয়। তিনি তখন ড্রেজার সংস্থার পরিচালক ছিলেন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৪৪ ব্রিগেড অধিনায়ক থাকাকালে সেনাসদর কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করায় ১৯৭২ সালের জুন মাসে তাঁকে অবসরে যেতে হয়েছিল। এ ঘটনায় তিনি ক্ষুব্ধ ও মনঃক্ষুণ্ন ছিলেন। সেদিন ওই অনুষ্ঠানে তাঁকে একটু উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। আমার সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি একটা মন্তব্য করেন, 'এভাবে দেশ চলতে পারে না।' তাঁর ক্ষোভ যে সরকারের বিরুদ্ধে ছিল, সেটা স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছিল।

পরদিন অফিসে গিয়ে পরিচালক এ এন এম নূরুজ্জামানকে আমি বিষয়টি জানাই। তিনি আমাকে বলেন, আবু তাহেরের ক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ সবাই জানে। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর এত বড় অবদান ও ত্যাগ থাকা সত্ত্বেও তাঁকে সেনাবাহিনী থেকে অবসর প্রদান করা হয়েছে। যদিও বঙ্গবন্ধু তাঁকে একটা চাকরি দিয়েছেন, কিন্তু তাতে তিনি খুশি ছিলেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রক্ষীবাহিনীর রক্ষী ব্যান্ডের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পরিচালক ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা

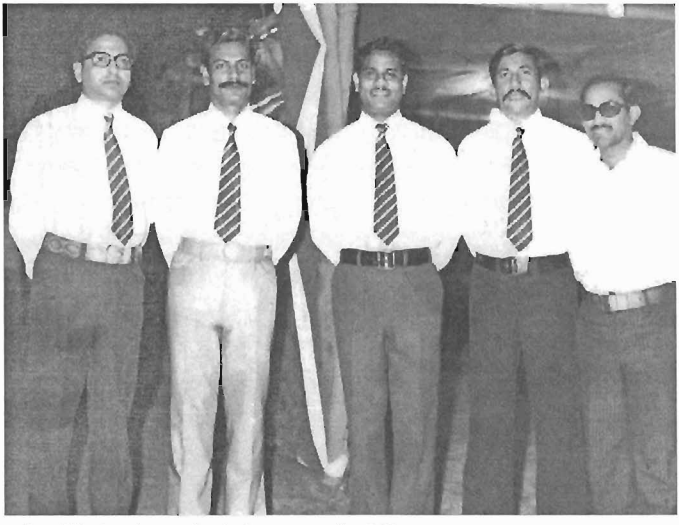

রক্ষীবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বাঁ থেকে সাবিহ উদ্দিন আহমেদ, সরোয়ার হোসেন মোল্লা, লেখক, শরিফ উদ্দিন আহমেদ ও সালাহউদ্দিন আহমেদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাকশাল গঠন, বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তা এবং ই এ চৌধুরী

১৯৭৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর সরকার সারা দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে। ধর্মঘট, লকআউট নিষিদ্ধ ও মৌলিক অধিকার স্থগিত করা হয়। সরকারি প্রেসনোটে বলা হয়, সমাজবিরোধীদের কার্যকলাপের কারণে দেশে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। এরপর ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করেন। তখনই দেশে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) নামে সব দলের সমন্বয়ে একটি দল গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং এক মাস পর ২৪ ফেব্রুয়ারি তা শেষ হয়। এ সময় রাজনৈতিক পরিবর্তন ও সমীকরণ এত দ্রুত হতে থাকে যে মধ্যস্তরের একজন সরকারি কর্মকর্তা হয়েও আমাদের পক্ষে উদ্ভূত পরিস্থিতি পুরোপুরি অনুধাবন করা সহজ ছিল না। তবে আমরা—সরোয়ার হোসেন মোল্লা ও আমি—পরিস্থিতি কোন দিকে যায় তা নিয়ে শঙ্কিত ছিলাম। আমার ব্যক্তিগত ধারণা ছিল, দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার পরপরই যা করার দরকার ছিল, তা করা হলো অনেক দেরিতে। যখন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অন্য আকার ধারণ করেছে। আমাদের শঙ্কার প্রধান কারণ ছিল বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তা।

১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চিলির রাষ্ট্রপ্রধান সমাজবাদী সালভেদর আয়েন্দেকে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএর জড়িত থাকার বিষয়টি আলোচনায় আসার পর বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তার বিষয়টি আমাদের কাছেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এ বিষয়ে আমাদের পরিচালক এ এন এম নূরুজ্জামানের সঙ্গে আমরা অনেকবার কথা বলেছি। তাঁকে অনুরোধ করেছি, যাতে বঙ্গবন্ধুর বাড়ি ও কার্যালয়ে অন্যদের সঙ্গে রক্ষীবাহিনীর সদস্যদেরও পাহারায় মোতায়েন করা হয়। কিন্তু সরকারের নীতিমালায় রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তা দলে বা তাঁর অফিস ও বাসভবনের নিরাপত্তার জন্য রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের রাখার বিধান না থাকায় রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের কখনো পাহারায় রাখা হয়নি।

এ সময় একদিন পরিচালক এ এন এম নূরুজ্জামান আমাদের জানালেন যে, সরকার রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তার জন্য 'প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্ট' গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে আমরা কিছুটা চিন্তামুক্ত হই। রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টে থাকবে কি না জানতে চাইলে নূরুজ্জামান আমাদের জানান, এ বিষয়ে তিনি রাষ্ট্রপতি ও ঊর্ধ্বতন মহলের সঙ্গে কথা বলে দেখবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর কিছুদিন পর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট কর্নেল হারুন আহমেদ চৌধুরীকে[১২] জাতীয় রক্ষীবাহিনীর উপপরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এটাও আমাদের জন্য আনন্দের বিষয় ছিল। কারণ তিনি ছিলেন একজন মুক্তিযোদ্ধা। তা ছাড়া মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে কালুরঘাট যুদ্ধে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হলে আমার স্ত্রী ডা. সাঈদা খান ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর চিকিৎসা করেছিলেন। সে জন্য তিনি আমার স্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। সেই সূত্রে তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ও সুসম্পর্ক ছিল। কিন্তু সহসাই সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে হারুন আহমেদ চৌধুরী 'প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টে'র অধিনায়ক হবেন এবং তিনিই রেজিমেন্টটি গঠন করবেন। এরপর শুরু হয় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে বাছাই করা চৌকস সেনাদের দিয়ে প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্ট গঠন করার প্রক্রিয়া। এ এন এম নূরুজ্জামান রাষ্ট্রপতি ও সেনাবাহিনীর প্রধানের সঙ্গে আলোচনা করে রক্ষীবাহিনীর কিছু চৌকস সদস্যকে প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১৯৭৫ সাল বাংলাদেশের জন্য অনেক অশুভ সংকেত নিয়ে এসেছিল। কিছু সংকেত আঁচ করা গিয়েছিল, কিছু যায়নি। যেগুলো আঁচ করা গিয়েছিল সেগুলো সঠিক তথ্যনির্ভর ছিল না। আর যেগুলো সম্পর্কে আঁচ করা যায়নি, সেগুলোই দেখা গেল ঠিক। জাতীয় রক্ষীবাহিনীর নিজস্ব কোনো গোয়েন্দা বিভাগ ছিল না। আইন মোতাবেক বাহিনীর দায়িত্বই ছিল বেসামরিক প্রশাসনের চাহিদা অনুযায়ী তাঁদের সহযোগিতা করা। সুতরাং এ বাহিনীর নিজস্ব কোনো গোয়েন্দা বিভাগের প্রয়োজনও ছিল না।

ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্সের (এনএসআই) প্রধান ছিলেন ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা এ বি এম সফদার। তাঁর সহকারী ছিলেন পুলিশের ডিআইজি এস এ হাকিম। আমরা আমাদের ব্যস্ততার মধ্যেও বিভিন্ন সময় কানাঘুষা শুনতাম যে এ বি এম সফদার পাকিস্তান রাষ্ট্রের আদর্শের প্রতি অত্যন্ত অনুগত অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানিদের চেয়েও বেশি পাকিস্তানি ছিলেন। পাকিস্তান রাষ্ট্রের তথাকথিত নিয়ন্ত্রক পাঞ্জাবিদের সঙ্গে তাঁর ছিল দারুণ হৃদ্যতা। তাদের হয়ে আগ বাড়িয়ে বাঙালি ধ্যানধারণা ও আদর্শের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণে তিনি দ্বিধা করতেন না। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএর সঙ্গেও তাঁর নাকি ঘনিষ্ঠতা ছিল। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি ঢাকায় স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিআইজি ছিলেন। বাংলাদেশ নামক স্বাধীন-সার্বভৌম দেশটির প্রতি তাঁর কতটুকু আনুগত্য ছিল, সেটাও একটা ভাবনার বিষয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল। এনএসআই-প্রধান ও পরে রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তাসংক্রান্ত ভিজিলেন্স টিমের প্রধান হিসেবে তিনি কতটুকু তৎপর ছিলেন, সেটা জানার আমাদের কোনো উপায় ছিল না। তাঁর সঙ্গে আমাদের কখনো যোগাযোগ হয়নি। তাঁকে এনএসআইয়ের প্রধান করার বিষয়টি আমাদের বোধগম্য ছিল না। এ ছাড়া বঙ্গবন্ধু নিজেই যেহেতু তাঁকে এনএসআইয়ের প্রধান করেন, সেহেতু এ নিয়ে আমরা তেমন আলোচনা করতাম না। তবে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় এ বি এম সফদারের কার্যক্রম আমাদের কাছে সব সময় রহস্যাবৃত ছিল।

অপর গোয়েন্দা সংস্থা স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিআইজি ছিলেন পুলিশ কর্মকর্তা ই এ চৌধুরী। তিনিও মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন না। মুক্তিযুদ্ধকালে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে ছিলেন। জীবন বাঁচানোর জন্য চাকরি করেছেন। কিন্তু পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কোনো অপকর্মের সঙ্গে জড়িত হননি। পাকিস্তান সরকারের অনুগত হিসেবে চাকরি করেও স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের বাস্তবতা দ্রুত আত্মস্থ করেছেন। পেশাদার ও একজন বিচক্ষণ কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। তাঁর সঙ্গে নিয়মিত আমাদের দেখা হতো। স্পষ্টতই তাঁর তৎপরতা আমরা দেখতে পেতাম। বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তা নিয়ে তিনি সব সময়ই চিন্তিত থাকতেন। একজন সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে যেসব কথা তিনি রাষ্ট্রপতিকে সরাসরি বলতে পারতেন না, সে কথা রাষ্ট্রপতিকে বলার জন্য প্রায়ই সরোয়ার আর আমাকে সঙ্গে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর কাছে যেতেন। আমাদের মতো তিনিও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে থাকা কোনোভাবেই বঙ্গবন্ধুর জন্য নিরাপদ নয়। ই এ চৌধুরী ছিলেন এ বি এম সফদারের বিপরীত। তিনি আমাদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন।

অন্যদিকে ডাইরেক্টর জেনারেল ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স (ডিজিএফআই) ছিল সশস্ত্র বাহিনীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা সংস্থা। ১৯৭৫ সালে এই সংস্থার মহাপরিচালক ছিলেন ব্রিগেডিয়ার আবদুর রউফ। তিনি ছিলেন পাকিস্তান-প্রত্যাগত সামরিক কর্মকর্তা। তাঁর সম্পর্কেও আমাদের তেমন কিছু জানা ছিল না। কখনো তাঁর সংস্পর্শে যাওয়ার সুযোগ হয়নি আমাদের।

দেশের নিরাপত্তা বজায় রাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর প্রধানদের বিষয়ে এই কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হলো সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে আমাদের তখনকার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে খানিকটা ধারণা দেওয়া। কারণ, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী ও পুলিশে খুব বেশি জ্যেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা ছিলেন না যাঁদের এসব গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেওয়া যায়। সেনাবাহিনী থেকে হয়তো একজন মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তাকে ডিজিএফআই-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রধান করা যেত, কিন্তু পুলিশ বাহিনী থেকে কাউকে এনএসআই বা স্পেশাল ব্রাঞ্চের প্রধান করার মতো মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা পাওয়া যেত না। কারণ পুলিশ বাহিনীতে মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তার সংখ্যা ছিল খুবই কম।

১৯৭৫ সালের এপ্রিল মাসের দিকে একদিন সন্ধ্যার পর ই এ চৌধুরী শেরেবাংলা নগরে রক্ষীবাহিনীর প্রধান কার্যালয় আসেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ঢাকার পুলিশপ্রধান মাহবুব উদ্দিন আহমেদ। আমরা সাধারণত সন্ধ্যার পরও অফিস করতাম। কারণ আমাদের পরিচালক রাত ১০টার আগে বাড়ি যেতেন না। তিনি ছিলেন অসাধারণ কর্মযোগী। তাঁর কক্ষেই আমরা সবাই বসলাম। ই এ চৌধুরী আমাদের জানালেন, তিনি নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর পেয়েছেন, ওই রাতেই বঙ্গবন্ধুর ওপর হামলা আসতে পারে। বিস্তারিত কিছু প্রকাশ করলেন না। তবে তিনি রক্ষীবাহিনীর সাহায্য চাইলেন। বঙ্গবন্ধুকে নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব সরকারিভাবে তো বটেই বেসরকারিভাবেও রক্ষীবাহিনীর ওপর ছিল না। ই এ চৌধুরীর অনুরোধে আমাদের পরিচালক এ এন এম নূরুজ্জামান সঙ্গে সঙ্গেই ঠিক করলেন, সরোয়ার আর আমি সারা রাত বঙ্গবন্ধু ভবনের আশপাশেই থাকব এবং আমাদের সঙ্গে রক্ষীবাহিনীর প্রয়োজনীয়-সংখ্যক সদস্যও থাকবেন।

রাত সাড়ে ১১টার দিকে মাহবুব উদ্দিন আহমেদ, সরোয়ার হোসেন মোল্লা ও আমি ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কের উল্টো দিকে লেকের ওপারে মিলিত হই। আমাদের সঙ্গে ছিল সাদা পোশাকে এক কোম্পানি রক্ষী সদস্য, কিছুসংখ্যক পুলিশ ও স্পেশাল ব্রাঞ্চের কয়েকজন গোয়েন্দা। ৩২ নম্বর সড়কের প্রতিটি প্রবেশপথ এবং আশপাশের এলাকায় যথাযথভাবে সবাইকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে আমরা তিনজন কিছু পুলিশ ও রক্ষী সদস্য নিয়ে লেকের ওপারে শেখ ফজলুল হক মনির বাড়ি লাগোয়া পার্কে অবস্থান নিই। সেখানে আমরা থাকি সারা রাত। মাঝেমধ্যে তিনজন চারদিক ঘুরে আসি। রক্ষীবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের সাদা পোশাকে এমনভাবে রাখা হয়েছিল যে সাধারণ মানুষ কিছুই বুঝতে পারেনি। অবশ্য তখনকার দিনে রাতের বেলায় শহরে বেশি মানুষ চলাচল করত না। গাড়িঘোড়াও ছিল না বেশি। সারা রাত দায়িত্ব পালন করেও বঙ্গবন্ধুর ওপর বা তাঁর বাড়িতে আঘাত হানার কোনো আলামত দেখতে পাওয়া গেল না। খুব সকালে পুলিশ ও রক্ষী সদস্যদের প্রত্যাহার করে আমরা চলে যাই।

বিকেলবেলা জানতে পারি শেখ ফজলুল হক মনি আমাদের ওপর খুব ক্ষিপ্ত হয়ে আছেন। কে বা কারা তাঁকে জানিয়েছেন যে গভীর রাতে সরোয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর আমাকে তাঁর বাড়ির আশপাশে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে। তাঁকে বোঝানো হয়েছে যে, তোফায়েল আহমেদের নির্দেশে আমরা রক্ষী সদস্যদের নিয়ে তাঁকে হত্যা করতে চেষ্টা করেছি। সরোয়ার আর আমি দেখলাম মহা বিপদ, কী করতে গিয়ে কী হলো! এ সময় চট করে আমাদের মাথায় বুদ্ধি এল, এই ভুল-বোঝাবুঝির অবসান ঘটাতে আমরা শেখ মনির সঙ্গে দেখা করব এবং প্রকৃত ঘটনা তাঁকে জানাব। কারণ, এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরে কোনো সমস্যাও হতে পারে। আমাদের পরিচালকের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করি। তিনি আমাদের সঙ্গে একমত হন।

সরোয়ার ও আমি সন্ধ্যার দিকে শেখ ফজলুল হক মনির সঙ্গে দেখা করতে তাঁর *বাংলার বাণী* অফিসে যাই। আমরা তাঁকে বিস্তারিত ঘটনা জানাই, অর্থাৎ কী কারণে আমরা সেখানে গিয়েছিলাম, সে ব্যাপারে তাঁকে অবহিত করি। সব জেনে তিনি আশ্বস্ত হন। আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

এর মাস দেড়েক পর স্পেশাল ব্রাঞ্চ বা অন্য কোনো সূত্রে আমাদের পরিচালক এ এন এম নূরুজ্জামান ধারণা করেন যে বঙ্গবন্ধুর ওপর রাতের বেলা আঘাত আসতে পারে। তিনি সরোয়ার এবং আমাকে নির্দেশ দেন বঙ্গবন্ধুর বাড়ির ওপর নজর রাখতে। বিস্তারিত আর কিছু বললেন না। তবে আমাদের চিন্তার মধ্যে ছিল, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের গণবাহিনী অথবা সেনাবাহিনীর কোনো অংশ এই কাজটা করতে পারে। এবারও সাদা পোশাকে রক্ষীবাহিনীর এক দল সদস্য নিয়ে সরোয়ার ও আমি বঙ্গবন্ধুর বাড়ির কাছে যাই। বঙ্গবন্ধুর বাড়ির অদূরেই শেখ ফজলুল হক মনির বাড়ি। রক্ষীবাহিনীর বেশির ভাগ সদস্যকে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির আশপাশে রেখে, অল্প কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে আমরা দুজন শেখ মনির বাড়ির ড্রয়িংরুমে অবস্থান নিই। তখন শেখ মনি বাড়িতেই ছিলেন। তাতে আমাদের সুবিধা হলো। রাতে মাঝে মাঝে চা-কফি আসতে থাকল। শেখ মনি নিজে ও তাঁর স্ত্রী আরজু মনি গভীর রাত পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকলেন।

আমরা রক্ষীদের মিরপুর রোড, মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ, সাত মসজিদ রোড, ধানমন্ডি ২৭ নম্বর সড়ক, নিউ মার্কেট এলাকাসহ ধানমন্ডির চারদিকে টহল দিতে বলি। শেষ রাতের দিকে একটা জিপ নিয়ে আমরাও চারদিকে ঘুরে আসি। কিন্তু সন্দেহজনক কোনো কিছুর লক্ষণ দেখিনি। সকালবেলা সবাইকে গুটিয়ে নিয়ে আমরা ফিরে যাই।

আগেই বলেছি, বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তা প্রদানের বা তাঁর বাড়িতে দায়িত্ব পালনের কোনো সুযোগ আমাদের ছিল না। নিয়মমাফিক প্রথমে সেনাবাহিনী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও পুলিশ সেই দায়িত্ব পালন করত। পরে প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্ট গঠিত হওয়ার পর তারা সেই দায়িত্ব পালন করতে থাকে। সে জন্য বঙ্গবন্ধুকে না জানিয়ে গোপনে আমাদের এই দায়িত্ব কয়েকবার পালন করতে হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনায় ই এ চৌধুরীর প্রসঙ্গে কিছু বলতেই হয়। রক্ষীবাহিনী নিয়ে আলোচনায় তাঁর নামটি হয়তো অতটা প্রাসঙ্গিক নয়, কিন্তু বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনায় প্রাসঙ্গিক। তখন রক্ষীবাহিনীর চাকরির সুবাদে অনেকবার দেখা ও কথা হয়েছে ই এ চৌধুরীর সঙ্গে।

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করলে তাঁর নিরাপত্তা বিষয়ে ই এ চৌধুরী বেশ উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি অনেকবার এবং আমরাও কয়েকবার বঙ্গবন্ধুকে বলেছি তাঁকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে রাষ্ট্রপতি ভবন অর্থাৎ বঙ্গভবনে থাকতে হবে। বঙ্গবন্ধু সব সময়ই বলতেন তিনি চিন্তা করে দেখবেন। ওই বছরের মে অথবা জুন মাসের একদিন—সঠিক তারিখ আমার মনে নেই, ঘটনাটা মনে আছে শুধু—সরোয়ার ও আমি কোনো এক কারণে সেদিন তখন ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে ছিলাম। এমন সময় ই এ চৌধুরী সেখানে উপস্থিত হন। আমাদের দেখে তিনি বললেন, 'আপনারা আছেন, খুব ভালো হলো। মহামান্য রাষ্ট্রপতির সঙ্গে জরুরি কথা আছে তাঁর নিরাপত্তা বিষয় নিয়ে। আপনারাও আমার সঙ্গে চলেন।' তাঁর আহ্বানে সম্মত হয়ে আমরা তাঁর সঙ্গে তখনই বঙ্গবন্ধুর কাছে গেলাম।

বঙ্গবন্ধু এ সময় তাঁর স্টাডিরুমে ছিলেন। সেটা ছিল বাড়ির নিচতলায়। ই এ চৌধুরী আমাদের দুজনকে সঙ্গে নিয়ে ওই কক্ষে ঢুকেই সেখানে যাঁরা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ছিলেন, তাঁদের তিনি বিনয়ের সঙ্গে বাইরে যেতে বলেন। তাঁরা বেরিয়ে গেলে তিনি বঙ্গবন্ধুকে সরাসরি বললেন, 'স্যার, এ বাড়িতে আপনি থাকতে পারবেন না, আপনাকে বঙ্গভবনে থাকতে হবে।' ই এ চৌধুরী বিস্তারিতভাবে বিষয়টি বঙ্গবন্ধুকে বললেন। তিনি আরও বললেন, 'একজন রাষ্ট্রপতির জন্য এ বাড়ি (৩২ নম্বরের বাড়ি) মোটেই নিরাপদ নয়। রাস্তা দিয়ে যাওয়ার পথে কেউ যদি একটা গ্রেনেডও ছুড়ে মারে, তাহলে আপনার বেডরুমে গিয়ে পড়বে।'

আমরা দুজনও ই এ চৌধুরীর বক্তব্যকে সমর্থন করি। সরোয়ার আর আমি জোর দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে বলি যে তাঁর বঙ্গভবনেই যাওয়া দরকার। তিনি আমাদের কথায় তেমন গুরুত্ব দিলেন বলে মনে হলো না। কিন্তু সরোয়ার ও আমি সেদিন নাছোড়বান্দার মতো বঙ্গবন্ধুকে বোঝাতে চেষ্টা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করি যে এই বাড়িতে তাঁর থাকা নিরাপদ নয়। তখন বঙ্গবন্ধু আমাদের দুজনকে বললেন, 'আমি তো যেতে পারি, কিন্তু তোদের ভাবি তো যেতে চায় না।' আমরা বলি যে ভাবিকে তো আপনাকেই বোঝাতে হবে। কারণ, প্রতিদিন শহরের মাঝখান দিয়ে আপনাকে বঙ্গভবনে যেতে হবে, আবার ফিরে আসতে হবে। প্রতিদিন একই সময় এ যাতায়াত বিপদ ঘটাতে পারে। কাজেই বঙ্গভবনে থাকাই সবচেয়ে নিরাপদ। সেখানে যথেষ্ট পরিমাণ সেনা পাহারায় থাকতে পারবেন।

আমাদের অনেক চেষ্টার পর বঙ্গবন্ধু বললেন, 'দেখি কী করি।'

তথ্যনির্দেশ

১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৩।

২. শান্তিনগরে চৌরাস্তা থেকে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে যাওয়ার পথে বাঁ পাশে হোয়াইট হল নামের একটি ভবনে সিআইডি পুলিশের কার্যালয় ছিল। ভবনটি এখন নেই।

৩. দূরবর্তী গোপন শিবির বা আস্তানা।

৪. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ১৯৭৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন। বঙ্গবন্ধু তাঁকে বিশেষ দূত হিসেবে নিয়োগ দেন।

৫. আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী : বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী ও নির্বাচিত সাংসদ।

৬. মাহফুজ আলম বেগ। পাকিস্তান নৌবাহিনীর কর্মকর্তা এবং স্পেশাল কমান্ডো সার্ভিসে কর্মরত ছিলেন। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ছুটি নিয়ে বাংলাদেশে আসেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তাতে যোগ দেন। জুলাই মাসের পর ৯ নম্বর সেক্টরের শমশেরনগর সাবসেক্টরের অধিনায়ক ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তবে স্বাধীনতার পর কিছু ঘটনায় তিনি বিতর্কিত হয়ে পড়েন।

৭. এ পদটি তখন প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদাসম্পন্ন ছিল।

৮. শাফায়াত জামিল বীর বিক্রম : ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মেজর ও চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি কোম্পানির অধিনায়ক ছিলেন। ২৫ মার্চ তিনি তাঁর ইউনিটের সঙ্গে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মোতায়েন ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ২৭ মার্চ তাঁর নেতৃত্বে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অবস্থানরত চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সেনা কর্মকর্তা ও সৈনিকেরা বিদ্রোহ করেন। এই বিদ্রোহ সংগঠনে ও মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা অনন্য। মুক্তিযুদ্ধকালে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর জেড ফোর্সের অধীন তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে সিলেটের রাধানগরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহত হন। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখায় তাঁকে বীর বিক্রম খেতাব প্রদান করে। পরে পর্যায়ক্রমে কর্নেল।

৯. খন্দকার নাজমুল হুদা বীর বিক্রম: ১৯৬৮ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে ক্যাপ্টেন পদে কর্মরত থাকাকালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হিসেবে তাঁকে আটক করা হয়। তিনি ছিলেন ২৭ নম্বর আসামি। ১৯৬৯ সালে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে মুক্তি পান। কিন্তু তাঁকে চাকরিচ্যুত করা হয়। এরপর জীবনের প্রয়োজনে তিনি ও আগরতলা মামলার অপর আসামি এ এন এম নূরুজ্জামান একত্রে ব্যবসা শুরু করেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে তাঁরা দুজনই ঝাঁপিয়ে পড়েন। খন্দকার নাজমুল হুদা ৮ নম্বর সেক্টরের বয়রা সাবসেক্টরের অধিনায়ক ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধকালেই তাঁকে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। স্বাধীনতার পর নিয়মিত মুক্তিবাহিনী বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে রূপান্তরিত হয়। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর পাল্টা অভ্যুত্থানের ঘটনায় নিহত। তখন কর্নেল ছিলেন।

১০. হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল: পরে ঢাকা শেরাটন হোটেল, বর্তমানে হোটেল রূপসী বাংলা।

১১. এয়ার মার্শাল নূর খান: পাকিস্তান বিমানবাহিনীর সাবেক প্রধান। পরে পিআইএর প্রধান এবং ভুট্টোর শাসনামলে তাঁর উপদেষ্টা।

১২. লেফটেন্যান্ট কর্নেল হারুন আহমেদ চৌধুরী বীর উত্তম: ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন এবং প্রেষণে ইপিআর বাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন তাতে। প্রতিরোধযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কালুরঘাট যুদ্ধে তিনি আহত হন। পরে মেজর জেনারেল ও রাষ্ট্রদূত।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাকশাল গঠন

১৯৭৫ সালের প্রথম দিকে বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠনের পর বিচক্ষণ রাজনৈতিক বিশ্লেষক, এমনকি নিরপেক্ষ সাধারণ মানুষও ধারণা করতে থাকেন যে, দেশে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা এবং দেশের কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবীরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাকে সাড়া দিয়ে দলে দলে বাকশালে যোগ দিতে থাকেন। দেশে তখন ঘন ঘন বৃষ্টি হচ্ছিল। ছাত্র-শ্রমিক-জনতা বিশাল বিশাল মিছিল নিয়ে বৃষ্টি মাথায় করে প্রতিদিন বাকশালে যোগ দিচ্ছিলেন। উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তারাও বাকশালে যোগ দিতে শুরু করেন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী, বাংলাদেশ পুলিশ, বাংলাদেশ রাইফেলস ও জাতীয় রক্ষীবাহিনীর প্রধানদেরও বাকশালের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য করা হয়।

তার পরও কোথায় যেন একটা শূন্যতা বা অনিশ্চয়তা লক্ষ করা যায়। আমি নিজে একজন ব্যস্ত সরকারি কর্মকর্তা হয়েও দেশের তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে বোঝার চেষ্টা করি। কিন্তু একটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে যাই। সরোয়ার ও আমি বাকশালের ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয়ে ছিলাম। সে জন্য আমরা প্রাথমিক সদস্য হওয়া থেকে বিরত থাকি। আমার স্পষ্ট মনে আছে, ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী পাস করার সময় সরোয়ার ও আমি জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রীর অতিথিদের আসনে বসেছিলাম। কণ্ঠভোটে সংশোধনীটি পাস করার সময় সরোয়ার বলে উঠল, 'বঙ্গবন্ধু আজ গণতন্ত্রের গলা টিপে ধরলেন।' কারণ গণতান্ত্রিক উপায়ে অর্থাৎ বহুদলীয় নির্বাচনের মাধ্যমে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরকার পরিবর্তনের সব পথ বন্ধ হয়ে গেল। যত দূর মনে পড়ে, এ সময় কথাসাহিত্যিক আবুল ফজল *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকায় এক নিবন্ধ লিখে নতুন শাসনব্যবস্থার সমালোচনা করেছিলেন। তিনি বঙ্গবন্ধুকে গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে ও বাংলাদেশ সৃষ্টির পেছনে তাঁর অসাধারণ অবদানকে স্মরণ করে তাঁকে অবসরে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের দলীয় সভায় এবং জাতীয় সংসদে সরকারি দলের সাংসদ এম এ জি ওসমানী, মইনুল হোসেন[১] ও নূরে আলম সিদ্দিকী বাকশাল গঠনের প্রতিবাদ করেছিলেন। আমি তখন শুনেছি, আওয়ামী লীগের আরও কয়েকজন নেতা ও সাংসদ দলের বৃহত্তর ঐক্যের স্বার্থে দলীয় সভা বা সংসদে সরাসরি বাকশাল গঠনের বিরুদ্ধে কথা না বলে ব্যক্তিগতভাবে নাকি বঙ্গবন্ধুকে বাকশাল গঠন না করার জন্য বলেছিলেন।

১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ থেকে কিউবায় সামান্য পাট রপ্তানির অজুহাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পিএল ৪৮০-এর আওতায় বাংলাদেশে খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। ফলে দেশে খাদ্যঘাটতি দেখা দেয় এবং দুর্ভিক্ষাবস্থার সৃষ্টি হয়। এ কারণে দেশে সরকারবিরোধীদের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ বৃদ্ধি পায় এবং রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড দমনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর তৎপরতায় অনেকাংশে হ্রাস পায়। বাকশাল গঠনের পর দেখা গেল বিভিন্ন জেলা ও মহকুমা পর্যায়ে বাকশাল নেতারা সন্ত্রাসীদের হাতে আক্রান্ত হচ্ছেন। কয়েকজন তাঁদের হাতে নিহত হন। চীনপন্থী গোপন দলগুলো ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের গণবাহিনীর সন্ত্রাসী তৎপরতা বৃদ্ধি পায়, যদিও চীন দেশেও একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। একদলীয় শাসনব্যবস্থায় বিশ্বাসী চীনপন্থী কিছু রাজনৈতিক দল ও সাংবাদিক হঠাৎ বহুদলীয় শাসনব্যবস্থার গুণগান করতে শুরু করেন।

১৯৭৫ সালের শুরুর দিকে জাতীয় রক্ষীবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটের সঙ্গে যোগাযোগব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য সিগন্যাল ইকুইপমেন্ট সংগ্রহের সিদ্ধান্ত হয়। ইকুইপমেন্ট কেনার দায়িত্ব দেওয়া হয় সেনাবাহিনী থেকে প্রেষণে আসা লেফটেন্যান্ট কর্নেল সাবিহ উদ্দিন আহমেদকে। সিগন্যাল ইকুইপমেন্ট সরেজমিনে দেখার জন্য এপ্রিল-মে মাসের দিকে তিনি যুক্তরাজ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে যান। দুই দেশের উৎপাদিত সিগন্যালসামগ্রী দেখার পর তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সিগন্যাল ইকুইপমেন্ট কেনার জন্য পরিচালকের কাছে সুপারিশ করেন। এরপর ঠিক হয়, আমাদের পরিচালক যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে সাবিহ উদ্দিন আহমেদের সুপারিশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করা সিগন্যালসামগ্রী দেখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। এ এন এম নূরুজ্জামান সিগন্যালসামগ্রীর ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আগস্ট মাসের মাঝামাঝি যুক্তরাষ্ট্র সফরের পরিকল্পনা করেন। ওই সময় রক্ষীবাহিনী লিডারদের ষষ্ঠ ব্যাচের প্রশিক্ষণও শেষ হয়। সম্ভবত ১১ আগস্ট তাঁদের র‍্যাংক পরানো এবং রক্ষী ব্যান্ডের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। এ উপলক্ষে সেদিন সাভারে রক্ষীবাহিনীর প্রশিক্ষণকেন্দ্রের রক্ষী অফিসার্স মেসে এক অনুষ্ঠান ও নৈশভোজের আয়োজন করা হয়েছিল।

এ সময় সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় করার সিদ্ধান্ত নেয়। ঠিক হয়, বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েই এটা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করবেন। ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার অপরাধে শেখ মুজিবুর রহমানসহ কয়েকজন ছাত্রনেতাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। বহিষ্কৃত অন্য ছাত্রনেতাদের সবাই মুচলেকা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যান। কিন্তু নিজের আদর্শ ও উদ্দেশ্যে অটল ও আপসহীন ছাত্রনেতা শেখ মুজিব মুচলেকা না দিয়ে তাঁর শিক্ষাজীবনের অবসান ঘটান। তারপর তিনি আর কোনো দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে প্রবেশ করেননি। ২৭ বছর পর তিনি হয়ে গেলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য, বাঙালি জাতির জনক ও স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. আবদুল মতিন চৌধুরী, শিক্ষকমণ্ডলী ও ছাত্রসমাজ সিদ্ধান্ত নিলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাগত জানাবেন এবং সংবর্ধনা দেবেন। এই উপলক্ষে দিন ঠিক করা হয় ১৫ আগস্ট। আয়োজনের জন্য নেওয়া হয় অভূতপূর্ব প্রস্তুতি। তবে সমস্যা দেখা দিল অনুষ্ঠান চলাকালে তাঁর নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়ে। অনেকে মনে করেছিলেন, গণবাহিনী অথবা চরম বামপন্থী সন্ত্রাসীরা অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ ভণ্ডুল করে দিতে পারে। সে জন্য সকল নিরাপত্তা বাহিনীকে নিয়োজিত করা হয়। ১৫ আগস্টের কয়েক দিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরাপত্তা রক্ষা বিষয়ে সব আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সিদ্ধান্ত হয়, পুলিশ বাহিনী বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় দুই-তিন দিন আগে অবস্থান নেবে। বাংলাদেশ রাইফেলস ও রক্ষীবাহিনী আগের দিন অর্থাৎ ১৪ আগস্ট রাত থেকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার চারদিকে ঘন ঘন টহল দেবে, যাতে কোনো সন্ত্রাসী দল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রবেশ করতে না পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারদিকে টহল দেওয়ার মতো রক্ষীবাহিনীর পর্যাপ্ত সদস্য ঢাকায় ছিল না। সাভার রক্ষী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অ্যাডজুট্যান্ট ছিলেন লিডার তায়েব উদ্দিন খান। তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হলে লিডার এ কে এম নুরুল হোসেন, মঈন উদ্দিন চৌধুরী, দীপককুমার হালদার, সিরাজুল হক দেওয়ান ও সাহেব আলী মিয়ার নেতৃত্বে কয়েকটি টহলদল গঠন করে ঢাকায় আনা হয়। এ সময় আমাদের সবার দৃষ্টি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে, যাতে ওই দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অপ্রীতিকর কোনো ঘটনা না ঘটে। সমগ্র জাতিও সেদিকে তাকিয়ে, কারণ সিদ্ধান্ত ছিল বঙ্গবন্ধু ঐতিহ্যবাহী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ঘোষণা করবেন।

এ সময় কিছুদিন আগের একটি অবাঞ্ছিত ঘটনার কারণে ঢাকা সেনানিবাসে সেনাবাহিনীর কিছু কর্মকর্তার মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। ঢাকা লেডিস ক্লাবে এক বিয়ের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ রেডক্রসের সভাপতি গাজী গোলাম মোস্তফার ছেলে ও তার বন্ধুরা মেজর শরীফুল হক ডালিমের[২] স্ত্রীকে আপত্তিকর পোশাক পরার কারণে নাজেহাল করেছিল। সে জন্য ডালিম ও মেজর এইচ এম বি নূর চৌধুরী[৩] কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়েই তাঁদের ইউনিটের কিছু সেনাসহ গাজী গোলাম মোস্তফার ছেলের ওপর হামলা করেন। অনুমতি ছাড়া ব্যক্তিগত ক্রোধ মেটানোর জন্য সেনাদের সেনানিবাসের বাইরে নিয়ে যাওয়া দণ্ডযোগ্য অপরাধ। সে জন্য তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। এদিকে ডালিমের শাশুড়ি শরিফুন্নাহার চৌধুরী ছিলেন আওয়ামী লীগের একজন সক্রিয় কর্মী। তাঁর মাধ্যমে ডালিম বঙ্গবন্ধুর কাছে গিয়েছিল নালিশ করতে। বঙ্গবন্ধু নাকি সুবিচার করবেন বলে আশ্বাস দেন।

এদিকে ওই আগস্ট মাসেই সরকারি উদ্যোগে নবনিযুক্ত জেলা গভর্নরদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়। এই উপলক্ষে প্রায় সব জেলার গভর্নর ও নেতারা ঢাকায় অবস্থান করছিলেন।

১১ আগস্ট বঙ্গবন্ধু বঙ্গভবনে নবনিযুক্ত জেলা গভর্নরদের প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন করেন। বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিকে জেলা গভর্নর করা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলেন যোগ্য ও শিক্ষিত; অল্প কয়েকজন ছিলেন যাঁরা ততটা যোগ্য ছিলেন না। তবে পদটি নতুন, দায়িত্বও ছিল নতুন ধরনের। তাঁদের উপযুক্ত করে তোলার জন্য এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রক্ষীবাহিনীর উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ) হিসেবে ১৪ আগস্ট বিকেলবেলা আমাকেও জেলা গভর্নরদের ক্লাস নিতে হয়। উদ্দেশ্য, কীভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিচালক এ এন এম নূরুজ্জামান রক্ষীবাহিনীর লিডারদের র‍্যাংক পরিয়ে দিচ্ছেন। ডানে লেখক

এবং কোন পরিস্থিতিতে তাঁরা রক্ষীবাহিনীর সহায়তা পেতে পারেন, সে-সংক্রান্ত আইনি বিধিবিধান ও পদ্ধতি বিষয়ে তাঁদের জ্ঞান দেওয়া। এ জন্য আমাকে কিছুটা প্রস্তুতি নিতে হয়।

রক্ষীবাহিনীর পরিচালক এ এন এম নূরুজ্জামান যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন ১২ আগস্ট। ১৩ আগস্ট তিনি লন্ডন পৌঁছান। এ সময় রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিরাপত্তা সমন্বয়ক অর্থাৎ সামরিক সচিব কর্নেল জামিল উদ্দিন আহমেদ[৪] ডাইরেক্টরেট জেনারেল ফোর্সেস ইনটেলিজেন্সের (ডিজিএফআই) মহাপরিচালক হিসেবে বদলি হন। তিনি ওই দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার প্রস্তুতিতে ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর নতুন সামরিক সচিব হিসেবে ব্রিগেডিয়ার মসহুরুল হক[৫] সবেমাত্র দায়িত্ব বুঝে নিয়েছেন। তবে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিরাপত্তা বিষয়ে সঙ্গে সঙ্গে মনোযোগ দিতে পেরেছিলেন কি না, তা আমরা জানি না। পরে এ বিষয়ে আমার পক্ষে আর জানা সম্ভব হয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তথ্যনির্দেশ

১. ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন: আইনজীবী। দৈনিক *ইত্তেফাক*-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র।

২. শরীফুল হক ডালিম বীর উত্তম: পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন এবং তখন পাকিস্তানে কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পাকিস্তান থেকে ভারতে এসে যুদ্ধে যোগ দেন। তাঁকে ৪ নম্বর সেক্টরের কুকিতল সাবসেক্টরের অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়। মুক্তিযুদ্ধে কৃতিত্বের জন্য বাংলাদেশ সরকার স্বাধীনতার পর তাঁকে বীর উত্তম খেতাব প্রদান করে। ১৯৭৫ সালে সপরিবারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার দায়ে বিচারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত। বর্তমানে পলাতক।

৩. এইচ এম বি নূর চৌধুরী: পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট এবং তখন পাকিস্তানে কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পাকিস্তান থেকে ভারতে এসে যুদ্ধে যোগ দেন। কিছুদিন মুক্তিবাহিনীর প্রধান এম এ জি ওসমানীর এডিসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অক্টোবরের মাঝামাঝি তাঁকে জেড ফোর্সের প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের চার্লি কোম্পানিতে নিয়োগ দেওয়া হয়। অক্টোবরের শেষে ধলই বিওপির যুদ্ধে আহত। এরপর আর যুদ্ধে অংশ নিতে পারেননি। মুক্তিযুদ্ধে কৃতিত্বের জন্য বাংলাদেশ সরকার স্বাধীনতার পর তাঁকে বীর বিক্রম খেতাব প্রদান করে। ১৯৭৫ সালে সপরিবারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার দায়ে বিচারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত। বর্তমানে পলাতক।

৪. কর্নেল জামিল উদ্দিন আহমেদ: ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সামরিক সচিব। ১৫ আগস্ট সকালে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর অভ্যুত্থানকারীদের হাতে নিহত।

৫. মসহুরুল হক: পাকিস্তান-প্রত্যাগত সেনাকর্মকর্তা। ১৯৭৫ সালে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল। পরে রাষ্ট্রদূত। পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর আবদুল মোনায়েম খানের সামরিক সচিব ছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কলঙ্কজনক অধ্যায়

১৯৭৫ সালের ১৪ আগস্ট বিকেলবেলা আমি বঙ্গভবনে জেলা গভর্নরদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির শেষ ক্লাসটি নিই। ক্লাস শেষে জেলা গভর্নররা আমার সঙ্গে কথা বলেন। তাঁদের প্রায় সবাই একযোগে প্রতি জেলায় রক্ষীবাহিনীর একটি করে ইউনিট নিয়োগ করার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। আমি তাঁদের বলি, রক্ষীবাহিনীর এত সদস্য আমাদের নেই। যা আছে ইতিমধ্যেই তাদের প্রয়োজনীয় স্থানে নিয়োগ করা হয়েছে। এর পরও তাঁরা আমাকে এ ব্যাপারে অনুরোধ করতে থাকেন। কারণ, বেশির ভাগ জেলায় তখন সন্ত্রাসী তৎপরতা আবার বেড়ে গিয়েছিল। বাকশালের সদস্যরা আক্রান্ত হচ্ছিলেন। এতে তাঁদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল। তখনই সর্বত্র রক্ষীবাহিনী নিয়োগ করা সম্ভব নয়—এ কথা তাঁদের বোঝাতে আমার যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। তারপর সন্ধ্যাবেলা আমি অফিসে চলে আসি। ইতিমধ্যে সাভার রক্ষী প্রশিক্ষণকেন্দ্র থেকে লিডার এ কে এম নুরুল হোসেন, মঈন উদ্দিন চৌধুরী, দীপককুমার হালদার, সিরাজুল হক দেওয়ান ও সাহেব আলী মিয়া তাঁদের অধীন রক্ষী সদস্যদের নিয়ে ঢাকায় আসেন। তাঁদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারদিকে টহল দেওয়ার জন্য পাঠানো হয়। উদ্দেশ্য ছিল একটাই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সফরকালে যাতে কোনো ধরনের অঘটন না ঘটে, সব অনুষ্ঠান যাতে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সম্পন্ন হয়।

রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত আমি অফিসে ছিলাম। এরপর আমি অফিস থেকে বেরিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যাই। সেখানে টহলরত রক্ষী সদস্যদের সঙ্গে কথা বলি। কোথাও কোনো গন্ডগোলের আভাস না পেয়ে আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কর্মরত আমার স্ত্রী ডা. সাঈদা খানকে সঙ্গে নিয়ে আসাদ গেট এলাকায় বাসায় ফিরি। তারপর রাতের খাবার খেয়ে দ্রুত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘুমাতে যাই। কারণ অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য পরদিন সকালে আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার কর্মসূচি ছিল।

সকাল সাড়ে পাঁচটা বা পৌনে ছয়টা হবে। আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ টেলিফোনের শব্দে আমার ঘুম ভেঙে যায়। আমি দ্রুত টেলিফোন ধরি। টেলিফোনে বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠ শুনে আমি তো হতভম্ব। বঙ্গবন্ধু বললেন, 'শহীদ, মনির (শেখ মনি) বাসায় কালো পোশাক পরা কারা যেন অ্যাটাক করেছে। দেখ তো, কী করা যায়?' আমি সঙ্গে সঙ্গে বলি, 'স্যার, আমি ব্যবস্থা নিচ্ছি।' বঙ্গবন্ধু লাইন কেটে দেওয়ামাত্র আমি আমাদের ডিউটি রুমে ফোন করি। ডিউটি রুমে কর্তব্যরত রক্ষী কর্মকর্তার মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আমাদের যাঁরা প্যাট্রোল ডিউটিতে ছিলেন তাঁদের তাড়াতাড়ি ধানমন্ডি এলাকায় শেখ মনির বাসায় যেতে বলি। আমার সরকারি গাড়ি থাকত আমাদের যানবাহন শাখায়। আমাদের যানবাহন শাখা ছিল সংসদ সদস্যদের বাসস্থান এলাকায়। সেখানে ফোন করে কাউকে না পেয়ে আমি ডিউটি রুমে বলি তাড়াতাড়ি আমার জন্য একটা গাড়ি পাঠাতে। এর মধ্যে আমি অফিসে যাওয়ার জন্য কোনো রকমে তৈরি হয়ে নিই। কারণ, বাসা থেকে সরাসরি যোগাযোগ করার কোনো সুবিধা ছিল না।

এ সময় আবার আমার বাসার টেলিফোন বেজে ওঠে। আমি দ্রুত টেলিফোন ধরি। এবার বঙ্গবন্ধুর বিশেষ সহকারী তোফায়েল আহমেদ আমাকে ফোন করে বলেন, রক্ষীবাহিনীর লোকেরা নাকি মনি ভাইয়ের বাড়িতে অ্যাটাক করেছে, তাড়াতাড়ি দেখো।' আমি তাঁকে বলি, 'রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা কেন মনি ভাইয়ের বাড়িতে অ্যাটাক করবে!' 'আমি দেখছি' বা 'ব্যবস্থা নিচ্ছি'—এ রকম কিছু বলেই ফোনটা রেখে আবার ডিউটি রুমে ফোন করি। ডিউটি রুমে কর্তব্যরত কর্মকর্তার কাছে আমি জানতে চাই প্যাট্রোল ডিউটিতে যাঁরা আছেন, তাঁদের শেখ মনির বাড়ি যেতে বলা হয়েছে কি না। উত্তরে তিনি জানান যে, মন্ত্রিপাড়ায়ও গোলাগুলি হচ্ছে। আমি বুঝতে পারি, ভয়ংকর কিছু ঘটতে যাচ্ছে বা ঘটেছে। তাই আর দেরি না করে উপপরিচালক (অপারেশন) সরোয়ার হোসেন মোল্লাকে ফোন করি। তাঁকে অফিসে আসতে বলে আমি বাসা থেকে বেরিয়ে পড়ি। ঠিক তখনই পর পর দুটি আর্টিলারি শেল আমার বাসার পাশে সেন্ট যোসেফ স্কুলের দেয়ালে পড়ে। দেয়ালটি ধসে যায়। সেখানে কয়েকজন হতাহত হন। আমার বাসার কাচের জানালায় ফাটল ধরে। ভাগ্যক্রমে আমার কোনো ক্ষতি হয়নি। আমার মনে হলো, হয়তো মিলিটারি ক্যু হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর্টিলারি গোলাগুলো হয়তো আমার বাড়ি লক্ষ্য করেই নিক্ষেপ করা হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্যচ্যুত হয়ে পাশে পড়েছে। তাই স্ত্রীকে বাসা ছেড়ে চলে যেতে বলে আমি প্রায় দৌড়ে যাই অফিসের দিকে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি অফিসে পৌঁছাই। আমাদের পরিচালকের কক্ষে গিয়ে টেলিফোনে ভারপ্রাপ্ত পরিচালক আবুল হাসান খানকে আমি তাড়াতাড়ি অফিসে আসতে বলি এবং সরোয়ারের বাসায় আবার ফোন করি। এবার তাঁকে পাইনি। পরে জেনেছিলাম, সরোয়ারও আমার মতো গাড়ি না পেয়ে দৌড়ে অফিসের দিকে রওনা হয়েছিল। রক্ষীবাহিনীর প্রধান কার্যালয়ে তখন মাত্র কয়েকজন কর্মকর্তা এবং এক কোম্পানি রক্ষী সদস্য ছিলেন। তাঁরা প্রধান কার্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব পালন করতেন। লিডারদের মধ্যে আলিমুজ্জামান জোয়ারদার এবং এ কে নুরুল বাহারকে দ্রুত তৈরি হওয়ার নির্দেশ দিই। আরও দুজন লিডার এন এ রফিকুল হোসেন এবং এম এম ইকবাল আলম প্রশিক্ষণের জন্য প্রধান কার্যালয়ে সংযুক্ত ছিলেন। তাঁরাও প্রস্তুত থাকলেন।

প্যাট্রোল ডিউটিতে থাকা লিডার সাহেব আলী মিয়া ধানমন্ডিতে শেখ ফজলুল হক মনির বাড়িতে গিয়ে আমাকে জানান যে, সেনা পোশাক পরিহিত একদল আক্রমণকারী শেখ ফজলুল হক মনির বাড়িতে আক্রমণ করে তাঁকে ও তাঁর স্ত্রী আরজু মনিকে হত্যা করে সেখান থেকে চলে গেছে। সাহেব আলী আরও জানান, তিনি শুনেছেন, বঙ্গবন্ধুর বাড়িতেও নাকি হামলা হয়েছে। আমি সাহেব আলীকে দ্রুত বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে যেতে বলি, যাতে ওই বাড়িতে কেউ প্রবেশ করতে না পারে।

রক্ষীবাহিনীর পরিচালক নূরুজ্জামান ১২ আগস্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রওনা হওয়ার আগে বড় ধরনের কোনো সমস্যা হলে সেনাবাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল কে এম সফিউল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছিলেন। আরও বলেছিলেন, জরুরি প্রয়োজনে সফিউল্লাহকে টেলিফোন করতে। তখন কথাটা আমার মনে পড়ে। আমি পরিচালকের লাল টেলিফোনে সেনাপ্রধান সফিউল্লাহকে ফোন করি এবং ঘটনা জানাই। তিনি আমাকে বলেন যে বঙ্গবন্ধু তাঁকেও ফোন করে ফোর্স পাঠাতে বলেছেন। কারণ, সেনা পোশাক পরিহিত কে বা কারা তাঁর বাড়িতে আক্রমণ করেছে। আমি তাঁর কাছে আমরা কী করব জানতে চাই এবং তাঁকে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে তাড়াতাড়ি ফোর্স পাঠাতে অনুরোধ করি। সফিউল্লাহ আমাকে বললেন, তিনি ৪৬ ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল শাফায়াত জামিলকে পাচ্ছেন না। তারপর তিনি ফোন রেখে দিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ সময় আমাদের উপপরিচালক (অপারেশন) সরোয়ার হোসেন মোল্লা অফিসে উপস্থিত হন। তাঁর মাধ্যমে জানতে পারি, ঢাকা বিমানবন্দরের দেয়াল ভেঙে কয়েকটি ট্যাংক রক্ষীবাহিনীর প্রধান কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিয়েছে। আমরা বুঝতে পারি, সেনাবাহিনীর একটা অংশ বিদ্রোহ করেছে এবং তারাই অভ্যুত্থান সংগঠিত করছে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে রক্ষীবাহিনীর সবাইকে প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দিই। সরোয়ার দেশের বিভিন্ন জায়গায় ফোন করে রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের তৈরি থাকতে বলেন। আমরা যখন এসব করছি তখন লিডার আলিমুজ্জামান জোয়ারদার দৌড়ে এসে জানান যে রেডিও থেকে ঘোষণা করা হচ্ছে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে। বুঝতে পারি, আমাদের সামনে মহাসংকট। দেরি না করে আমি সেনাপ্রধান সফিউল্লাহকে আবার ফোন করি। তিনি আমাকে বললেন, সেনাবাহিনীর উপপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, সিজিএস ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খালেদ মোশাররফ এবং ডিজিএফআই-প্রধান আবদুর রউফ তাঁর সঙ্গে আছেন। আরও বললেন, 'We are going to do something, তোমরা অপেক্ষা করো এবং তৈরি থাকো।' সরোয়ার ও আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমরা অ্যাকশনে যাব। সেনাবাহিনী-প্রধান যদি সঙ্গে থাকেন তাহলে ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপ নিয়ে আমরা বিদ্রোহীদের দমন করতে পারবে। বিমানবাহিনী কী ভাবছে জানার জন্য আমি এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকারকে[1] ফোন করি। তিনি জানান, তিনি সেনাপ্রধান সফিউল্লাহর কাছে যাচ্ছেন। আমরা ভাবলাম, তাঁরা একটা পদক্ষেপ নেবেন।

এর মধ্যে টহল ডিউটিতে থাকা লিডার সাহেব আলী বঙ্গবন্ধু ভবন থেকে আমাদের প্রধান কার্যালয়ে ফিরে আসেন। সাহেব আলী সেখানকার যে মর্মস্পর্শী ও রোমহর্ষক চিত্র তুলে ধরলেন, তা বিশ্বাস করা আমাদের জন্য কঠিন ছিল। আরেক টহলদারি দলের লিডার দীপককুমার হালদার প্রধান কার্যালয়ে এসে আমাদের জানালেন, মন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাড়িতেও আক্রমণ হয়েছে এবং সেখানে অনেকেই হতাহত। এ সময় আমি উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের কী অবস্থা জানতে তাঁকে ফোন করি। সৈয়দ নজরুল ইসলাম আমার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। ফোন ধরার পর তিনি কোনো কথা বললেন না। আমার মনে হলো, বঙ্গবন্ধু হত্যার খবর পেয়ে তিনি যেন নির্বাক হয়ে গেছেন। আমি সাহস করে তাঁকে বললাম, 'স্যার, রাষ্ট্রপতি নিহত, এখন উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে আপনার ওপরই সব দায়িত্ব। আপনি রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে নিয়ে সব বাহিনী-প্রধানকে ফোন করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদ্রোহী সেনাদের প্রতিহত করার আদেশ দিন।' উত্তরে তিনি জানান, তাঁর ওখানে কোনো স্টাফ নেই। আমি বললাম, 'আমি তাহলে আপনাকে রক্ষীবাহিনীর প্রধান কার্যালয়ে নিয়ে আসি।' তিনি বললেন, 'আসো।' এরপর আমি প্রধানমন্ত্রী এম মনসুর আলীকে ফোন করে একই কথা বললাম। তাঁর কণ্ঠে একটু দৃঢ়তা ছিল। খুনীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের মনোভাবও ছিল তাঁর মধ্যে। তিনি আমাকে তাঁর বাড়িতে যেতে বললেন।

আমি মনে মনে ভাবলাম, উপরাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীকে যখন পেয়েছি, দেরি না করে তাঁদের কাছে আমার যাওয়া প্রয়োজন। আমি একটি গাড়ি নিয়ে তাঁদের বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিলাম। বেরোনোর সময় দেখলাম রক্ষীবাহিনীর প্রধান কার্যালয়ের সামনে ট্যাংক। জীবনের ভয় না করে আমি ট্যাংকের সামনে দিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলাম। তখন সময় আনুমানিক সকাল সোয়া ছয়টা। ফার্মগেট হয়ে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পেলাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পতাকা উড়িয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের গাড়িতে দুটি পতাকা থাকে। একটি জাতীয় এবং অপরটি তিনি যে অঙ্গরাজ্যের নাগরিক সেই রাজ্যের পতাকা। এটা আমি জানতাম। ওই গাড়িতে দুটি পতাকাই ছিল। দুটি পতাকা দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ডেভিস ইউজিন বোস্টারের গাড়ি। ভেতরে কে ছিল দেখতে পাইনি। আমার মনে খটকা এবং সন্দেহ হলো যে এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে হয়তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাত আছে। কিছুদিন আগে চিলির প্রেসিডেন্ট সালভেদর আয়েন্দে সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হয়েছেন। এই হত্যাকাণ্ডে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংশ্লিষ্টতার কথা তখন বেশ আলোচিত বিষয় ছিল। আয়েন্দে নিহত হওয়ার পর বাংলাদেশে আমরা অনেকেই ধারণা করেছিলাম, এখানেও এ রকম একটা ঘটনা ঘটতে পারে। বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তা প্রসঙ্গে এর আগে এ কথা বলেছি। সেদিন রক্ষীবাহিনীর প্রধান কার্যালয়ের সামনে ট্যাংকবহর আর অত সকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের গাড়ি হোটেল থেকে বের হওয়ার ঘটনা আমাকে ধারণা দিল যে আমরা এক বিরাট ষড়যন্ত্রের শিকার। তখন অবশ্য এর বেশি আর কিছু ভাবার সময় ছিল না।

আমি ফাঁকা রাস্তায় দ্রুত গাড়ি চালিয়ে উপরাষ্ট্রপতির বাড়িতে গেলাম। বাড়ির গেটে পাহারারত পুলিশ জানাল যে, সৈয়দ নজরুল ইসলাম কিছুক্ষণ আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছেন তাঁর এক আত্মীয়ের সঙ্গে। এ পরিস্থিতিতে কী করব বুঝতে না পেরে আমি উপরাষ্ট্রপতির সরকারি বাড়ির উল্টো দিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাস্থ্যমন্ত্রী আবদুল মান্নানের বাড়িতে গেলাম। গিয়ে দেখি তিনি ড্রয়িংরুমে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার ঘটনায় তিনিও অনেকটা নির্বাক হয়ে গেছেন বলে আমার মনে হলো। সময় নষ্ট না করে আমি ওই বাড়ি থেকে লাল টেলিফোনে প্রধানমন্ত্রী এম মনসুর আলীর সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করি। কিন্তু তাঁকে পাইনি। তবে একজন ফোন ধরেছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর আমি চিনতে পারিনি। তিনি জানালেন, এম মনসুর আলী তাঁর একান্ত সচিবের সঙ্গে বাইরে চলে গেছেন। সরকারকে সংগঠিত করে হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার আশা নিয়ে আমি উপরাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাঁদের কথামতো গিয়েছিলাম। কিন্তু তাঁদের না পেয়ে আমি অনেকটা আশাহত ও হতোদ্যম হয়ে পড়ি।

এদিকে আমি যখন মন্ত্রী আবদুল মান্নানের বাসায় তখন জাতীয় সংসদের হুইপ রাফিয়া আখতার ডলি সেখানে আসেন। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে, এই সংবাদ পেয়েই তিনি ওই বাসায় এসেছিলেন। এসেই তিনি কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়েন। আমার কাছে বারবার জানতে চাইলেন, কীভাবে ঘটনাটা ঘটল, কে ঘটাল, বেগম মুজিব ও বাচ্চাদের কী অবস্থা ইত্যাদি। আবদুল মান্নান ও রাফিয়া আখতার তাঁরা দুজনই বঙ্গবন্ধুর খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁদের সব কথার জবাব আমার কাছে তখন ছিল না এবং আমার হাতে কোনো সময়ও ছিল না। ভগ্নহৃদয়ে আমি অতি দ্রুত আমার অফিসে ফিরে আসি।

ইতিমধ্যে আমাদের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক আবুল হাসান খান অফিসে এসে গেছেন। সরোয়ার আর আমি তাঁর সঙ্গে কথা বললাম। অর্থাৎ এখন আমাদের কী করণীয়। কারণ, সরকার ভেঙে পড়েছে, সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নেতারা আত্মগোপনে গেছেন এবং সেনাবাহিনী-প্রধান কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছেন না বা নিতে পারছেন না। আমরা এসব বিষয়ে কয়েক মিনিট আলোচনা করলাম। শেষে সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমরা (সরোয়ার ও আমি) প্রতিরোধব্যবস্থা নিতে সাভার চলে যাব। যদি প্রয়োজন হয়, যমুনা নদী পার হয়ে রংপুরের দিকে যাব। কারণ, রংপুরের ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল খন্দকার নাজমুল হুদা প্রতিরোধ গড়তে আমাদের সহায়তা করবেন—এই বিশ্বাস আমাদের ছিল। ইতিমধ্যে সরোয়ার টেলিফোনে তাঁর সঙ্গে কথা বলে পুরোপুরি না হলেও কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছিল। খন্দকার নাজমুল হুদা আমাদের পরিচালক এ এন এম নূরুজ্জামানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। নাজমুল হুদাও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি ছিলেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢাকায় প্রতিরোধ গড়ার মতো কোনো শক্তি রক্ষীবাহিনীর ছিল না। কারণ, তখনো রক্ষী সদস্যদের ঢাকায় রাখার কোনো ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। মিরপুরে জমি অধিগ্রহণ করে রক্ষীবাহিনীর স্থায়ী প্রধান কার্যালয় স্থাপন ও রক্ষী সদস্যদের থাকার ব্যবস্থা করার কাজ চলছিল। রক্ষীবাহিনীর যা অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ ছিল, নিজেদের কাছে রাখার কোনো সুবিধা না থাকায় সেসব অস্থায়ীভাবে রাখা হয়েছিল পিলখানায় বিডিআর অস্ত্রাগারে।

সাভারে রক্ষীবাহিনীর প্রশিক্ষণকেন্দ্রে দুটি রিক্রুট বা প্রশিক্ষণ ব্যাটালিয়ন ছিল। প্রশিক্ষণরত অবস্থায় ছিল বলে এসব সদস্য কোনো দায়িত্ব পালনের উপযোগী ছিলেন না। শুধু ৪ নম্বর ব্যাটালিয়ন ছিল নিয়মিত। এই ব্যাটালিয়নের বেশির ভাগ কোম্পানি বিভিন্ন জেলা, মহকুমা ও থানা পর্যায়ে মোতায়েন ছিল। ১৩ নম্বর প্রশিক্ষণ ব্যাটালিয়নের কয়েকটি কোম্পানি ছিল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তারা ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় দায়িত্ব পালন করত। রক্ষীবাহিনীর অন্য নিয়মিত ব্যাটালিয়নগুলো সারা দেশে মোতায়েন ছিল বিভিন্ন দায়িত্বে। ১৪ নম্বর ব্যাটালিয়ন ছিল সাভারে। কিন্তু মাত্র কয়দিন আগে লিডার আনোয়ারুল ইসলামের নেতৃত্বে তাদের খুলনায় পাঠানো হয়েছিল।

ঢাকায় রক্ষীবাহিনীর কোনো ব্যাটালিয়ন ছিল না। সাভার থেকে ১৩ নম্বর ব্যাটালিয়নের একটি কোম্পানি এনে ঢাকায় রাখা হয়েছিল। এ কোম্পানি প্রধান কার্যালয়ের নিরাপত্তাসহ অন্যান্য দায়িত্ব পালন করত। ওই ব্যাটালিয়নের চারটি টহলদল নিরাপত্তা রক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। সাভার প্রশিক্ষণকেন্দ্রের অ্যাডজুট্যান্ট লিডার তায়েব উদ্দিন খান ও ডিউটি অফিসার লিডার এ টি এম হালিমকে আমি জানাই যে আমরা দুজন সাভারে আসছি। তাঁরাও যেন তৈরি হতে থাকেন।

সরোয়ার আর আমি বুঝতে পারি, ঢাকা থেকে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হবে না। আমরা ক্রমেই আটকা পড়ে যাচ্ছি এবং আমাদের পর্যাপ্ত ট্রুপস ও অস্ত্র-গোলাবারুদ নেই। তাই কিছুক্ষণ পর সিদ্ধান্তমতো আমরা দুজন একটা জিপ নিয়ে সাভারের দিকে রওনা হই। কিছুদূর যাওয়ার পর আমাদের মনে হলো, প্রধান কার্যালয় অরক্ষিত রেখে এবং কয়েকজন কর্মকর্তা ও কিছু রক্ষীকে বিপদের মধ্যে ফেলে কাপুরুষের মতো আমরা কোথায় যাচ্ছি? আমরা দুজনই আবার ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলাম। এ সিদ্ধান্ত নিলাম এই ভেবে যে মরি আর বাঁচি আমরা ঢাকাতেই থাকব এবং একটা ব্যবস্থা করবই। কিন্তু নিরস্ত্র অবস্থায় তা তো করা যাবে না। প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন অস্ত্রশস্ত্র। আগেই বলেছি, সেগুলো ছিল পিলখানায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রধান কার্যালয়ে ফিরেই আমরা সিনিয়র ডেপুটি লিডার হাফিজ উদ্দিনকে রক্ষীবাহিনীর কয়েকজন সদস্যসহ একটা ট্রাক দিয়ে পিলখানায় পাঠাই অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ নিয়ে আসতে। এর আগে আমাদের অনুরোধে রক্ষীবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত পরিচালক আবুল হাসান খান বিডিআরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল খলিলুর রহমানকে ফোন করে জানান, পিলখানায় মজুত রাখা রক্ষীবাহিনীর অস্ত্র-গোলাবারুদ নেওয়ার জন্য হাফিজ উদ্দিনকে পাঠানো হচ্ছে। অস্ত্র ও গোলাবারুদ হাফিজ উদ্দিনের কাছে দেওয়ার জন্য খলিলুর রহমানকে তিনি অনুরোধ করেন। কিন্তু খলিলুর রহমান অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া দূরের কথা, তাঁর নির্দেশে হাফিজ উদ্দিনকে পিলখানায় ঢুকতেই দেওয়া হয়নি। গেট থেকেই তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। রক্ষীবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র সেখানে পড়ে থাকে। আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি, বিডিআর মহাপরিচালক খলিলুর রহমান আমাদের সহায়তা করবেন না। ফলে, আমাদের এ প্রচেষ্টাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ক্রমে আমাদের জন্য পরিস্থিতি ধোঁয়াটে হয়ে আসে। আমাদের সাংগঠনিক শক্তি তেমন ছিল না। কোনো দিকেই আমরা আশার আলো দেখতে পাচ্ছিলাম না।

এদিকে আমি বাসা থেকে বের হওয়ার কিছুক্ষণ পর বঙ্গবন্ধুর এক খুনি মেজর ফারুক[২] একদল সেনা নিয়ে আমার বাসায় যান। তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যান টাঙ্গাইলে আমাদের প্রতিবেশী ও ফারুকের অধীনস্থ সেনা কর্মকর্তা নুরুল হক। ফারুক হয়তো আমাকে হত্যা অথবা গ্রেপ্তার করতে আমার বাসায় গিয়েছিলেন। আমাকে বাসায় না পেয়ে আমার বাসা থেকে আওয়ামী লীগ নেতা নূরুল ইসলাম মঞ্জুরকে[৩] ফোন করে জানান, 'অপারেশন সাকসেসফুল।' আমার বাসায় যাওয়ার আগে ফারুক রক্ষীবাহিনীর পরিচালক ব্রিগেডিয়ার এ এন এম নূরুজ্জামানের বাসাতেও গিয়েছিলেন। আগেই বলেছি নূরুজ্জামান তখন বিদেশে ছিলেন। তাঁকে না পেয়ে তিনি হয়তো আমার বাসায় যান।

নূরুজ্জামান ও আমার বাসায় ফারুকের যাওয়ার বিষয়টি আমি সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারিনি, পরে জেনেছি। আরও জেনেছি, সরোয়ার আর আমি যখন সাভারের পথে বেরিয়েছিলাম, তখন ফারুক রক্ষীবাহিনীর প্রধান কার্যালয়ে আসেন। পরিচালকের কক্ষে ঢুকে ভারপ্রাপ্ত পরিচালক আবুল হাসান খানকে বঙ্গবন্ধুর ছবি নামিয়ে ফেলতে বলেন। আবুল হাসান খান তাঁকে বলেন, সরকারি আদেশ না এলে তিনি ছবি নামাতে পারবেন না। এ নিয়ে ফারুক আর কিছু না বলে চলে যান। তবে যাওয়ার আগে বলে যান, তাঁদের ট্যাংকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নলগুলো রক্ষীবাহিনী সদর দপ্তরের দিকে তাক করা আছে। কোনো মুভমেন্ট নেওয়া হলে সদর দপ্তর গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে। এ সময় পরিচালকের কক্ষের বাইরে উপস্থিত ছিলেন লিডার আলিমুজ্জামান জোয়ারদার। তিনি ফারুককে আগে থেকেই চিনতেন। ফারুককে দেখামাত্র আলিমুজ্জামান তাঁকে বলেন, 'আপনি যা করেছেন ঠিক করেন নাই।' ফারুক উত্তর দেন, 'তোকে আমি পরে বলব, কেন করেছি।'

পরিস্থিতি আস্তে আস্তে আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রাণহীন দেহ তাঁর বাড়িতে পড়ে আছে চরম অবহেলায়। আর আমরা কোনো কিছু করতে পারছি না। এটা যে আমাদের জন্য কতটা কষ্টকর ও বেদনাদায়ক ছিল, তা এখন বোঝানোর ভাষা আমার নেই। আমি শুধু ভাবছি, আমাকে যেভাবেই হোক একটা কিছু করতেই হবে। এ সময় মনে পড়ল তাজউদ্দীন আহমদের কথা। তাঁর কথা আমার আগে মনে পড়েনি। কারণ, তিনি সরকারি দায়িত্বে ছিলেন না। বলা যায়, তাঁকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছিল। মনে হলো, এই চরম সংকটময় মুহূর্তে তিনি হয়তো আমাদের কোনো বুদ্ধি দিতে পারবেন। আমি তাঁকে ফোন করি। ইতিমধ্যে তিনি ঘটনার কথা শুনেছেন। আমার মনে হলো, তিনিও ভীষণ ব্যথিত। আমরা কী করতে পারি বা আমাদের কী করা উচিত, এ বিষয়ে আমি তাঁর পরামর্শ চাইলাম। তিনি আমাকে দ্রুত উপরাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করে কথা বলতে বললেন। আমি তাঁকে জানালাম, ইতিমধ্যে আমি তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছি। আমি তাঁদের কাছে গিয়েছিলাম কিন্তু তাঁরা বাসা থেকে চলে গেছেন। এটা শুনে তিনি আমাকে বললেন সেনাপ্রধানের সঙ্গে কথা বলতে। তিনি আমাকে আরও বললেন, ঘাতকদের বিরুদ্ধে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিতে হলে সেনাপ্রধানকে প্রয়োজন।

আমি আবার সেনাপ্রধান কে এম সফিউল্লাহকে ফোন করলাম। কিন্তু পেলাম না। সরোয়ার ও আমি তাঁর খোঁজে সম্ভাব্য বিভিন্ন স্থানে বারবার ফোন করি, কিন্তু তাঁকে পাইনি। এর মধ্যে সরোয়ার ছুটিতে থাকা আমাদের উপপরিচালক (সিগন্যাল) সাবিহ উদ্দিন আহমেদকে তাড়াতাড়ি সদর দপ্তরে চলে আসতে বলেন।

সময় দ্রুত গড়িয়ে যাচ্ছিল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর জানা গেল, সেনাপ্রধান প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সদর দপ্তরে আছেন। আমরা সেখানে ফোন করি। বহু কষ্টে এবার আমরা কে এম সফিউল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম হই। তিনি সরোয়ার আর আমাকে ৪৬ ব্রিগেড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হেডকোয়ার্টার্সে যেতে বলেন। আরও জানালেন, তিনিও সেখানে যাচ্ছেন। আমরা কিছুটা আশ্বস্ত হলাম এই ভেবে যে, হয়তো কোনো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। আমি জানতে চাইলাম, আমরা সাদা পোশাকে কীভাবে সেনানিবাসে যাব, আমাদের তো ঢুকতে দেবে না। তখন তিনি বললেন, 'তোমরা অপেক্ষা করো, আমি একজন অফিসার পাঠাচ্ছি।' আমরা ধারণা করলাম, ৪৬ ব্রিগেড সদর দপ্তর থেকেই অ্যাকশন শুরু হয়ে যাবে।

কিছুক্ষণ পর ডিজিএফআইয়ের ঢাকা ডিটাচমেন্টের অফিসার-ইন-চার্জ মেজর জিয়াউদ্দিন আহমদ[৪] রক্ষীবাহিনীর প্রধান কার্যালয়ে আসেন। তিনি আমাদের বলেন যে, সেনাবাহিনীর চিফ অব দ্য জেনারেল স্টাফ (সিজিএস) খালেদ মোশাররফ আমাদের সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁকে পাঠিয়েছেন। তখন সকাল সাড়ে আটটার মতো হবে। আমরা প্রস্তুতই ছিলাম। জিয়াউদ্দিন আহমদের গাড়িতে চড়ে আমরা তখনই ৪৬ ব্রিগেড সদর দপ্তরে রওনা হলাম। রাস্তা ফাঁকা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা ৪৬ ব্রিগেড সদর দপ্তরে পৌঁছালাম।

ব্রিগেড কমান্ডারের কক্ষে ঢুকেই দেখি একটা টেবিল ঘিরে খালেদ মোশাররফ, শাফায়াত জামিলসহ দু-তিনজন ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তা বসে আছেন। ৩০-৩৫ জন সেনা কর্মকর্তা দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের চেহারা দেখে আমরা বুঝতে পারলাম না, তাঁরা অভ্যুত্থানের পক্ষে, না বিপক্ষে। তবে একটা রহস্যজনক নীরবতা লক্ষ করা গেল। ব্রিগেড কমান্ডারের নির্ধারিত চেয়ারে বসে ছিলেন খালেদ মোশাররফ। তাঁর পাশে একটি চেয়ারে বসে ছিলেন ৪৬ ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়াত জামিল। টেবিলের অপর পাশে চেয়ার খালি ছিল। তাঁরা সেখানে আমাদের বসতে বললেন। প্রথমেই খালেদ মোশাররফ যা বললেন তা শুনে তো আমাদের চোখ ছানাবড়া। তিনি ইংরেজিতে বললেন, 'Shaheed-Sarwar, I know you are patriots but we had do it because we do not want this country to be a Kingdom।' তারপর বাংলায় বললেন, মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করতে হবে, দেশকে বাঁচাতে হবে ইত্যাদি। আমরা শুধু জানতে চাইলাম, সেনাপ্রধান কোথায়? খালেদ মোশাররফ জানালেন, 'তিনি রেডিও স্টেশনে গেছেন।'

যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা ৪৬ ব্রিগেড সদর দপ্তরে গিয়েছিলাম, তা সফল হবে না ভেবে কথা আর বাড়ালাম না। কিছুক্ষণ পর সীমাহীন হতাশা নিয়ে আমরা রক্ষীবাহিনীর সদর দপ্তরে ফিরে আসি। জিয়াউদ্দিন আহমদই গাড়িতে করে আমাদের পৌঁছে দেন। ফেরার পথে ভাবতে থাকি, খালেদ মোশাররফ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের কী শোনালেন! একবার মনে হলো, হয়তো তাঁর সামনে ঘাতক দলের অনেকে উপস্থিত ছিল, যাদের আমরা চিনতে পারিনি। এ কারণে এবং উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য তিনি হয়তো ওই কথাগুলো বলেছিলেন। এমনও তো হতে পারে, তিনি যা বলেছেন তা তিনি সত্যিকার অর্থে বলেননি। তবে এটা ঠিক, দেশের ভয়ানক সন্ধিক্ষণে খালেদ মোশাররফের ওই বক্তব্য আমার কাছে বিভ্রান্তিকর মনে হয়েছিল।

রক্ষীবাহিনীর প্রধান কার্যালয়ে ফিরে সরোয়ার ও আমি চিন্তা করতে থাকলাম কী করা যায়। পরিস্থিতি দ্রুত পর্যালোচনা করে আমরা বুঝতে পারলাম, সরকার এবং সরকারের রাজনৈতিক ভিত্তি পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যদের সবাই তাঁদের প্রিয় নেতা রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হয়েছেন জেনে বিস্মিত, ব্যথিত ও হতবাক হয়ে পড়েছেন। তাঁদের বেশির ভাগই দেশের এই চরম মুহূর্তে নিজেদের রাষ্ট্রীয় দায়িত্বভার নিজেরাই ত্যাগ করে জীবন বাঁচানোর তাগিদে নিরাপদ স্থানে চলে গেছেন। অথচ তাঁদের, বিশেষত উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীদের দায়িত্ব ছিল বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে সরকার ও দলের হাল ধরে হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। যেমনটা ১৯৭১ সালে তাজউদ্দীন আহমদ সাহসিকতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে করেছিলেন। কিন্তু বাঙালি জাতির দুর্ভাগ্য যে শোকে মুহ্যমান জাতীয় নেতারা (রাষ্ট্রীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত) জাতির এই কঠিন সময়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন তোফায়েল আহমেদ। তিনি চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সফল হননি। আমাদের মনে হলো, এই দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে পরীক্ষিত রাষ্ট্রনায়ক তাজউদ্দীন আহমদ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকলে ১৯৭১ সালের মতো আবারও সরকারের হাল ধরে বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিরুদ্ধে অনতিবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতেন। আমরাও পেতাম দিকনির্দেশনা।

এদিকে সারা দেশের সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে আওয়ামী লীগের অগণিত নেতা ও কর্মী নিশ্চুপ হয়ে পড়লেন; প্রতিবাদে কেউ একটা টুঁ শব্দ পর্যন্ত করলেন না। প্রকাশ্যে কোথাও কোনো প্রতিবাদ হলো না। এমন তো হওয়ার কথা ছিল না। আমি ভাবতে থাকি, বাঙালি জাতি কি এতই অকৃতজ্ঞ যে তাদের মুক্তিদাতা জাতির পিতাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হলো অথচ একজন বাঙালিও প্রতিবাদে রাজপথে নেমে এল না! ১৯৭১ সালের বীর বাঙালি ১৯৭৫ সালে এসেই ভীরু জাতিতে পরিণত হলো। এ তো বিশ্বাস করার মতো নয়। কোথাও কোনো প্রতিবাদ হয়েছে কি না জানার জন্য বিভিন্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেলার রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পগুলোতে আমরা ফোন করতে থাকি। কিন্তু এমন কোনো খবর পাওয়া গেল না। অথচ জনগণের সমর্থন ছাড়া কোথাও কোনো প্রতিরোধ সফল হয়নি, সফল করা যায় না।

অল্প কিছুসংখ্যক ছাড়া সাধারণ জনগণ এ ঘটনায় হতবাক হয়ে পড়েছিল। বঙ্গবন্ধুর মতো একজন মানুষকে বাংলাদেশে কেউ হত্যা করতে পারে, এটা তারা কল্পনাও করেনি। ঘটনার আকস্মিকতায় তারা হতভম্ব ও ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তাদের সংগঠিত করে প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করার দায়িত্ব ছিল রাজনৈতিক নেতৃত্বের। কিন্তু তাঁরা তা করেননি।

তখন সেনানিবাসের ভেতরে কী অবস্থা, তা-ও স্পষ্ট বোঝা যায়নি। ৪৬ ব্রিগেড সদর দপ্তরে যেসব সেনা কর্মকর্তাকে দেখেছিলাম, তাঁরা আমাদের কোনো উদ্যোগে সাড়া দেবেন বলে মনে হয়নি। বরং ফলাফল উল্টো হতে পারে বলেই আমাদের মনে হয়েছে। আমরা প্রতিরোধের উদ্যোগ নিলেই সেনাবাহিনী ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। সেনাবাহিনী পক্ষে থাকলে সেনাপ্রধান নিজেই সেদিন ব্যবস্থা নিতে পারতেন।

বিশ্বের পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুক্তিযুদ্ধকাল থেকেই বাংলাদেশের বিরোধিতা করে এসেছে। আমি ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের সামনে দিয়ে উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সরকারি বাসায় যাওয়ার সময় দেখেছিলাম, মার্কিন রাষ্ট্রদূতের গাড়ি হোটেল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। রাষ্ট্রদূত সারা রাত হোটেলে কী করছিলেন, তা রহস্যাবৃত। প্রবীণ সাংবাদিক এবিএম মূসা সম্প্রতি আমাকে বলেছেন, তিনিও ধানমন্ডি এলাকায় ওই দিন সকালে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিস ইউজিন বোস্টারকে গাড়িতে দেখেছেন।

আমাদের প্রধান কার্যালয়ের সামনে ট্যাংক। আমাদের কিছু রক্ষী সদস্য আছেন সাভারে প্রশিক্ষণকেন্দ্রে। রক্ষীবাহিনীর বেশির ভাগ অস্ত্রশস্ত্র পিলখানায়। আমাদের নিজস্ব শক্তি ও প্রতিরোধক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত হয়ে পড়ল। এই পরিস্থিতিতে আমাদের সামনে করণীয় বিষয়গুলো নিম্নরূপ ছিল বলে আমাদের মনে হয়েছে :

১. বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা। এ বিষয়ে সবচেয়ে বড় ঝুঁকি ছিল এই যে, রক্ষীবাহিনীর যেকোনো পদক্ষেপই সেনাবাহিনীকে নাড়া দিত। সেনাবাহিনীর অস্তিত্বের প্রশ্নে মুক্তিযোদ্ধা, পাকিস্তান-প্রত্যাগত ও অমুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের ভেদাভেদ ভুলে একত্র হয়ে রক্ষীবাহিনীকে মোকাবিলা করত। কারণ, সেনাবাহিনীর ভেতরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রক্ষীবাহিনী সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা ছিল। তখন সেনাবাহিনীর সামনে দাঁড়ানোর ক্ষমতা রক্ষীবাহিনীর হতো না। সব মহল থেকে বলা হতো, রক্ষীবাহিনী ভারতের হয়ে কাজ করছে। জনগণও তা বিশ্বাস করত। যদি সেনাবাহিনীর একটা উল্লেখযোগ্য অংশ রক্ষীবাহিনীর পদক্ষেপকে সমর্থন করে সক্রিয় হতো, তাহলে দেশে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের সূচনা হওয়ার আশঙ্কা ছিল। এটা কারও জন্য মঙ্গলজনক হতো না।

২. সেনাপ্রধান কে এম সফিউল্লাহ যদি সেনাবাহিনীর ওপর তাঁর নেতৃত্ব ও কমান্ড অক্ষুণ্ন রেখে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারতেন, তাহলে সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়ে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা বা পদক্ষেপ নিতে পারতাম। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য,

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী খন্দকার মোশতাক আহমদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেনাবাহিনীর কমান্ডের ওপর সফিউল্লাহ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। কারণ, তাঁর সহকর্মী সেনাবাহিনীর উপপ্রধান জিয়াউর রহমান ও চিফ অব দ্য জেনারেল স্টাফ খালেদ মোশাররফকে তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তাঁদের তিনজনের মধ্যে গোপনে দ্বন্দ্ব ছিল। তিনি আমাদের বারবার বলেছিলেন, 'We are going to do something।' কিন্তু তিনি দৃশ্যমান ও কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেননি।

৩. আমরা আরেকটা কাজ করতে পারতাম, তা হলো, রক্ষীবাহিনীর সবাইকে নিয়ে যমুনা নদীর ওপারে গিয়ে প্রতিরোধ সৃষ্টি করা। নদীর ওপারে আমরা হয়তো বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর রংপুর ব্রিগেডের সহায়তা পেতাম। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ব্রিগেড কমান্ডার মীর শওকত আলীর নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর যশোর ব্রিগেড আমাদের বিরোধিতা করত। আমার এ অনুমানের কারণ হলো, ১৫ আগস্টের ঘটনার পর খুলনার রক্ষীবাহিনীর অ্যাডজুট্যান্ট লিডার মোজাফফর হোসেনকে সব রক্ষীসহ নিরস্ত্র করার একটা ফন্দি এঁটেছিলেন মীর শওকত আলী। কিন্তু রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের পূর্বপ্রস্তুতি থাকায় এবং শৃঙ্খলার কারণে তিনি তা করতে পারেননি।

ঢাকা সেনানিবাসের ৪৬ ব্রিগেড থেকে ফিরে রক্ষীবাহিনীর প্রধান কার্যালয়ে আমরা কয়েকজন যখন কথা বলছি, তখন খালেদ মোশাররফ আমাদের ফোন করেন। তিনি জানালেন যে রক্ষীবাহিনীর পক্ষ থেকে একজনকে রেডিও স্টেশনে যেতে হবে। আমরা বুদ্ধি করে খালেদ মোশাররফকে জানাই, এসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব পরিচালকের, কিন্তু তিনি দেশে নেই।

এ সময় খালেদ মোশাররফ আমাদের জানালেন, সেনাবাহিনী-প্রধান কে এম সফিউল্লাহ, বিমানবাহিনী-প্রধান এ কে খন্দকার, নৌবাহিনী-প্রধান এম এইচ খান, পুলিশ বাহিনী-প্রধান এ কে নুরুল ইসলাম ও বিডিআর-প্রধান খলিলুর রহমান রেডিও স্টেশনে নতুন সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে ঘোষণা দিয়েছেন। তাঁদের ঘোষণা রেডিওতে প্রচারিত হয়েছে। তাঁর কথা শুনে আমরা অবাক হয়ে যাই, এটা কীভাবে সম্ভব!

কিছুক্ষণ পর খালেদ মোশাররফ আবার আমাদের কার্যালয়ে ফোন করেন। এবার বলেন, পরিচালক এ এন এম নূরুজ্জামানের অনুপস্থিতিতে সরোয়ার ও আমি রেডিও স্টেশনে গেলেই হবে। আমাদের পাল্টা কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে তিনি টেলিফোন রেখে দিলেন। সরোয়ার ও আমি আলোচনা করে ঠিক করলাম, আমরা দুজন যাব না। পরিস্থিতিদৃষ্টে তখন আমাদের মনে হয়েছিল, সব বাহিনীপ্রধান যেহেতু নতুন সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেহেতু রক্ষীবাহিনীর আনুগত্য প্রকাশ না করে উপায় নেই। তাই আমরা ভারপ্রাপ্ত পরিচালক আবুল হাসান খানকে রেডিও স্টেশনে পাঠাই। তিনি রক্ষীবাহিনীর পক্ষ থেকে সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন।

কিন্তু সরোয়ার আর আমার ওপর চাপ আসতেই থাকে। আমাদের দুজনকে রেডিও স্টেশনে যাওয়ার জন্য কয়েকবার বলা হয়। প্রতিবারই আমরা বলি, সব বাহিনীপ্রধান আনুগত্য স্বীকার করেছেন। আমাদের বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত প্রধানও করেছেন। তাহলে আমাদের কেন আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে? সেনাবাহিনী-প্রধান আনুগত্য ঘোষণা করার পর উপপ্রধানকে তো তা করতে হয়নি। মনে হলো, আড়াল থেকে খন্দকার মোশতাক আমাদের ওপর চাপ দিচ্ছেন। কারণ, আমাদের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক খুব পরিচিত ছিলেন না। সবার ধারণা ছিল, পরিচালকের অবর্তমানে সরোয়ার আর আমি রক্ষীবাহিনী নিয়ন্ত্রণ করি।

চারদিক থেকে উপর্যুপরি সুপারিশের কারণে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তখন আমাদের দুজনকেও রেডিও স্টেশনে যেতে হয়। এ ছাড়া আমাদের উপায় ছিল না। যাওয়ার পর দেখি, খন্দকার মোশতাক, তাহের উদ্দিন ঠাকুর ও খুনিরা কয়েকজন তখনো রেডিও স্টেশনে বসে আছে। তাদের উপস্থিতিতে আমাদের ঘোষণা রেকর্ড করা হয়। অবশেষে ইতিহাসের এই কালো অধ্যায়ের সঙ্গে অন্যান্য বাহিনীপ্রধানের পাশাপাশি আমাদের দুজনের নাম যুক্ত হয়।

রেডিও স্টেশন থেকে অফিসে ফিরে এসে আমরা ঠিক করি আওয়ামী লীগ ও সরকারের মধ্যম পর্যায়ের, বিশেষত যুব নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার। এ চিন্তা থেকে আমরা প্রথমে আবদুর রাজ্জাককে ফোন করি। কিন্তু জানতে পারি তিনি বাড়ি থেকে বের হয়ে গেছেন। ফোন করি আরও কয়েকজনকে। শুধু তোফায়েল আহমেদকে বাড়িতে পাওয়া গেল। তিনি আমাদের আহ্বানে রক্ষীবাহিনীর প্রধান কার্যালয়ে আসতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তখন আমরা লিডার দীপককুমার হালদারকে কয়েকজন রক্ষী সদস্যসহ তাঁর বাড়িতে পাঠাই। তোফায়েল আহমেদ তাঁর সঙ্গে রক্ষীবাহিনীর প্রধান কার্যালয়ে আসেন।

জাতির জনক সপরিবার নিহত হয়েছেন জেনে তোফায়েল আহমেদ মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হলেও আমাদের প্রধান কার্যালয় থেকে সেনাবাহিনী-প্রধান, সরকারের অন্যান্য নেতাসহ অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। কিন্তু কারও কাছ থেকেই ইতিবাচক সাড়া পাননি। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর আমরা নিজেরাই অনেকের চেহারা পরিবর্তন হতে দেখেছি। দেখেছি, সরকারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেতরের অনেকেই উল্টো পথ ধরেছেন। বুঝতে পারছিলাম না দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে কাকে বিশ্বাস করব, কাকে করব না। প্রতিটি মুহূর্তে আমাদের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার এ এন এম নূরুজ্জামানের অভাব বোধ করছিলাম। কারণ, সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা হিসেবে তিনি সেনাবাহিনীর নেতৃস্থানীয় কর্মকর্তা এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জানতেন। ফলে তাঁর পক্ষে পরিস্থিতি অনুধাবন করে ব্যবস্থা গ্রহণ অনেক সুবিধাজনক হতো।

তোফায়েল আহমেদের সঙ্গে আমরা বঙ্গবন্ধু হত্যা-পরবর্তী নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম। ঠিক হলো, আমরা বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলব। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, সরোয়ার ও আমি সাভারে যাব। লিডার শেখ দলিল উদ্দিনকে সাভারে যাওয়ার পথ রেকি করতে পাঠানো হয়। শেখ দলিল মিরপুর সেতু পর্যন্ত গিয়ে দেখেন, সেখানে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। এটা দেখে তিনি ফিরে আসেন। তাঁর কাছ থেকে এ তথ্য পেয়ে বুঝতে পারলাম, সরাসরি আমাদের সাভারে যাওয়ার পথ বন্ধ। তখন কেন যেন আরও মনে হলো, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী বা সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে নজরদারিতে রেখে আমাদের, বিশেষত সরোয়ার ও আমার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে, যাতে আমরা কোথাও যেতে না পারি। এটা হয়তো খালি চোখে আমরা বুঝতে পারছি না। কারণ, আমাদের কোনো গোয়েন্দা ইউনিট নেই। এ অবস্থায় উপায় না দেখে আমরা সাভারে যাওয়ার পরিকল্পনাও ত্যাগ করি।

এর মধ্যে রক্ষীবাহিনীর সাভার প্রশিক্ষণকেন্দ্রে একটি ঘটনা ঘটে। আমরা জানতে পারি, সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট কর্নেল আমীন আহম্মেদ চৌধুরী একদল সেনা নিয়ে রক্ষীবাহিনীর সাভার প্রশিক্ষণকেন্দ্রে যান। তিনি রক্ষীবাহিনীর সাভার প্রশিক্ষণকেন্দ্রে অবস্থানরত একজন ভারতীয় প্রশিক্ষককে ঢাকায় আমাদের প্রধান কার্যালয়ে নিয়ে আসেন এবং রেখে চলে যান। ভারতীয় প্রশিক্ষকের নাম ছিল বালা রেড্ডি। তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেজর ছিলেন। সেখানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর আরও কয়েকজন সেনা কর্মকর্তা এবং এনসিও-জেসিও ছিলেন। তাঁরা অনেক আগেই দেশে ফিরে যান। ছিলেন শুধু বালা রেড্ডি।

সেদিন অর্থাৎ ১৫ আগস্ট আমীন আহম্মেদ চৌধুরী সাভার থেকে তাঁকে ঢাকায় আমাদের প্রধান কার্যালয়ে নিয়ে আসায় আমরা কিছুটা অবাক হই। আমরা ভেবেছি, তিনি হয়তো ঊর্ধ্বতন কারও নির্দেশে এটা করেছেন। কিন্তু পরে জানতে পারি, এ ব্যাপারে সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কেউ তাঁকে নির্দেশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেননি। আমীন আহম্মেদ চৌধুরী তখন জয়দেবপুরে কর্মরত ছিলেন। তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই কয়েকজন সেনাসহ তাঁর ইউনিট থেকে সেখানে যান এবং মেজর বালা রেডিডকে ঢাকায় রক্ষীবাহিনীর প্রধান কার্যালয়ে নিয়ে আসেন। এ ঘটনা বেশ রহস্যাবৃত। মেজর বালা রেডিডকে আমরা ভারতীয় হাইকমিশনে পাঠিয়ে দিই।

বেসামরিক প্রশাসনের পক্ষে সরকারিভাবে জাতীয় রক্ষীবাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব রুহুল কুদ্দুস ও প্রধানমন্ত্রীর সচিব আবদুর রহিম। সংকটময় ওই মুহূর্তে পরামর্শের জন্য তাঁদের আমরা পাইনি। তাঁরাও আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। সরোয়ার ও আমি নিজেদের বুদ্ধিতে যতটুকু কুলিয়েছে, দেশ ও জাতির জন্য যা ভালো মনে হয়েছে, তা-ই করার চেষ্টা করেছি।

আমরা জানতাম, জাতির জনক নিহত, তাঁকে আর ফেরত আনতে পারব না। কিন্তু বাঙালি জাতির জন্য তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান আমাদের 'বাংলাদেশ'। সেই বাংলাদেশের তো আমরা ক্ষতি করতে পারি না। আমাদের দায়িত্বই হলো বাংলাদেশকে রক্ষা করা। বঙ্গবন্ধু বাঙালি আর বাংলাদেশের জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন। তিনি জীবিত থাকলে বাংলাদেশের কল্যাণকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গুরুত্ব দিতেন। বাংলাদেশ রক্ষা পেলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চিরকাল বাঙালির জাতির পিতা হিসেবে থেকে যাবেন।

বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে সপরিবারে হত্যা করার দিনটি, অর্থাৎ ১৫ আগস্ট বাঙালি জাতির ইতিহাসে সর্বচেয়ে কলঙ্কজনক দিন হিসেবে চিরকাল চিহ্নিত হয়ে থাকবে। দিনটি কলঙ্কজনক শুধু এই জন্যই নয় যে জাতির জনককে হত্যা করা হয়েছে। বরং এ জন্যও যে বাঙালি জাতি এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড প্রতিহত করতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। আরও কলঙ্কজনক এই জন্য যে বাঙালি জাতির একাংশ পরবর্তী সময়ে সাংবিধানিকভাবে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের ইনডেমনিটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে রক্ষা করতে চেয়েছিল। যদিও অনেক বছর পর ইনডেমনিটি বাতিলের মাধ্যমে ঘাতকদের বিচারকাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে।

ছোটবেলায় পড়েছিলাম, 'Human psychology is as frail as a drop of dew on the back of a duck.' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চরম বেদনাদায়ক প্রয়াণে বাঙালি জাতির তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখে আমার এই কথাটাই মনে হয়েছিল। এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম বাঙালি জাতির মন ও মানসিকতা। বঙ্গবন্ধুর একক নেতৃত্ব ও বহু মানুষের আত্মত্যাগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই মুক্তিদাতা ও জাতির পিতা যেদিন সদ্য স্বাধীন দেশের স্বাধীন রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, সেদিন তাঁর অবিস্মরণীয় অবদানে মুগ্ধ লক্ষ-কোটি বাঙালি অফুরন্ত আনন্দে রাজপথে নেমে এসেছিল। তাঁকে জানিয়েছিল হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা আর দিয়েছিল স্বতঃস্ফূর্ত সংবর্ধনা, যা শুধু বাঙালি জাতির ইতিহাসে নয়, বিশ্ব ইতিহাসেও ছিল অভূতপূর্ব।

সেই কৃতজ্ঞ বাঙালি জাতি কীভাবে মাত্র তিন বছরের ব্যবধানে কৃতঘ্ন হয়ে গেল, আমি বুঝতে পারি না। যেদিন বঙ্গবন্ধুকে হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতায় পরিবারসহ হত্যা করা হয়, সেদিন রাজধানীর রাজপথে একজন বাঙালিকেও দেখা যায়নি। পরদিন, বলা যায় He was buried unlamented and uncoffined। তাঁর প্রতিষ্ঠিত দেশের রাজধানীতে তাঁর সমাধি দূরের কথা, জানাজাও হলো না। বঙ্গবন্ধুর এই পরিণতি কি প্রাপ্য ছিল?

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন যেন ইংরেজ কবি রবার্ট ব্রাউনিংয়ের 'The Patriot' কবিতার ভেতর দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে, কবি যখন দেশপ্রেমিকের আনন্দঘন স্বাগত সংবর্ধনা আর বেদনাদায়ক বিদায়ের দৃশ্য চিত্রায়িত করেন—

'Thus I entered..., and
Thus I go'

অবাক হতে হয় বঙ্গবন্ধু সেই প্যাট্রিয়টের মতো 'কীভাবে এসেছিলেন এবং কীভাবে তিরোহিত হলেন।'

AMARBOI.COM

বিশ্বজুড়ে দেখা গেছে, ব্যর্থতার দায়ভার কেউ নিতে চায় না। সে জন্য ইংরেজিতে একটা কথা আছে 'Success has many fathers, failure is an orphan'। আমাদের ক্ষেত্রেও হয়েছে এই অবস্থা। জাতীয় রক্ষীবাহিনীর সাফল্য কেউ চোখে দেখে না। এমনকি বঙ্গবন্ধুকে রক্ষায় ব্যর্থতার দায়ও এই বাহিনীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে এ নিয়ে অনেকেই রক্ষীবাহিনীর সমালোচনা করেছেন।

বঙ্গবন্ধুকে রক্ষায় যে ব্যর্থতা এবং প্রতিরোধ গড়ার যে ব্যর্থতা, তার দায়ভার যতটুকু রক্ষীবাহিনীর ওপর বর্তায়, ঠিক ততটুকু গ্রহণ করতে আমি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করি না। রক্ষীবাহিনীর উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ) হিসেবে আমার ওপর যতটুকু দায়ভার পড়ে, ততটুকু আমি বিনা দ্বিধায় মাথা পেতে নেব। কিন্তু প্রশ্ন দেখা দেয়, সেদিন যাদের দায়িত্ব ছিল তথ্য সংগ্রহ ও যথাস্থানে সরবরাহ করা, সেসব গোয়েন্দা সংস্থা যথা ডিজিএফআই, এনএসআই ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্পেশাল ব্রাঞ্চের যে ব্যর্থতা, তার দায়ভার কি ওই সংস্থাগুলো ও তাদের তদানীন্তন কর্মকর্তারা নিয়েছেন? রাষ্ট্রের যাঁরা কর্ণধার ছিলেন অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে আগেও যাঁরা দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং সেদিনও অর্থাৎ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে দায়িত্ব পালন করার কথা ছিল, তাঁরা কি তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছেন? তাঁরা তো দেশের উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদের ক্ষমতার আসনে বসে ছিলেন। জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে কলঙ্কজনক অধ্যায়ে তাঁদের ব্যর্থতা ও নিষ্ক্রিয়তার দায়ভার কি তাঁরা এড়াতে পারবেন? যাঁরা রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁরা তো সরাসরি জনগণের কাছে দায়ী। অনেকেই যখন খন্দকার মোশতাকের মন্ত্রিসভার সদস্য হলেন, তখন তাঁদের জবাবদিহি কোথায় থাকল? অবশ্য যাঁরা প্রতিবাদী ছিলেন তাঁদের কথা আলাদা। তাঁদের অনেককেই জীবন দিতে হয়েছিল এবং অনেকে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন কারাগারে।

যাঁদের ওপর রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিরাপত্তার দায়িত্ব ছিল, ১৫ আগস্ট তাঁরা যে সীমাহীন ব্যর্থতা দেখালেন, তার জন্য জবাব কে দেবে? যে কজন দেশপ্রেমী বঙ্গবন্ধুকে রক্ষা করতে গিয়ে জীবন দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কর্নেল জামিল উদ্দিন ছাড়া আর কাউকে কি বীরত্বসূচক সম্মান দেওয়া হয়েছে? যাঁরা সরাসরি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে, তাঁদের কি শাস্তি দেওয়া হয়েছে?

আর বাকশাল ও আওয়ামী লীগের অগণিত নেতা ও কর্মীবাহিনী, যাঁরা স্লোগান দিতেন 'বঙ্গবন্ধু যেখানে, আমরা আছি সেখানে', তাঁরা কোথায় ছিলেন? সামান্য কারণে তাঁরা রাজপথে নেমে আসেন। অথচ দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বেদনাদায়ক ঘটনার পর, জাতির পিতাকে নির্মমভাবে হত্যার পর তাঁরা রাজপথে বেরোলেন না কেন? তাঁদের কি ভয় ছিল? তাঁরা হাজারে হাজারে রাজপথে নামলেই তো বোঝা যেত জনগণ খুনিদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। জনগণের দৃশ্যমান সমর্থন থাকলেই সরকারি বাহিনীগুলো প্রতিরোধে দাঁড়াতে পারত।

১৫ আগস্ট সারা দিন রক্ষীবাহিনীর প্রধান কার্যালয়ে বসে আমরা পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং সম্ভাব্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, তা বিবেচনা করি। রক্ষীবাহিনীর প্রায় প্রতিটি ইউনিটের সঙ্গে যোগাযোগ করে যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য সবাইকে তৈরি থাকার নির্দেশ দিই। এদিকে বিভিন্ন সূত্র থেকে আমরা তথ্য সংগ্রহ করতে থাকি এবং সেনাবাহিনীর ভেতরে কী অবস্থা জানতে চেষ্টা করি। বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার সংবাদে জাতি এমনিতেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শোকাতুর কিন্তু তা প্রকাশ করার কোনো পথ খোলা ছিল না। কারণ, জাতীয় নেতারা তখন দিকনির্দেশনা দিতে ব্যর্থ হন। রেডিও-টেলিভিশন খুনিদের নিয়ন্ত্রণে ছিল; বিভিন্নভাবে তাঁরা দেশে একটা ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। যে 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিয়ে বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়েছিল, সেই ধ্বনি হঠাৎ কোথায় যেন মিলিয়ে যায়। তার বদলে এল 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' ধ্বনি। পাকিস্তানি আমল ও ধ্যানধারণা আবার যেন ফিরে আসে। পাকিস্তানই এ সময় সবার আগে খন্দকার মোশতাকের সরকারকে অভিনন্দন জানায়। কিছু লোক পাকিস্তানি ভাবধারা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে।

সুবিধালোভী ও সুযোগসন্ধানী একদল মানুষ এই সুযোগে ক্ষমতার রাজনীতিতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা চালায়। পাকিস্তানি ভাবধারার লোকেরা স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট মোশতাককে অভিনন্দন জানাতে দেরি করেনি। বাকশাল ও আওয়ামী লীগের কিছু নেতা, বিশেষ করে তাহের উদ্দিন ঠাকুর, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, কে এম ওবায়দুর রহমান ও নূরুল ইসলাম মঞ্জুর যে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তা স্পষ্ট হতে থাকে।

বিকেলে নতুন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে সরোয়ার ও আমাকে বঙ্গভবনে উপস্থিত থাকতে বলা হয়। কিন্তু আমরা না গিয়ে অফিসে থেকে যাই। খবর পাই, বঙ্গবন্ধুর সরকারের মন্ত্রীদের বেশির ভাগই নতুন মন্ত্রিসভায় শপথ নিয়েছেন। খন্দকার মোশতাক তাঁদের মন্ত্রী করে বিশ্ববাসীকে বোঝাতে চেয়েছেন বাংলাদেশে সরকার পরিবর্তিত হয়নি, কেবল পরিবর্তিত হয়েছে ব্যক্তির।

আমি অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলাম মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর আচরণে। বাকশাল গঠনের পরপরই ১৯৭৫ সালের ৮ মার্চ মওলানা ভাসানীর সাদর আমন্ত্রণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টাঙ্গাইলের কাগমারী সফরে গিয়েছিলেন। এই সফরে আমিও বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ছিলাম। কাগমারীতে লক্ষাধিক মানুষের এক জনসভায় মওলানা ভাসানী বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানান এবং দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন, তিনি মুজিবের নেতৃত্বে ছয় দফা আন্দোলন যেভাবে সমর্থন করেছিলেন, সেভাবেই তাঁর দ্বিতীয় বিপ্লবকেও সমর্থন করে যাবেন। সেদিন বঙ্গবন্ধু মওলানা ভাসানীর পা স্পর্শ করে সালাম করেছিলেন আর মওলানা ভাসানী পিতৃস্নেহে বঙ্গবন্ধুকে আশীর্বাদ করেছিলেন। এ দৃশ্য আমি কৌতূহল নিয়ে দেখেছি। সেই মওলানা ভাসানী মাত্র পাঁচ মাস পর তাঁর অতীত রাজনীতির মতো আবারও ডিগবাজি খেলেন। তাঁর পুত্রতুল্য 'মজিবর'কে যাঁরা নির্মমভাবে হত্যা করেছেন, তাঁদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিনন্দন জানাতে তাঁর বিবেকে এতটুকুও বাধল না! তা-ও এমন সময় ঘৃণিত ঘাতকদের অভিনন্দন জানালেন, যখন শেখ মুজিবুর রহমানের পবিত্র দেহের রক্তও শুকায়নি এবং তাঁকে সমাহিত পর্যন্ত করা হয়নি। ইতিহাসের কী নির্মম পরিহাস, যে স্বার্থান্বেষী মহলের মন্ত্রণায় মওলানা ভাসানী এই জঘন্য কাজটি করেছিলেন, তাঁরা কিন্তু পরে তাঁর পাশে থাকেননি। এমনকি তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতেও তাঁদের দেখা যায় না।

১৫ আগস্ট সন্ধ্যার দিকে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ আমাকে ফোন করে জানান যে জরুরি কথা আছে। সরোয়ার ও আমাকে বঙ্গভবনে যেতে হবে। আমরা বঙ্গভবনে গিয়ে দেখি খালেদ মোশাররফ ভীষণ ব্যস্ত। তিনি নিজ উদ্যোগে এক জরুরি 'অপারেশন রুম' স্থাপন করেছেন। সেখানে আমাদের সীমান্ত এলাকা থেকে বিদ্যুদ্‌বেগে তথ্য আসছে—ভারতীয়রা কোথায় কোথায় সেনাসমাবেশ ঘটাচ্ছে আর ট্যাংকবহর মোতায়েন করছে ইত্যাদি। তাঁর ও অন্য কর্মকর্তাদের ব্যস্ততা দেখে মনে হলো, ভারত যেকোনো সময় বাংলাদেশ আক্রমণ করতে পারে এবং তাঁরা সেই আক্রমণ প্রতিহত করার ব্যবস্থা করছেন। আমরা বেশ কিছুক্ষণ খালেদ মোশাররফের নতুন অপারেশন কক্ষে থাকলাম। কিন্তু ভারত সীমান্তে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী মোতায়েনের কোনো তৎপরতা বা নির্দেশ দেখলাম না। ব্রিগেডিয়ার খালেদ আমাদের কেন ডেকেছেন, সে সম্পর্কে কিছু বললেন না। তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলার চেয়ে অন্য কাজে বেশি ব্যস্ততা দেখালেন। তবে আমরা ঠিকই বুঝতে পারলাম যে ভারত বাংলাদেশ আক্রমণের তৎপরতা দেখাচ্ছে, এই মর্মে আমাদের তিনি ধোঁকা দিতে চাচ্ছেন। আমরা সামরিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ না হলেও সাধারণ জ্ঞানহীন তো নই। নয় মাস যুদ্ধক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা তো আছে আমাদের, হাজার লেখাপড়া করেও যা অর্জন করা যায় না।

বঙ্গভবনে দেখা গেল বঙ্গবন্ধুর খুনিরা রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে পেয়ে ভীষণ ব্যস্ত। তাদের মধ্যে একটা উৎসব উৎসব ভাব। আমীন আহম্মেদ চৌধুরীকে দেখা গেল তিনি রাষ্ট্রপতির মিলিটারি সেক্রেটারি বনে গেছেন। লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম এ মতিন[৬] বীর প্রতীককে দেখা গেল বঙ্গভবনের নিরাপত্তার দায়িত্বে। জিয়াউর রহমান, বিডিআর-প্রধান খলিলুর রহমান, পুলিশ-প্রধান এ কে নুরুল ইসলাম ও ব্রিগেডিয়ার মসহুরুল হক একটা কক্ষে কথাবার্তা বলছিলেন। এমন সময় জিয়াউর রহমান আমার কাছে এসে জানতে চান, তোফায়েল আহমেদ আমাদের ওখানে আছেন কি না। তাঁর এ কথায় আমি কিছুটা দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ি। অবশ্য সেটা কেটে যায় কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই। আমি উত্তর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেওয়ার আগেই তিনি বলেন, সিদ্ধান্ত হয়েছে, রক্ষীবাহিনীর প্রধান কার্যালয় থেকে একজন পুলিশ কর্মকর্তা তোফায়েল আহমেদকে পুলিশ হেফাজতে নেবেন। এ কথায় আমি কিছুটা আশ্বস্ত হই। তাঁকে বলি, তোফায়েল আহমেদ আমাদের ওখানে আছেন। পরে (রাত ১০টায়) ঢাকার সিটি এসপি আবদুস সালামকে রক্ষীবাহিনীর প্রধান কার্যালয়ে পাঠানো হয়। তিনি তোফায়েল আহমেদকে নিয়ে যান। কিন্তু তোফায়েল আহমেদকে কোথায় নিয়ে যাবেন, সে বিষয়ে তিনি কিছু জানতেন না। এ ব্যাপারে তাঁকে কোনো নির্দেশনাও দেওয়া হয়নি। তাই তিনি তোফায়েল আহমেদকে পুলিশ হেফাজতে না নিয়ে বাসায় রেখে আসেন। এটা আমি পরে জানতে পারি। কদিন পর বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীরা তাঁকে বাসা থেকে আটক করে। তাঁকে নির্যাতনও করে তারা। পুলিশ হেফাজতে থাকলে হত্যাকারীরা এটা হয়তো করতে পারত না।

এদিকে আমাদের কেন বঙ্গভবনে যেতে বলা হয়েছে, তা বুঝতে পারছি না। সেখানে কিছুক্ষণ থাকার পর আমরা ফিরে আসতে চাইলে খালেদ মোশাররফ আমাদের বললেন, দেশে সামরিক আইন জারি হতে পারে। সারা দেশে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হবে। এ জন্য সেনাবাহিনীর সঙ্গে বিডিআর এবং রক্ষীবাহিনীর সদস্যদেরও প্রয়োজন হবে। আমরা দুজনই খালেদ মোশাররফকে বলি, আমাদের পরিচালক এ এন এম নূরুজ্জামান লন্ডন থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারব না।

এটা বলে আমরা বঙ্গভবন থেকে রক্ষীবাহিনীর প্রধান কার্যালয়ে যাওয়ার জন্য রওনা দিই। এ সময় একটি কক্ষে দেখি সেনাপ্রধান কে এম সফিউল্লাহ আর বিমানবাহিনী-প্রধান এ কে খন্দকার নির্লিপ্তভাবে এক কোনায় বসে আছেন। আমরা তাঁদের কাছে গেলে সফিউল্লাহ আমাদের খোঁজখবর নেন এবং বঙ্গবন্ধুর জন্য কিছুই করতে পারলেন না বলে অনুশোচনা প্রকাশ করেন। তিনি বললেন, 'Shaheed, I will go black in the history of Bangladesh.'

সরোয়ার ও আমি রাতে সিদ্ধান্ত নিই, আমরা বাড়ি যাব না, অফিসেই থাকব। সে মোতাবেক সরোয়ার, সাবিহ উদ্দিন ও আমি আমাদের অফিসার্স মেসে একসঙ্গে রাত কাটাই। পরদিন আমরা রংপুরের ব্রিগেড কমান্ডার খন্দকার নাজমুল হুদার সঙ্গে কথা বলি। বুঝতে চেষ্টা করি আমরা সেদিকে গেলে সহযোগিতা পাওয়া যাবে কি না। নাজমুল হুদা যেসব কথা বললেন তা খুব আশাব্যঞ্জক ছিল না। এমতাবস্থায় আমরা এ এন এম নূরুজ্জামানের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু লন্ডনে ফোন করার চেষ্টা করেও লাইন পাওয়া গেল না। পরে জানতে পারি, তখন বিদেশের সঙ্গে সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে দেওয়া হয়েছিল। বিমান চলাচলও বন্ধ ছিল।

এদিকে বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার খবর পেয়ে সাভারে রক্ষীবাহিনীর প্রশিক্ষণকেন্দ্রে দুজন রক্ষী সদস্য আত্মহত্যা করেন। যে দুজন সদস্য আত্মহত্যা করেন তাঁদের নাম এখন আমার মনে নেই। অন্যদের মধ্যেও গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। কয়েকজন রক্ষী আবার প্রশিক্ষণকেন্দ্র থেকে পালিয়ে যান। এ পরিস্থিতিতে আমাদের ৪ নম্বর ব্যাটালিয়নকে যেকোনো ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তৈরি রাখা হয়। প্রশিক্ষণের জন্য সীমিত অস্ত্র-গোলাবারুদ যা ছিল তা ইস্যু করা হয়। এ খবর সেনাসদরে পৌঁছালে তাঁরা ধারণা করেন রক্ষীবাহিনী হয়তো সশস্ত্র প্রতিরোধ ও বিদ্রোহ করার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে। এরপর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল কর্নেল মইনুল হোসেন চৌধুরী আমার সঙ্গে কথা বলেন। তিনি জানান যে তাঁরা শুনেছেন, সাভারে রক্ষীবাহিনী ক্যাম্পে উত্তেজনা বিরাজ করছে। তাই তিনি রক্ষী সদস্যদের সঙ্গে কথা বলতে সাভার যেতে চান। আমি তাঁকে জানাই, রক্ষীবাহিনী প্রতিটি ক্যাম্পেই উত্তেজনা বিরাজ করছে। তবে আমাদের আদেশ ছাড়া কোনো ক্যাম্পেই কিছু ঘটার সম্ভাবনা নেই। কারণ, আমাদের কমান্ড ও কন্ট্রোল অটুট আছে। তার পরও মইনুল হোসেন চৌধুরী সাভার যেতে চান। আমি তাঁকে বলি, আপনি যেতে পারেন কিন্তু সঙ্গে কোনো সেনা নিয়ে যাবেন না। সেনা দেখলে রক্ষী সদস্যরা অনেক বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়বে। আমিও আপনার সঙ্গে যাব, তাহলে আপনার নিরাপত্তা নিয়ে ভাবতে হবে না।

পূর্বসিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৭ আগস্ট সকাল বেলা মইনুল হোসেন চৌধুরী আমাদের প্রধান কার্যালয়ে আসেন। সেখান থেকে আমরা একত্রে সাভার যাই। তিনি লিডার ও রক্ষীদের সঙ্গে কিছুক্ষণ সময় কাটান। এ সময় তিনি সবার উদ্দেশে বক্তব্য দেন। তিনি দেশের স্বার্থের কথা চিন্তা করে সবাইকে শান্ত থাকতে বলেন। সব রক্ষীকে সামরিক বাহিনীতে নেওয়া হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন এবং অর্জিত স্বাধীনতা যাতে বিপন্ন না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে বলেন। তারপর আমরা একসঙ্গে ঢাকায় চলে আসি। সাভারে মইনুল হোসেন চৌধুরী ভালো ভালো কথা বলেছিলেন। কিন্তু সেখানে যাওয়ার তাঁর আসল উদ্দেশ্য কী ছিল, তখন সেটা স্পষ্ট ছিল না। পরে তিনি আমাকে বলেছেন, সেনাপ্রধান ও উপপ্রধানের নির্দেশে তিনি সাভার গিয়েছিলেন।

এদিকে তখন ভারতের নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনে প্রতিরক্ষা অ্যাটাশে ছিলেন ব্রিগেডিয়ার এম এ মঞ্জুর (মোহাম্মদ আবুল মঞ্জুর)। তিনি ১৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগস্টের হত্যাকাণ্ডের পরপরই কদিনের জন্য ঢাকা আসেন। কার আদেশে, কীভাবে এবং কী উদ্দেশ্যে তিনি ঢাকায় এসেছিলেন তা ছিল অনেকটা রহস্যাবৃত। তবে তাঁকে প্রায় সময়ই জিয়াউর রহমানের আশপাশে দেখা যেত। রক্ষীবাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে তিনি আগ্রহী ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি আন্তরিকতা নিয়ে আমাদের সঙ্গে বেশ কয়েকবার কথা বলেছিলেন। আমাদের সঙ্গে কথা হয় মূলত রক্ষীবাহিনীকে একত্র রাখা এবং গোটা বাহিনীকে সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে। শেষ পর্যন্ত আমরা তাঁর কথায় রক্ষীবাহিনীকে সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে একমত হই।

খন্দকার মোশতাক আহমদ ক্ষমতা গ্রহণ এবং মন্ত্রিসভা গঠন করেই আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী ও মুক্তিযোদ্ধাদের গ্রেপ্তার করতে থাকেন। ২৩ আগস্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এ এইচ এম কামারুজ্জামান, এম মনসুর আলী, আবদুস সামাদ আজাদসহ শীর্ষস্থানীয় নেতাদের মধ্যে যাঁরা তাঁকে সমর্থন করতে এবং তাঁর মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে অস্বীকার করেন, তাঁদের বন্দী করেন। অনেকে আত্মগোপন করেছিলেন। কিন্তু তাজউদ্দীন আহমদ ৫ আগস্ট থেকেই তাঁর বাড়িতে নজরবন্দী অবস্থায় ছিলেন। নেতাদের গ্রেপ্তারের ফলে দেশে এক ভয়ংকর ও আতঙ্কজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। স্বাধীনতাবিরোধী চক্র আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। রেডিও, টেলিভিশন ও পত্রপত্রিকার ভাব দেখে মনে হয়েছে, ৩০ লাখ মানুষের রক্তে গড়া বাংলাদেশ এখন পুরোপুরি চলছে উল্টো পথে। অনেকের ধারণা হয়, বাংলাদেশই হয়ে গেল পাক বাংলা। এমনকি মুক্তিযোদ্ধা সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যেও যে পাকিস্তানের বহুল আলোচিত গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইয়ের এজেন্ট লুকিয়ে ছিল, তা-ও স্পষ্টত দেখা গেল।

তখন আমাদের একটাই চিন্তা, কী করে এই স্বাধীনতাবিরোধী চক্রকে ক্ষমতাচ্যুত করা যায়। রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা তো সর্বদা প্রস্তুত। কিন্তু আমাদের সমর্থন দরকার সেনাবাহিনীর ভেতর থেকে। এর মধ্যে আভাস পাওয়া গেল, খালেদ মোশাররফ ওপরে ওপরে যতই ঘৃণিত ঘাতক আর বিশ্বাসঘাতক খন্দকার মোশতাক গংয়ের পক্ষে থাকুন না কেন, আসলে তিনি সুযোগ পেলেই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। সেনাপ্রধান কে এম সফিউল্লাহ বঙ্গবন্ধুকে রক্ষা করতে না পারায় হয়তো বিবেকের দংশনে ভুগছেন। সুযোগ পেলে তিনিও ব্যবস্থা নেবেন—এ বিশ্বাস আমাদের ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক এই বিশ্বাস থেকে দিন কয়েক পর একদিন আমরা তাঁকে আমাদের প্রশিক্ষণকেন্দ্রে আমন্ত্রণ জানাই। ২৪ আগস্ট সকালবেলা কে এম সফিউল্লাহ সাভারে আসেন এবং রক্ষীদের সমাবেশে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি রক্ষী সদস্যদের সতর্ক ও শান্ত থাকতে বলেন। সেদিন আমরা, বিশেষত সরোয়ার ও আমি, আকারে ইঙ্গিতে তাঁকে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি, প্রয়োজনে তাঁর পাশে আমরা থাকব।

কে এম সফিউল্লাহ এটা অনুধাবন করেছিলেন কি না, আমি জানি না। এ নিয়ে সরাসরি তাঁর সঙ্গে কথা বলার পর্যায়ে আমরা ছিলাম না। প্রকৃতপক্ষে বাহিনীর শৃঙ্খলা অনুযায়ী আমাদের মতো স্তরের কর্মকর্তাদের সরাসরি সেনাপ্রধানসহ উচ্চপদস্থ কারও সঙ্গে প্রয়োজন ছাড়া কথা বলার সুযোগ ছিল না। তবে শুরু থেকে সরোয়ার ও আমি রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে জড়িত থাকার সুবাদে তখনকার সামরিক-বেসামরিক উচ্চপদস্থ অনেকের সঙ্গে আমাদের চেনাজানা হয়। কারও কারও সঙ্গে, বিশেষত মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তাদের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা ছিল। কিন্তু সেটা সীমাবদ্ধ ছিল ব্যক্তিগত কার্যাবলির মধ্যেই।

যা হোক, আমাদের এই প্রচেষ্টাও শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। কারণ, ওই দিন সন্ধ্যাবেলা বেতার ও টেলিভিশনে ঘোষণা প্রচার করা হলো যে, কে এম সফিউল্লাহকে সেনাবাহিনীর প্রধানের পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছে। তাঁর পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে। ১৫ আগস্ট থেকে আমরা গভীরভাবে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করছিলাম। ঘোষণা শুনে আমরা বুঝতে পারলাম, বঙ্গবন্ধুর ঘাতকদের পছন্দ অনুযায়ীই জিয়াউর রহমানকে সেনাবাহিনী প্রধানের পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু খন্দকার মোশতাক ভালো করেই জানত, জিয়াউর রহমান অনেক উচ্চাভিলাষী। তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করা তাঁর পক্ষে সহজ হবে না। সে জন্য তাঁর পরামর্শে জিয়ার বিরোধী এম এ জি ওসমানীকে প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা এবং তাঁদের দুজনের সঙ্গে সংযোগমাধ্যম হিসেবে পাকিস্তান-প্রত্যাগত ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তা খলিলুর রহমানকে (তিনি জিয়ার চেয়ে অনেক সিনিয়র ছিলেন) চিফ অব দ্য ডিফেন্স স্টাফ নিয়োগ করা হয়। তাঁরা দুজনই আবার খালেদ মোশাররফকে পছন্দ করতেন। এ জন্য খালেদ মোশাররফকে সিজিএস পদেই রাখা হয়। যদিও অনেকে ধারণা করেছিলেন, খালেদকে অপসারণ করে মেজর জেনারেল জিয়ার পছন্দমতো এম এ মঞ্জুরকে সিজিএস করা হবে। তা না হওয়ায় জিয়াউর রহমান সেনাপ্রধান হয়েও পুরোপুরি ক্ষমতাবান হতে পারেননি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যদিকে খন্দকার মোশতাক আর এম এ জি ওসমানীর হয়তো ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে সেনাপ্রধান করার ইচ্ছা ছিল।

রাষ্ট্রপতির প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা হয়েই এম এ জি ওসমানী সরোয়ার ও আমাকে একদিন বঙ্গভবনে ডাকেন। সেখানে গিয়ে দেখি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বিষণ্ন মনে এক কোনায় বসে আছেন। আগের দিন তাঁকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বঙ্গভবনে তখনো এম এ জি ওসমানীর কোনো অফিসকক্ষ হয়নি। একটি ছোট ঘরে তিনি আমাদের দুজনকে নিয়ে বসলেন। প্রথমেই তিনি ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'How many Hindus are there in Rakhhi Bahini?' প্রশ্নটা অবাক করার মতো। শুনেই মনে হলো 'একি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে!' মাত্র বছর খানেক আগেই তিনি সিলেটের একটি হিন্দু ছেলেকে লিডার পদে নিয়োগের জন্য আমাদের পরিচালককে অনুরোধ করেছিলেন। আজ তিনি জিজ্ঞাসা করছেন কজন হিন্দু আছে রক্ষীবাহিনীতে! অবাক হওয়ারই কথা। আমরা দুজন বললাম, হিসাব না করে এটা বলা যাবে না। তবে হিন্দুদের সংখ্যা খুব বেশি নয়।

এরপর ওসমানী আমাদের বলেন, রক্ষীবাহিনী বিলুপ্ত করা হবে এবং রক্ষীদের ভাগ করে পুলিশ ও আনসার বাহিনীতে দেওয়া হবে। আমরা বললাম, এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। কথা বলতে হবে আমাদের পরিচালক এ এন এম নূরুজ্জামানের সঙ্গে। এ জন্য তাঁকে অবিলম্বে দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আমরা আরও বলি, তাঁর সঙ্গে আমরা টেলিফোনে কথা বলতে চাই।

ওসমানী আমাদের কথায় খুব রাগান্বিত হলেন। ইংরেজিতে বললেন, 'Nuruzzaman can't come.' আমরা এবারও দৃঢ়ভাবে তাঁকে জানালাম, নূরুজ্জামান ছাড়া রক্ষীবাহিনী সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত আপনারা বাস্তবায়ন করতে পারবেন না। কারণ, রক্ষী সদস্যরা এটা মানবে না। এ ব্যাপারে আমাদের আরও কিছুক্ষণ কথা হয়। এখন আর সব কথা মনে নেই। কথা বলার পর ওসমানী একটু নরম হন এবং ইংরেজিতে বলেন, 'I will talk to the President.'

এদিকে আমরা যখন প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা এম এ জি ওসমানীর সঙ্গে কথা বলছিলাম, তখন জিয়াউর রহমান এবং এম এ মঞ্জুর আমাদের খুঁজছিলেন। এম এ জি ওসমানীর সঙ্গে কথা বলে আমরা বের হতেই জিয়া আমাদের দেখতে পান। তিনি আমাদের ডেকে বলেন যে, 'তোমরা চিন্তা কোরো না,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরকার যদি ভেঙেও দেয়, তবে রক্ষীবাহিনীর সব সদস্যকে আমি সরকারিভাবেই সেনাবাহিনীতে নেব।' আমাদের পরিচালক এ এন এম নূরুজ্জামানকে দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করবেন বলেও আশ্বাস দেন তিনি। তাঁর কথায় আমরা একটু আশ্বস্ত হয়ে অফিসে ফিরে আসার জন্য বঙ্গভবন থেকে বের হই। তখন এম এ মঞ্জুরও আমাদের সঙ্গে বের হন এবং আমাদের অফিসে আসেন। সেখানে ভারপ্রাপ্ত পরিচালক আবুল হাসান খান, সাবিহ উদ্দিন আহমেদ, সরোয়ার ও আমি তাঁর সঙ্গে রক্ষীবাহিনীর ভবিষ্যৎ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করি। কারণ, আমরা জানতাম, এম এ মঞ্জুরের ওপর জিয়াউর রহমানের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। আলোচনায় এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে জিয়ার মতো মঞ্জুরও চান রক্ষীবাহিনীর পুরোটাই সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হোক। কারণ, রক্ষীবাহিনী সদস্যদের প্রশিক্ষণ, শৃঙ্খলা ও দক্ষতার ওপর তাঁদের পূর্ণ আস্থা ছিল এবং তাঁরা জেনেছেন, খন্দকার মোশতাক রক্ষীবাহিনীকে বিলুপ্ত করে দেবেন। দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার পর রক্ষীবাহিনী দেশে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড দমন ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে অসাধারণ অবদান রেখে যে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, তা সেনাবাহিনী সম্প্রসারণে যথেষ্ট অবদান রাখতে পারে। আমরা বলি যে আমরা বিষয়টি চিন্তাভাবনা করে দেখব। তবে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অবশ্যই এ এন এম নূরুজ্জামানকে দেশে আসতে দিতে হবে।

এম এ মঞ্জুর পরদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদের নতুন সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের বাসায় যেতে অনুরোধ করেন। সরোয়ার, সাবিহ উদ্দিন ও আমি যথাসময়ে তাঁর সেনানিবাসের বাসায় যাই। সেখানে এম এ মঞ্জুরও উপস্থিত ছিলেন। দেশ পরিচালনার বিষয়ে আমাদের মতামত চেয়ে জিয়াউর রহমান আলোচনার সূত্রপাত করেন। আমরা আগেই জেনেছিলাম যে এম এ মঞ্জুর সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণায় আকৃষ্ট। এ ভাবধারার প্রতি তাঁর বেশ আকর্ষণ আছে। সম্ভবত জিয়াউর রহমানকেও তিনি ওই ভাবধারার দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছিলেন। এ জন্যই হয়তো জিয়াউর রহমান সমাজতন্ত্র সম্পর্কে আমার মতামত জানতে চান। তিনি আমাকে আগে থেকেই চিনতেন এবং নানা সময়ে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা ও কথা হয়েছে। এ কথা আগে বলেছি। আবার চাকরির কারণে আমাদের মধ্যে দূরত্বও ছিল। পদমর্যাদায় তিনি আমার অনেক ওপরে ছিলেন। এ অবস্থায় আমি কিছুটা বিব্রতকর অবস্থায় পড়ি। আমি পক্ষে-বিপক্ষে কিছু না বলে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে উইনস্টন চার্চিলের দুটো মন্তব্যের উদ্ধৃতি দিই শুধু। মন্তব্যগুলো ছিল : ১. Socialism is

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

like a hat that has lost its shape because everybody wears it. ২. Capitalism is unequal sharing of wealth and Socialism is equal sharing of misery. আমার মন্তব্য দুটি শুনে জিয়াউর রহমান আমাকে এ বিষয়ে আর কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না।

এরপর শুরু হয় আসল বিষয় অর্থাৎ রক্ষীবাহিনী নিয়ে আলোচনা। এবারও জিয়াউর রহমান এ আলোচনার সূত্রপাত করেন এবং আমাদের বক্তব্য জানতে চান। আমরা তাঁকে সংক্ষেপে এরকম একটা স্পষ্ট ধারণা দিলাম যে, এটা করার জন্য অনতিবিলম্বে আমাদের পরিচালক নূরুজ্জামানের দেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করতে হবে। আরও বললাম, রক্ষীবাহিনীকে যদি সত্যিই বিলুপ্ত করা হয়, তাহলে বাহিনীর সদস্যদের ভাগাভাগি করে বিভিন্ন বাহিনীতে না দিয়ে সবাইকে একসঙ্গে সেনাবাহিনীতে আত্তীকরণ করা হলে তারা হয়তো রাজি হবে। তবে রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা যে যে র‍্যাংকে আছেন, সেনাবাহিনীতেও তাঁদের সেই একই র‍্যাংকে নিতে হবে। জিয়া আমাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন। আমাদের কথা শেষ হলে তিনি আমাদের উত্থাপিত বিষয়গুলো তাঁর ওপর ছেড়ে দিতে বলেন। খুব বেশি কথা তিনি বলেননি।

জিয়াউর রহমানের সঙ্গে কথা বলে আমরা বুঝতে পারলাম, তিনি চিন্তা করেছেন রক্ষীবাহিনীকে সেনাবাহিনীতে আত্তীকরণ করা হলে সেনাবাহিনীই লাভবান হবে। রক্ষীবাহিনীর সব স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, যথা—মিরপুরে রক্ষীবাহিনীর নির্মাণাধীন হেডকোয়ার্টার্স, সাভার প্রশিক্ষণকেন্দ্র, চট্টগ্রামের ভাটিয়ারীর প্রশিক্ষণকেন্দ্র (এখন বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি) এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত রক্ষীবাহিনীর জায়গাগুলো পাবে। এ ছাড়া রক্ষীবাহিনীর ১৬টি ব্যাটালিয়ন পেলে সেনাবাহিনীর পাঁচটি ব্রিগেডকে পাঁচটি ডিভিশনে উন্নীত করা সহজ হবে। এ ছাড়া এম এ মঞ্জুরের আরেকটি যুক্তি ছিল, রক্ষীবাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা সদস্যদের পেলে সেনাবাহিনীতে মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

জিয়াউর রহমানের সঙ্গে আলোচনার পর আমাদের রক্ষীবাহিনীর পরিচালক এ এন এম নূরুজ্জামানের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে দেওয়া হয়। তাঁকে আমরা উদ্ভূত পরিস্থিতিতে যা যা করেছি, সবই জানাই। আমরা যা করেছি তার ওপর তিনি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করেন এবং সমর্থন জানান। এর কয়েক দিন পর তিনি দেশে ফিরে আসেন। সরোয়ার ও আমি অনেকটা ভারমুক্ত হই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এদিকে সরকারের বিভিন্ন সূত্রে খবর পাই যে, জাতীয় রক্ষীবাহিনীকে বিলুপ্ত করে রক্ষী সদস্যদের আনসার, পুলিশ ও সেনাবাহিনীতে ভাগ করে দেওয়ার ব্যাপারে খন্দকার মোশতাক, এম এ জি ওসমানী ও বঙ্গবন্ধুর খুনিরা শক্ত অবস্থান নিয়েছেন। অন্যদিকে জিয়াউর রহমান এবং এম এ মঞ্জুর অবস্থান নিয়েছেন এর বিপক্ষে। তাঁদের পরিকল্পনা রক্ষীবাহিনীর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও প্রশিক্ষণাধীন সব কর্মকর্তা ও সদস্যকে সেনাবাহিনীতে আত্তীকরণ করা। এ ব্যাপারে খালেদ মোশাররফ কোন পক্ষে, সেটা বোঝার উপায় ছিল না। তবে সরকারের মধ্যে দ্বিমতের সুযোগে আমাদের এক পক্ষ নেওয়ার পথ খুলে গেল। সেটা ব্যবহার করে আমাদের পরিচালক লন্ডন থেকে ফিরেই কৌশলগত কারণ ও রক্ষীবাহিনীর স্বার্থে জিয়াউর রহমানের পক্ষ নেন। আত্তীকরণ-প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য তাঁকে সেনাসদরে সংযুক্ত করা হয়।

এ সময় রক্ষীবাহিনীর ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য বঙ্গভবনে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় খন্দকার মোশতাক, এম এ জি ওসমানী, খলিলুর রহমান, জিয়াউর রহমান এবং এ এন এম নূরুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

এই সেস্না প্লেনে সরোয়ার হোসেন মোল্লা (বাঁ থেকে তৃতীয়) ও লেখক (বাঁ থেকে চতুর্থ) রক্ষীবাহিনীর বিভিন্ন ক্যাম্পে যান। সঙ্গে দুজন বৈমানিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রক্ষীবাহিনীর কয়েকজন লিডার

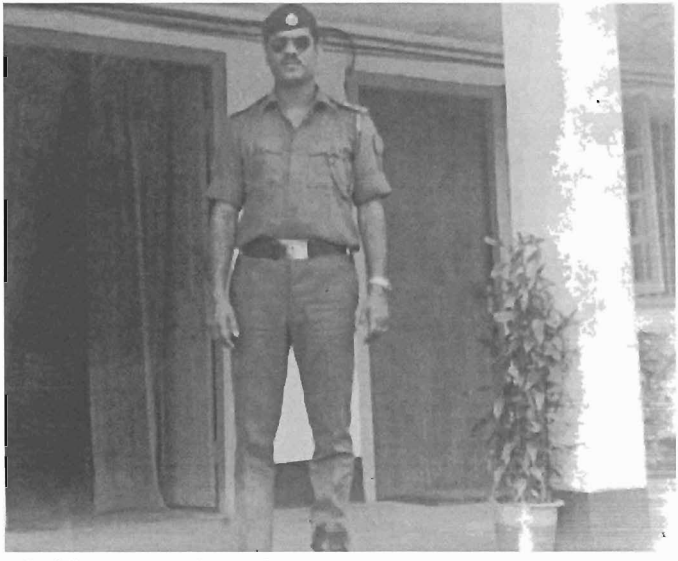

রক্ষীবাহিনীর সদর দপ্তরে নিজ কার্যালয়ের সামনে লেখক আনোয়ার উল আলম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিয়াউর রহমান দেশের প্রতিরক্ষাশক্তি বাড়ানোর লক্ষ্যে রক্ষীবাহিনীর সকল স্তরের কর্মকর্তা ও রক্ষী সদস্যদের সেনাবাহিনীতে নেওয়ার জোর দাবি উপস্থাপন করেন। এতে রাগান্বিত হয়ে খন্দকার মোশতাক তাঁর সঙ্গে বেশ রূঢ় আচরণ করেন। তার পরও জিয়া তাঁর দাবিতে অনড় থাকেন এবং যুক্তি দেখান, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পাঁচটি ব্রিগেডকে পাঁচটি ডিভিশনে উন্নীত করতে বহু বছর প্রয়োজন হবে। রিক্রুট ও প্রশিক্ষণ শেষে প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা, জেসিও, এনসিওসহ বিভিন্ন র‍্যাংকের সেনা তৈরি করতেও অনেক সময় লাগবে। যদি সেনাবাহিনীতে রক্ষীবাহিনীর ১৬টি ব্যাটালিয়ন নেওয়া যায়, তাহলে অনতিবিলম্বে পাঁচটি ডিভিশন গঠন করা সম্ভব হবে। অনেক আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের পর সিদ্ধান্ত হয় রক্ষীবাহিনী সম্পূর্ণভাবে সেনাবাহিনীতে একীভূত হবে।

১৯৭৫ সালের ৫ অক্টোবর সরকার 'The Jatiya Rakkhi Bahini (Absorption in the Army) Ordinance, 1975 জারি[৭] করে। তারপর শুরু হয় আত্তীকরণ-প্রক্রিয়া। এ সময় প্রশ্ন দেখা দেয় যে রক্ষীবাহিনীর সব সদস্য সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে চান কি না, তা খতিয়ে দেখা। এ জন্য সরোয়ার ও আমাকে দেশের প্রধান প্রধান রক্ষীবাহিনী-ক্যাম্পে পাঠানো হয়। বিমানবাহিনীর হেলিকপ্টার এবং সরকারের সেন্না প্লেনে আমরা বিভিন্ন ক্যাম্পে যাই। রক্ষীবাহিনীর সকল স্তরের সদস্যদের (লিডার, উপ-লিডার, সহ-লিডার ও রক্ষী সদস্য) সঙ্গে কথা বলি এবং তাঁদের মতামত নিই। প্রায় সবাই সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে আগ্রহ দেখান। এরপর ত্বরিত গতিতে রক্ষীবাহিনীর ইউনিটগুলোকে সেনাবাহিনীতে পাঠানো হয়। হঠাৎ সেনাবাহিনীর আকার বৃদ্ধি পাওয়ায় সেনাসদস্যরা, বিশেষ করে সেনা কর্মকর্তারা দারুণ খুশি হন। কারণ, রাতারাতি তাঁদের পদোন্নতির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। ওই সময় দেশের কোনো সংবাদমাধ্যমে এবং সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে রক্ষীবাহিনী সম্পর্কে কোনো বিরূপ মন্তব্য শোনা যায়নি। রক্ষীবাহিনীর অন্য সমালোচকেরা রক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেননি।

গেজেট প্রকাশের দু-তিন দিন পর সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান সরোয়ার ও আমাকে তাঁর অফিসে ডেকে পাঠান। তিনি জানতে চান, আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী? আমাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে তখনো আমরা ভাবিনি। আমাদের লক্ষ্য ছিল, রক্ষীবাহিনীর সকল স্তরের সদস্যের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা। সরোয়ার ও আমি ঠিক করেছিলাম, আমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেনাবাহিনীতে যোগ দেব না। আমাদের পদের সমপর্যায়ে সেনাবাহিনীতে যোগ দিলে অনেক অসুবিধা এবং ব্যতিক্রমধর্মী পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। এ বিষয়ে আমরা দুজনই সচেতন ছিলাম। তা ছাড়া আমাদের দুজনের অতীত অনেকটা এক রকম। ১৯৬২ সাল থেকে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন ও ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানে সক্রিয় অংশগ্রহণ, মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের ভূমিকা এবং জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠনে আমাদের অভিজ্ঞতা—সব মিলিয়ে আমরা আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। কিন্তু আমাদের পরিচালক এ এন এম নূরুজ্জামান ও জিয়াউর রহমান কয়েকটি কারণে আমাদের সেনাবাহিনীতে চেয়েছেন। আমরা দুজন সেনাবাহিনীর বাইরে থাকলে রক্ষী কর্মকর্তা ও সদস্যরা কিছুটা অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকবেন এবং তাঁদের মধ্যে কিছুটা অস্থিরতা বিরাজ করবে। কারণ, রক্ষীবাহিনী গঠনের শুরু থেকেই আমরা তাঁদের পাশে ছিলাম।

সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে সরোয়ার ও আমাকে তাঁর অফিসে আবার ডেকে পাঠান। আমরা দুজন তাঁর সঙ্গে দেখা করি। তিনি আমাদের দুজনকে সেনাবাহিনীতে লেফটেন্যান্ট কর্নেল র‍্যাংকে যোগ দিতে বলেন। আমরা তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হতে সংকোচ বোধ করছিলাম। কারণ, আমরা স্থির করেছিলাম যে আমরা বেসামরিক জীবনে ফিরে যাব। কিন্তু জিয়া ও নূরুজ্জামানের চাপে ব্যক্তিগত জীবনে ফিরে যেতে পারছি না। শেষ পর্যন্ত রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের স্বার্থে আমরা দুজন রাজি হই। এরপর প্রয়োজনীয় আদেশ জারি হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ অক্টোবর আমরা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগদান করি। তারপর শুরু হয় আমাদের ওরিয়েন্টেশন কোর্স। কার্যত ১৯৭২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি সরোয়ার ও আমি সরাসরি লেফটেন্যান্ট কর্নেল হিসেবে যোগদান করেছিলাম।

AMARBOI.COM

তথ্যনির্দেশ

১. আবদুল করিম খন্দকার (এ কে খন্দকার) বীর উত্তম : ১৯৭১ সালে পাকিস্তান বিমানবাহিনীর গ্রুপ ক্যাপ্টেন ও ঢাকার এয়ার বেসের উপপ্রধান। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে মে মাসে যুদ্ধে যোগ দেন। মুক্তিযুদ্ধকালে মুক্তিবাহিনীর উপপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখায় তাঁকে বীর উত্তম খেতাব প্রদান করে। পরে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী প্রধান, এয়ার ভাইস মার্শাল ও রাষ্ট্রদূত। বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২. সৈয়দ ফারুকুর রহমান : ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট ও পশ্চিম পাকিস্তানে (বর্তমান পাকিস্তান) কর্মরত ছিল। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর যুদ্ধের শেষ দিকে পালিয়ে ভারতে আসে। তাঁকে মুক্তিবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে ৮ নম্বর সেক্টরে নিয়োগ দেওয়া হয়।

৩. নূরুল ইসলাম মঞ্জুর : বরিশাল থেকে নির্বাচিত সাংসদ। বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভায় প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৭৫ সালে বাকশাল গঠনের পর যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী। ১৯৭৫ সালের ২১ জুলাই দুর্নীতির দায়ে পদচ্যুত।

৪. জিয়াউদ্দিন আহমদ : ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। তখন তাঁর পদবি ছিল লেফটেন্যান্ট। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাতে যোগ দেন। ৯ নম্বর সেক্টরের অধীন সুন্দরবন এলাকার অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৬ সালে সেনাবাহিনী থেকে বাধ্যতামূলক অবসর দেওয়া হয়। পরে তিনি জাসদের গণবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হন। সুন্দরবন এলাকায় জাসদ-গণবাহিনীর সংগঠন গড়ে তোলেন। বর্তমানে ব্যবসায়ী ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গবেষক।

৫. আমীন আহম্মেদ চৌধুরী বীর বিক্রম : পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালে চট্টগ্রাম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারে (ইবিআরসি) কর্মরত ছিলেন। এর কমান্ডেন্ট ছিলেন বাঙালি ব্রিগেডিয়ার এম আর মজুমদার। ব্রিগেডিয়ার মজুমদার চট্টগ্রাম অঞ্চলের আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক ছিলেন। পাকিস্তান সেনা কর্তৃপক্ষ ২৪ মার্চ কৌশলে এম আর মজুমদারকে হেলিকপ্টারে ঢাকায় নিয়ে যায়। এ সময় আমীন আহম্মেদ চৌধুরী তাঁর সঙ্গে ঢাকায় যান চিকিৎসার জন্য। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি ভারতে যান। নানা ঘটনার পর জুন মাসে তাঁকে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ব্রাভো কোম্পানির অধিনায়ক ছিলেন। ৩ আগস্ট শেরপুর জেলার নকশী বিওপির যুদ্ধে তিনি গুরুতর আহত হন। পরবর্তী সময়ে মেজর জেনারেল, রাষ্ট্রদূত ও সামরিকবিষয়ক বিশ্লেষক। মৃত্যু এপ্রিল ২০১৩।

৬. এম এ মতিন বীর প্রতীক : পরে মেজর জেনারেল। ২০০৭-০৮ সালে ফখরুদ্দীন আহমদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা।

৭. রক্ষীবাহিনীর বিলুপ্তি ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে আত্তীকরণ-সংক্রান্ত গেজেট। পরিশিষ্ট ১৫ দেখুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ নভেম্বর

আমরা যখন সেনাবাহিনীতে যোগ দিই তখন সেনাবাহিনীর ভেতর গুমোট এক অবস্থা। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী লেফটেন্যান্ট কর্নেল-মেজরদের আচরণে এবং রাষ্ট্রক্ষমতার সর্বক্ষেত্রে তাঁদের বিচরণে সেনাবাহিনীর মধ্যে, বিশেষ করে সুশৃঙ্খল সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে। খন্দকার মোশতাকের অনেক পদক্ষেপে সেনাবাহিনীর দেশপ্রেমিক কর্মকর্তা, বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তাদের অনেকেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তাঁদের প্রায় সবাই আশা করেছিলেন, নতুন সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীতে, বিশেষত কর্মকর্তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবেন; চেইন অব কমান্ড প্রতিষ্ঠা করবেন। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে ব্যর্থ হচ্ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের নিয়ন্ত্রণ করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। বরং দিনে দিনে সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ বিষয়ে তাঁদের সরাসরি হস্তক্ষেপ অপ্রতিরোধ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

এ পরিস্থিতিতে এ এন এম নূরুজ্জামান ও ৪৬ ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়াত জামিল একটা প্রতিরোধব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উদ্যোগ নেন। অবশ্য এসব ঘটনা আমি জানতাম না। পরে নূরুজ্জামানের কাছ থেকে শুনেছি। তিনি এ ব্যাপারে প্রথমে জিয়াউর রহমান ও খালেদ মোশাররফের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলেন। তিনি ভেবেছিলেন, প্রতিরোধব্যবস্থা সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের মধ্য থেকেই নেওয়া হলে সফল হবে। যদি রক্ষীবাহিনীর প্রাক্তন পরিচালক হিসেবে তিনি প্রতিরোধে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন, তাহলে হয়তো নানা ধরনের প্রশ্ন উঠবে। এ ব্যাপারে জিয়ার প্রতিক্রিয়া ছিল বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের কাছে দেওয়া তাঁর প্রতিক্রিয়ার মতো। অর্থাৎ তোমরা যা করার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করো, আমার আপত্তি নেই। অন্যদিকে খালেদ মোশাররফ এ ব্যাপারে বেশ আগ্রহী ছিলেন। কেননা, সেনাবাহিনীর ভেতরে সিজিএস হিসেবে তাঁর ক্ষমতা দিন দিন সীমিত হয়ে আসছিল। কারণ, তিনজন ঊর্ধ্বতন মুক্তিযোদ্ধা সেনা কর্মকর্তা মীর শওকত আলী, এম এ মঞ্জুর ও নূরুল ইসলাম[১] প্রকাশ্যে জিয়ার পক্ষ নিয়েছিলেন। এতে খালেদ মোশাররফের অবস্থান নড়বড়ে হয়ে উঠেছিল, যদিও তাঁর ওপর খন্দকার মোশতাক এবং এম এ জি ওসমানীর আশীর্বাদ ছিল।

অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি একদিন আমি সেনাবাহিনীর নতুন অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল নূরুল ইসলামের অফিসকক্ষে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। তখন তিনি ছিলেন না। হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হন শাফায়াত জামিল। তাঁর সঙ্গে আমার আগে থেকেই ঘনিষ্ঠতা ছিল। শাফায়াত জামিল আমাকে কক্ষের এক কোনায় নিয়ে যান। তারপর সরাসরি জিজ্ঞেস করেন, মোশতাকের অবৈধ সরকারকে উৎখাত করার ব্যাপারে আমার মতামত কী এবং কোনো উদ্যোগ নেওয়া হলে রক্ষীবাহিনীর প্রাক্তন সদস্যরা কী প্রতিক্রিয়া দেখাবে। আমি সাথে সাথে তাঁর সঙ্গে একমত হই এবং জানাই যে অবৈধ সরকারকে উচ্ছেদের যেকোনো উদ্যোগে আমরা সমর্থন জানাব; সরাসরি অংশগ্রহণ করব। আরও কিছু কথা হয়। সব কথা এখন মনে নেই। শুধু এটা মনে আছে, আমরা দুজন যখন অনুচ্চ স্বরে কথা বলছিলাম, ঠিক সে সময় নূরুল ইসলাম তাঁর কক্ষে প্রবেশ করেন। আমাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখে তিনি বেশ অবাক হন। তিনি সন্দেহ করেন, আমরা দুজন কোনো ষড়যন্ত্র করছি এবং প্রচ্ছন্ন হুমকি দেন যে সেনাপ্রধানের কাছে আমাদের দুজনের ব্যাপারে তিনি রিপোর্ট করবেন। আমরা তাঁর এ কথার প্রতিবাদ করিনি। বরং কথা না বাড়িয়ে অন্য বিষয়ে আলোচনা শুরু করি।

অক্টোবর মাসের শেষের দিকে নূরুজ্জামান আমাকে জানান যে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাঁরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। এখন শুধু দিনক্ষণ ঠিক করা বাকি। খালেদ মোশাররফ, শাফায়াত জামিল, খন্দকার নাজমুল হুদাসহ অনেক সামরিক কর্মকর্তা এই উদ্যোগের সঙ্গে থাকবেন। তিনি আমাকে প্রস্তুত থাকতে বলেন এবং জানান যে জিয়াউর রহমান হয়তো তাঁদের সঙ্গে থাকবেন না। তবে তিনি এই উদ্যোগের বিরোধিতাও করবেন না। জিয়ার একজন প্রিয় সেনা কর্মকর্তা মেজর হাফিজ উদ্দিন আহম্মদ[২] এই উদ্যোগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। হাফিজ উদ্দিন আহম্মদ শাফায়াত জামিলের অধীন ৪৬ ব্রিগেডের ব্রিগেড মেজর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিলেন। আমিও ভাবলাম, ঢাকার সবচেয়ে শক্তিশালী ইউনিট ৪৬ ব্রিগেড যদি সঙ্গে থাকে, তাহলে যেকোনো উদ্যোগ সফল হবে।

এ এন এম নূরুজ্জামান একপর্যায়ে এই মর্মে আমার মতামত জানতে চান যে, খন্দকার মোশতাককে পদচ্যুত করে কাকে রাষ্ট্রপতি করা যায়। তাঁর ছোট তালিকায় বিচারপতি আবু সাদত মোহাম্মদ সায়েম, প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং ড. এম এন হুদার নাম ছিল। এ বিষয়ে কোনো মতামত দেওয়ার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। তিনি আমাকে এ বিষয়ে চিন্তা করতে বলেন এবং কারও সঙ্গে কথা না বলার জন্য নির্দেশ দেন।

এর মধ্যে সরোয়ার ও আমাকে সেনাসদর মিলিটারি সেক্রেটারির অফিস থেকে নির্দেশ দেওয়া হয় কুমিল্লায় অবস্থিত বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিতে ওরিয়েন্টেশন কোর্সে যাওয়ার জন্য। আদেশে বলা হয়, ১ নভেম্বর যোগদান করতে হবে। এদিকে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার গোপন প্রস্তুতি চলছে আর আমাদের যেতে হবে কুমিল্লায়! চিন্তা করতে থাকলাম কুমিল্লা যাব কি যাব না। ৩০ অক্টোবর সকালে আমি এ এন এম নূরুজ্জামানের বাসায় গিয়ে জানতে চাই, কবে অভ্যুত্থানের দিনক্ষণ ঠিক করা হয়েছে। তিনি বলেন, মোটামুটি ২ নভেম্বর দিবাগত রাতে অভ্যুত্থান শুরু হবে। সরোয়ার ও আমি জানতে চাই, আমরা ঢাকায় থাকব, নাকি সেনাসদরের নির্দেশ মোতাবেক কুমিল্লায় যাব। তিনি আমাদের কুমিল্লা যাওয়ার নির্দেশ দেন এবং বলেন অভ্যুত্থান সফল হলে তিনি আমাদের ফোন করে কী করতে হবে জানাবেন। তিনি আরও বলেন, কুমিল্লায় মেজর আনোয়ার হোসেন[৩] আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন। অভ্যুত্থান ব্যর্থ হলে খালেদ মোশাররফসহ তাঁরা কুমিল্লায় আসবেন এবং প্রয়োজনে সীমান্তের ওপারে যাবেন।

এদিন বিকেলবেলা সংসদ ভবন এলাকায় টাঙ্গাইলের কয়জন সংসদ সদস্যের সঙ্গে দেখা আমার হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন শামসুর রহমান খান (শাহজাহান), মির্জা তোফাজ্জল হোসেন, হুমায়ুন খালিদ ও ফজলুর রহমান খান (ফারুক)। তাঁরা আমার কাছে জানতে চান কোনো প্রতিরোধ হবে কি না। আমি তাঁদের বলি, দু-তিন দিনের মধ্যে কিছু হতে যাচ্ছে। তাঁরা যেন প্রস্তুত থাকেন। আমি ভেবেছিলাম, ৩ নভেম্বরের সেনা অভ্যুত্থানের পর আওয়ামী লীগ লাখ লাখ জনতা নিয়ে রাজপথে নামবে। কিন্তু আমার সে অনুমান ভুল ছিল। তারা পথে নামেনি। বঙ্গবন্ধুর বাড়ির কাছ থেকে একটা মিছিল অবশ্য রাজপথে বেরিয়েছিল। পরে জেনেছি, মিছিলটি আওয়ামী লীগের উদ্যোগে হয়নি, হয়েছে প্রগতিশীল কয়েকটি রাজনৈতিক দল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশেষত সিপিবি, ন্যাপ (মোজাফ্ফর) ও ছাত্রসংগঠন ছাত্র ইউনিয়নের মতিয়া গ্রুপ) উদ্যোগে। এ মিছিলে খালেদ মোশাররফের মা ও ভাই রাশেদ মোশাররফ যোগ দেন। তাঁদের দুজনের কারণে লোকে মনে করেছিল এটি আওয়ামী লীগের উদ্যোগে হয়েছে। এর পরিণতি শেষ পর্যন্ত ভালো হয়নি। একশ্রেণীর লোক প্রচার করে, মিছিলকারীরা ভারতের এজেন্ট এবং তাদের মধ্যে ভারত থেকে গোপনে আসা লোকজন ছিল। খালেদ মোশাররফকে একশ্রেণীর লোক সরাসরি ভারতের এজেন্ট হিসেবে চিহ্নিত করে।

৩১ অক্টোবর সরোয়ার ও আমি রাতের ট্রেনে কুমিল্লার উদ্দেশে রওনা হই। ১ নভেম্বর সকালে বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমির চিফ ইনস্ট্রাক্টর লেফটেন্যান্ট কর্নেল সাদেকুর রহমান চৌধুরীর[৪] কাছে রিপোর্ট করি। এই সময় একাডেমির অ্যাডজুট্যান্ট ছিলেন ক্যাপ্টেন সাইদ আহমেদ[৫] বীর প্রতীক। ঢাকা সেনানিবাসে আমরা একটা থমথমে ভাব দেখে এসেছি, কুমিল্লা এসেও দেখি একই অবস্থা। আমাদের জন্য অসুবিধা হলো, আমরা কুমিল্লায়, বিশেষত একাডেমির তেমন কাউকে চিনতাম না। এ এন এম নূরুজ্জামান বলেছিলেন আনোয়ার হোসেন নামের একজন মেজর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। বিকেলবেলা একাডেমির অফিসার্স মেসে সরোয়ার ও আমি চা খাচ্ছিলাম। মেসে তখন দু-তিনজন সেনা কর্মকর্তা ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। এ সময় একজন সেনা কর্মকর্তা সেখানে উপস্থিত হন। পোশাকে র‍্যাংক ও নামসংবলিত ব্যাজ দেখে বুঝতে পারি তিনি মেজর আনোয়ার হোসেন। তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বললেন না। সংগত কারণে আমিও তাঁর সঙ্গে কথা বলিনি। ভাবলাম, তিনি হয়তো আমাদের চেহারা দেখে গেলেন, প্রয়োজনে যাতে চিনতে অসুবিধা না হয়।

৩ নভেম্বর সকালে ঘুম থেকে উঠেই আমি একাডেমির অফিসার্স মেসে উপস্থিত হই। সরোয়ারও আমার সঙ্গে ছিল। মেসে আরও অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে চাপা গুঞ্জন লক্ষ করলাম। জানতে পারলাম, ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটে গেছে এবং একাডেমির ইনস্ট্রাক্টর মেজর নাসিরউদ্দিন আহমেদ[৬] খবর পেয়েই ঢাকা গেছেন। খবরটা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু সেনা কর্মকর্তা মেসে এলেন। সরোয়ার ও আমি ভাব দেখালাম—আমরা কিছু জানি না। মেজর আনোয়ারের আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা। তাঁকে কোথাও দেখা গেল না। বেলা ১১টার দিকে আমরা দুজন সাদেকুর রহমান চৌধুরীর কামরায় বসে চা খাচ্ছি, এ সময় কুমিল্লার ব্রিগেড কমান্ডারের অফিস থেকে তাঁর কাছে খোঁজ করা হয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনোয়ার উল আলম আর সরোয়ার হোসেন মোল্লা আছে কি না। সাদেকুর রহমান চৌধুরী আমাদের ব্রিগেড কমান্ডারের অফিসে যেতে বলেন। তিনি একটা গাড়ি দেন। আমরা ওই গাড়িতে ব্রিগেড কমান্ডারের অফিসে যাই। ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল আমজাদ খান চৌধুরী[৭] আমাদের দেখেই বলেন, 'আপনারা এসেছেন আর আমার সঙ্গে দেখা করেননি!' ভাবখানা এমন যে, দেখা করলে তিনি আমাদের অনেক যত্ন নিতেন। তিনি জানান, বঙ্গভবন থেকে খালেদ মোশাররফ ফোন করেছিলেন। তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চান। আমজাদ খান চৌধুরী তাঁর ফোন দিয়ে সংযোগ লাগিয়ে আমার হাতে রিসিভার তুলে দেন। খালেদ মোশাররফ এবং এ এন এম নূরুজ্জামান আমার সঙ্গে কথা বলেন। তাঁরা জানালেন, তাঁদের উদ্যোগ সফল হয়েছে। এখন আমাদের করণীয় কিছু নেই। তবে নির্দেশ দিলেন, আমরা যেন সব সময় সতর্ক অবস্থায় থাকি।

খালেদ মোশাররফ আমার সঙ্গে কথা বলায় আমজাদ খান চৌধুরী আমাদের দুজনকে ভিআইপি হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করেন। তিনি সাদেকুর রহমান চৌধুরীকে নির্দেশ দিলেন আমাদের যেন কোনো অসুবিধা না হয়। আমরা একাডেমি অফিসে গেলাম। সাদেকুর রহমান চৌধুরীর কক্ষে যাওয়ার পর তিনি ওই দিন রাতে তাঁর বাসায় খাওয়ার দাওয়াত দেন। পরে আমজাদ খান চৌধুরীও একদিন নৈশভোজে দাওয়াত করেন আমাদের। আমরা কুমিল্লা আসার পর কেউ আমাদের খোঁজখবর নেয়নি। আমাদের দুটো কক্ষে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সাদেকুর রহমান চৌধুরী একাডেমির অফিসার্স মেসে ভিআইপি রুম খুলে দিতে কোয়ার্টার মাস্টার মেজর আহসানকে[৮] নির্দেশ দেন। ভিআইপি রুমে থাকার প্রস্তাব আমরা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করি।

৩ নভেম্বর সারা দিন আমরা তেমন কোনো খবর পাইনি। সন্ধ্যাবেলা আমি ও সরোয়ার নৈশভোজে যোগ দিতে সাদেকুর রহমান চৌধুরীর বাসায় যাই। সেখানে জানতে পারি, জিয়াউর রহমানকে তাঁর বাসায় অন্তরীণ করে রাখা হয়েছে। আমি একটু অবাক হলাম, কারণ তাঁকে গ্রেপ্তার করার পরিকল্পনা ছিল না। নৈশভোজে উপস্থিত কয়েকজন সেনা কর্মকর্তা ঢাকার খবর সংগ্রহ করার চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু পরিষ্কার কিছু তাঁরা জানতে পারেননি।

পরবর্তী দুই দিন আমরা কী করব, কী করা উচিত ইত্যাদি নিয়ে বেশ অস্থিরতার মধ্যে কাটাই। খালেদ মোশাররফ আমাকে বলেছিলেন আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো করণীয় নেই। তার পরও আমরা চিন্তা করতে থাকি। ভিন্ন ভিন্ন সূত্র থেকে আমরা ভিন্ন ভিন্ন খবর পাচ্ছিলাম, যা শুনে আমাদের মনে কেমন যেন সংশয় দেখা দেয়। ৩ নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে চার জাতীয় নেতাকে হত্যার বিষয়টি আমাদের মনে আরও সংশয় সৃষ্টি করে। ব্যাপারটা বিশ্বাস করার মতো ছিল না। তাঁদের কারা হত্যা করেছে আমরা তখনো জানতে পারিনি। সৈয়দ নজরুল ইসলামের পুত্র সৈয়দ সাফায়াতুল ইসলাম[৯] তখন মিলিটারি একাডেমিতে প্রশিক্ষণরত ছিলেন। তাঁকে সমবেদনা জানানোর ভাষা আমাদের ছিল না। যাঁদের নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হয়েছে তাঁদের জেলখানার ভেতরে নির্মমভাবে হত্যা করা হলো, জাতির জন্য এর চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার আর কী হতে পারে!

খন্দকার মোশতাককে গ্রেপ্তার না করা, জিয়াউর রহমানকে সেনাপ্রধানের পদ থেকে পদত্যাগে বাধ্য করে খালেদ মোশাররফের সেনাপ্রধান হওয়া ও মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতি নেওয়া, রেডিও ও টেলিভিশন বন্ধ রাখা, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিদেশে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া, সংসদ ভেঙে দেওয়া ইত্যাদি পরিকল্পনায় ছিল না। এ ছাড়া খালেদ মোশাররফের মা ও ভাইয়ের মিছিলে যোগ দেওয়ার ঘটনা আমাদের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। কথা ছিল, আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে মিছিল বের করার। আর মিছিলে খালেদ মোশাররফের মা বা ভাইয়ের থাকার কথা ছিল না। এ কারণেই সরোয়ার ও আমি চিন্তা করতে থাকি। নানা বিভ্রান্তির মধ্যে আমাদের সময় কাটতে থাকে। পরিষ্কার তথ্য জানার জন্য ঢাকায় যোগাযোগ করব, তার সুযোগ ছিল না। চারদিক থেকে খবর আসতে থাকে যে সেনাবাহিনীর বিভিন্ন স্তরে চাপা অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠছে। সঠিক তথ্যের অভাবেই এ অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছিল বলে আমরা ধারণা করছিলাম।

পরে জেনেছি, খালেদ মোশাররফ শুধু সেনাপ্রধান হয়েই খুশি ছিলেন না, তিনি খন্দকার মোশতাক ও এম এ জি ওসমানীর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে রাষ্ট্রপতির পদও দখল করতে চেয়েছিলেন। সে জন্য আলাপ-আলোচনায় তিনি অনেক সময় নষ্ট করেন। অথচ তাঁর সহকর্মীরা চেয়েছিলেন খন্দকার মোশতাককে গ্রেপ্তার বা হত্যা করতে। ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সেনাবাহিনীর চেইন অব কমান্ড ফিরিয়ে আনা। এর পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থা নেওয়া এবং খন্দকার মোশতাককে রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদচ্যুত করা। প্রয়োজনে তাঁর বিরুদ্ধেও চরম ব্যবস্থা নেওয়া। কিন্তু সেটা হয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার ব্যক্তিগত ধারণা, খালেদ মোশাররফ তাঁর গোপন ব্যক্তিগত কৌশল ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে অভ্যুত্থানের মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হন। এতে তিনি শুধু নিজের বিপদ ডেকে আনেননি, তাঁর সঙ্গীদেরও বিপদের দিকে ঠেলে দেন। নিজে একজন দেশপ্রেমিক ও অসাধারণ মুক্তিযোদ্ধা হয়েও দুর্নাম কুড়ান এবং জীবন দেন ভারতের চর হিসেবে আখ্যায়িত হয়ে। যদিও তিনি ছিলেন চরম ভারতবিদ্বেষী। তাঁর সঙ্গে যাঁদের ঘনিষ্ঠতা ছিল তাঁরা এটা ভালো করেই জানতেন।

অভ্যুত্থান ব্যর্থ হলে খালেদ মোশাররফ কর্নেল খন্দকার নাজমুল হুদা ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল এ টি এম হায়দারকে[১০] সঙ্গে নিয়ে শেরেবাংলা নগরে অবস্থানরত সেনাবাহিনীর ১০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ইউনিটে যান। সেনাবাহিনীর সঙ্গে রক্ষীবাহিনীর আত্তীকরণের পর রক্ষীবাহিনীর প্রধান কার্যালয় সেনাবাহিনীর মিনি ব্যারাক হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। ওখানে ছিল ১০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অবস্থান। এই রেজিমেন্ট খালেদ মোশাররফের নির্দেশে রংপুর থেকে এসে সেখানে অবস্থান নিয়েছিল। খালেদ মোশাররফ ওই রেজিমেন্টের সদর দপ্তরকে নিরাপদ মনে করে খন্দকার নাজমুল হুদা এবং এ টি এম হায়দারকে নিয়ে সেখানে যান। দুর্ভাগ্যের বিষয়, খালেদ মোশাররফ যে স্থানকে নিরাপদ মনে করেছিলেন, সেখানেই তিনি নিহত হন। তাঁর সঙ্গে নিহত হন খন্দকার নাজমুল হুদা ও এ টি এম হায়দারও। পরে আমি জানতে পারি, এ টি এম হায়দার খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থান-প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তিনি বান্দরবানে কর্মরত ছিলেন। বাবার টেলিগ্রাম পেয়ে ওই সময় ঢাকায় আসেন। এর মধ্যে অভ্যুত্থান ঘটে যায়। ৬ নভেম্বর সন্ধ্যায় খালেদ মোশাররফের সঙ্গে তিনি দেখা করতে যান এবং তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন।

খালেদ মোশাররফের অন্য দুই সহযোগী বেঁচে যান। অভ্যুত্থান যখন ব্যর্থ হওয়ার পর্যায়ে তখন এ এন এম নূরুজ্জামান প্রথমে আত্মগোপন করেন, পরে ভারতে চলে যান। শাফায়াত জামিল বঙ্গভবনের দেয়াল টপকে সরে পড়ার সময় আহত হয়ে মুন্সিগঞ্জে যান। সেখানে হাসপাতালে ভর্তি হন এবং সরাসরি জিয়াউর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। অন্যরা এদিক-সেদিক গিয়ে জীবন বাঁচান।

এদিকে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের গণবাহিনী ও কর্নেল আবু তাহেরের বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা যে সেনাবাহিনীর ভেতরে বিপ্লব গড়ে তুলতে কাজ করেছিল, তা স্পষ্ট হয়। এই সুযোগে বন্দী জিয়াউর রহমানকে সামনে এনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'একটা একটা অফিসার ধরো/ সকাল-বিকেল নাশতা করো'—এই স্লোগান তুলে কর্নেল তাহের ৭ নভেম্বর সিপাহি বিপ্লব সংগঠিত করেন। জাসদের গণবাহিনী ও আবু তাহেরের বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা এর মাধ্যমে মোটেই লাভবান হয়নি। পরবর্তী সময়ে তারাও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। একমাত্র লাভবান হন জিয়াউর রহমান।

৭ নভেম্বর জিয়া মুক্ত হন সত্য, তবে প্রাণ হারাতে থাকেন অসংখ্য সেনা কর্মকর্তা। কয়েকটি ক্ষেত্রে তাঁদের পরিবারও রেহাই পায়নি। ঢাকার বিপ্লবের ঢেউ কুমিল্লাতেও এসে পড়ে। কুমিল্লায় কোনো কর্মকর্তাকে হত্যা করা হয়নি, তবে অনেককে অপমান করা হয়েছে। আমরা বিএমএ অফিসার্স মেসে বসে অন্যদের সঙ্গে প্রহর গুনছিলাম কখন আমাদের ওপর আঘাত আসে। আমাদের চিন্তা এ এন এম নূরুজ্জামানের কী হলো? তা ছাড়া আমাদের অর্থাৎ সাবেক রক্ষীবাহিনীর একজন কর্মকর্তা (রক্ষীবাহিনীতে পদবি ছিল লিডার) ক্যাপ্টেন দীপককুমার হালদার বঙ্গভবনে ডিউটিতে ছিলেন। তাঁরই বা খবর কী? পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করা বিপজ্জনক ছিল।

৩ থেকে ৬ নভেম্বর সরোয়ার ও আমি ভিআইপির মতো কুমিল্লা সেনানিবাসে ছিলাম। ৭ তারিখে আমরা আবার হয়ে গেলাম অতি সাধারণ। আমজাদ খান চৌধুরী ও সাদেকুর রহমান চৌধুরী আমাদের কোনো খবরই নেননি। অন্যান্য সেনা কর্মকর্তাও আমাদের থেকে দূরে দূরে থাকলেন। মানুষের চেহারা ঘটনাক্রমে কত দ্রুত বদলে যায় আমরা স্বচক্ষে দেখতে পেলাম। ৮ নভেম্বর কুমিল্লা সেনানিবাসের ফিল্ড ইন্টেলিজেন্স ইউনিট থেকে রিপোর্ট যায়, সরোয়ার ও আমি সীমান্ত পার হয়ে আগরতলার দিকে গেছি। অথচ আমরা দুজন তখন বহাল তবিয়তে বিএমএ অফিসার্স মেসেই আছি।

এদিকে আমার কোনো খবর না পেয়ে আমার স্ত্রী ডা. সাঈদা খান ৯ নভেম্বর বিমানযোগে কুমিল্লা আসেন। একই প্লেনে আসেন বিএমএর ইন্সট্রাক্টর মেজর সৈয়দ মিজানুর রহমান[১১]। সৈয়দ মিজান আমার স্ত্রীকে বিএমএ অফিসার্স মেসে নিয়ে আসেন। তখন হঠাৎ আমাদের জীবনটা বিপদের মুখে পড়ে যায়, পড়ে যায় অনিশ্চয়তার মধ্যে। তাই পরের দিন বিমানে করে স্ত্রীকে ঢাকা পাঠিয়ে দিই। এ নিয়েও গোয়েন্দা রিপোর্ট যায় সেনাসদরে। এ মর্মে রিপোর্ট দেওয়া হয় যে, আমার স্ত্রীও আমাদের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত।

৭ নভেম্বর জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রক্ষমতায় এসেই সিপাহি বিপ্লবকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করেন। এ জন্য ৯ নভেম্বর থেকে তিনি হেলিকপ্টারে করে বিভিন্ন সেনানিবাস সফর করতে শুরু করেন। ১১ নভেম্বর তিনি কুমিল্লা আসেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্যারিসন সিনেমা হলে তিনি সেনানিবাসের সব কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলেন, তখন সরোয়ার ও আমি সামনের দিকেই বসা ছিলাম। জিয়া ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে সেনাসদস্যদের উদ্দেশে ভাষণ দিয়ে ব্রিগেড কমান্ডারের অফিসে বসেন। সেখানে তিনি 'শহীদকে' ডেকে আনতে ব্রিগেড কমান্ডার আমজাদ খান চৌধুরীকে নির্দেশ দেন। আমজাদ খান চৌধুরী কল্পনাও করেননি যে জিয়া আমাকে ডাকবেন। আমার ডাক নাম যে শহীদ তা অবশ্য আমজাদ খান চৌধুরী জানতেন না। তিনি জিয়াউর রহমানকে যে জিজ্ঞেস করবেন, শহীদ কে, সে সাহসও তাঁর ছিল না। তিনি তাঁর কামরা থেকে বের হয়ে আশপাশে যত সেনা কর্মকর্তা ছিলেন সবাইকে জিজ্ঞেস করেন, শহীদ কে? এ সময় সাদেকুর রহমান চৌধুরী ধারণা করেন, আমাদের দুজনের (সরোয়ার ও আমি) কারও ডাক নাম শহীদ। তৎক্ষণাৎ তিনি বিএমএ মেসে এসে সরোয়ার ও আমাকে জিয়াউর রহমানের কাছে নিয়ে যান।

জিয়াউর রহমান আমাদের বসতে বলেন। ফলে আমজাদ খান চৌধুরী ও সাদেকুর রহমান চৌধুরী কক্ষের এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন। জিয়া আমি কেমন আছি, আমার স্ত্রী কোথায় এবং ভালো আছে কি না, খোঁজখবর নেন। জিজ্ঞেস করেন, আমরা দুজন পরিবারের সদস্যদের দেখতে ঢাকা যেতে চাই কি না ইত্যাদি। এরপর জিয়াউর রহমান ব্রিগেড কমান্ডার আমজাদ খান চৌধুরীকে আমাদের ঢাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়ে ঢাকা চলে যান।

পরদিন সকালে দেখি একাডেমি অফিসার্স মেসে দুটি জিপ নিয়ে সাদেকুর রহমান চৌধুরী নিজেই হাজির। আমাদের দুজনের ঢাকা যাওয়ার জন্য দুটি জিপ নিয়ে এসেছেন, যাতে আমরা আরামে যেতে পারি। জিয়া আমাদের সঙ্গে কথা বলে গেছেন, সে জন্য অতিসাধারণ কর্মকর্তা থেকে আবারও আমরা ভিআইপি বনে গেলাম। সাদেকুর রহমান চৌধুরী একটা গাড়ি নিজে চালালেন। সেটাতে আমি এবং অন্য গাড়িতে সরোয়ার। দুই জিপে আমরা ঢাকার উদ্দেশে রওনা হলাম। কয়েক দিন ঢাকায় থেকে আবার ওই একই গাড়িতে কুমিল্লা ফিরে গেলাম। এর কিছুদিন পর আমাকে সেনাবাহিনীর নতুন চিফ অব দ্য জেনারেল স্টাফ ব্রিগেডিয়ার এম এ মঞ্জুরের অধীনে জিএস ব্রাঞ্চ এবং সরোয়ারকে অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল ব্রিগেডিয়ার নূরুল ইসলামের অধীনে এজিএস ব্রাঞ্চে বদলি করা হয়।

৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের ব্যর্থতা নিয়ে যখন ভাবি, তখন এর কারণগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অভ্যুত্থানের মূল লক্ষ্য ছিল খন্দকার মোশতাককে উৎখাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করা আর বঙ্গবন্ধুর খুনিদের শায়েস্তা করা। লক্ষ্যগুলো পুরোপুরি সফল না হলেও খানিকটা সফল হয়েছিল তাঁদের ক্ষমতাচ্যুত করার ভেতর দিয়ে। কিন্তু খালেদ মোশাররফের আকাঙ্ক্ষা, জিয়াউর রহমানকে অন্তরীণ রেখে তাঁর পক্ষে জনমত সৃষ্টি করা, খন্দকার মোশতাককে আটক না করে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করা, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের আটক ও শাস্তির ব্যবস্থা না করে বিদেশে পাঠানো, সংবাদমাধ্যমে কোনো খবর সরবরাহ না করে জনমনে ও সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে সংশয় ও উত্তেজনা সৃষ্টি করা, গুজব ছড়ানোর সুযোগ দেওয়া এবং বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা ও গণবাহিনীর তৎপরতা চলতে দেওয়াতেই যে অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়, এতে কারও সন্দেহ থাকার কথা নয়। ফলে খালেদ মোশাররফসহ অনেক সেনা কর্মকর্তাকে চরম মূল্য দিতে হয়। অথচ অভ্যুত্থানের মূল লক্ষ্যে নিঃস্বার্থভাবে অনুগত থেকে ত্বরিত গতিতে ব্যবস্থা নিলে অভ্যুত্থান ব্যর্থ হতো না।

জাতীয় রক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সমালোচনা করে থাকেন তাঁরাই, যাঁরা এই বাহিনী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর কারণ শুধু একটাই, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবার হত্যা করা হলো, কিন্তু জাতীয় রক্ষীবাহিনী কিছু করল না। রক্ষীবাহিনীর পক্ষ থেকে আমরা কী কী করেছিলাম, তার বিবরণ সংক্ষিপ্ত আকারে আগেই দিয়েছি। সেগুলোর মূল্যায়ন তাঁরা কীভাবে করবেন বা আদৌ করবেন কি না, আমি জানি না। তবে ২০০৯ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি সংঘটিত পিলখানা হত্যাযজ্ঞ প্রতিহত করতে আওয়ামী লীগ সরকারের ব্যর্থতা বিশ্লেষণ করলে তা ১৫ আগস্টের সামগ্রিক পরিস্থিতি মূল্যায়নে সহায়ক হতে পারে। আসল কথা হচ্ছে, সারা বিশ্বে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে সার্থকভাবে রাষ্ট্রনায়ক-রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বিধান করা হচ্ছে, সেগুলো খুব একটা আলোচনায় আসে না, আসে শুধু ব্যর্থতার কথা। যেমন, পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আব্রাহাম লিংকন ও জন এফ কেনেডিকে রক্ষা করতে পারেনি; ভারত পারেনি মহাত্মা গান্ধী ও ইন্দিরা গান্ধীকে নিরাপত্তা দিতে; চিলির সালভেদর আয়েন্দেকে রক্ষা করা যায়নি; শ্রীলঙ্কার বন্দরনায়েককেও রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। ঠিক তেমনি সবাই ব্যর্থ হয়েছে বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রক্ষা করতে। সেদিন তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে না থেকেও ব্যর্থতার দায়ভার আমাদের নিতে হয়েছে।

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রক্ষা করতে পারেনি ৫৬ জন বিডিআর কর্মকর্তাকে। সেদিন প্রধানমন্ত্রী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীর অধীনে ছিল অনুগত সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, পুলিশ বাহিনী, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। ছিল যুদ্ধবিমান, আর্টিলারি কামান, ট্যাংক, ভারী অস্ত্র, গোলাবারুদসহ সবকিছু। তিন বাহিনীর প্রধানেরা প্রধানমন্ত্রীর আদেশ বা সরকারি সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় তাঁর সরকারি বাসভবনে উপস্থিত ছিলেন। এর পাশাপাশি ছিল জনগণের পূর্ণ সমর্থন। তার পরও ওই ৫৬ জন সেনা কর্মকর্তাকে সরকার রক্ষা করতে পারেনি। বরং যারা নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে সরকার তাদের সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা দিয়েছে। হত্যাকারীদের সঙ্গে আপস করেছে, ছাড় দিয়েছে শুধু বিদ্রোহীদের অস্ত্র সংবরণ করাতে, বিদ্রোহ দমন করতে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সেই কলঙ্কজনক দিনে এর উল্টো পরিস্থিতি ছিল। কোনো দিক থেকে সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। সেদিন আমরা এমন পরিস্থিতিতে পড়েছিলাম যে রাষ্ট্রপতি নিহত হওয়ার সময় প্রতিরোধব্যবস্থা নিতে উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীসহ সরকারের নেতারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন না; পুরো সরকারব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল; সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী আমাদের সঙ্গে ছিল না; বিডিআর, পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো আমাদের সঙ্গে ছিল না; জনগণের কোনো সমর্থন আমরা পাইনি; সংবাদপত্র, ইলেকট্রনিক মিডিয়া আমাদের সঙ্গে ছিল না; সরকারি দল বাকশাল বা আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা আমাদের সঙ্গে ছিলেন না এবং আমাদের নিজস্ব কোনো শক্তি বা যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। তাহলে আমরা সার্থকভাবে কী করতে পারতাম! আমাদের সমালোচনাকারীরা এখন হয়তো তা অনুধাবন করতে পারবেন।

AMARBOI.COM

তথ্যনির্দেশ

১. নূরুল ইসলাম : ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন এবং দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে কর্মরত ছিলেন। মার্চে তিনি তাঁর ইউনিটের সঙ্গে ময়মনসিংহে ছিলেন। ২৭ মার্চ দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের উপ-অধিনায়ক কে এম সফিউল্লাহ বিদ্রোহ করে ২৯ মার্চ ময়মনসিংহে পৌঁছালে তিনি তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। মুক্তিযুদ্ধকালে মুক্তিবাহিনীর সদর দপ্তরে কাজ করেন। ১৯৭৫ সালে কর্নেল ছিলেন। পরবর্তী সময়ে মেজর জেনারেল। তিনি নূরুল ইসলাম শিশু নামে সমধিক পরিচিত।

২. হাফিজ উদ্দিন আহম্মদ বীর বিক্রম : ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন ও প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সক্রিয়ভাবে অংশ নেন তাতে। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা অনন্য। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখায় তাঁকে বীর বিক্রম খেতাবে ভূষিত করে। বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, বিএনপির সঙ্গে যুক্ত। ২০০১-২০০৬ সালে মন্ত্রী।

৩. মেজর আনোয়ার হোসেন: পরে মেজর জেনারেল।

৪. সাদেকুর রহমান চৌধুরী: পরে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মিলিটারি সেক্রেটারি এবং মেজর জেনারেল।

৫. ক্যাপ্টেন সাইদ আহমেদ বীর প্রতীক: পরে মেজর জেনারেল।

৬. মেজর নাসির উদ্দিন আহমেদ: মুক্তিযোদ্ধা। বর্তমানে ব্যবসায়ী।

৭. আমজাদ খান চৌধুরী: পরে মেজর জেনারেল। বর্তমানে ব্যবসায়ী। 'প্রাণ' ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা।

৮. আহসান উদ্দিন: পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল। ১৯৮১ সালে প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের পদস্থ কর্মকর্তা। একই বছর ৩০ মে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সঙ্গে চট্টগ্রামে নিহত।

৯. সৈয়দ সাফায়াতুল ইসলাম: পরে মেজর জেনারেল।

১০. লেফটেন্যান্ট কর্নেল এ টি এম হায়দার: ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন ও কুমিল্লা সেনানিবাসে কমান্ডো ব্যাটালিয়নে কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে কুমিল্লা সেনানিবাস থেকে পালিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গে যোগ দেন। গেরিলাযুদ্ধ সংগঠনে তাঁর ভূমিকা অনন্য। মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে তিনি ২ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার তাঁকে বীর উত্তম খেতাবে ভূষিত করে। পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদে উন্নীত হন।

১১. মেজর সৈয়দ মিজানুর রহমান: মুক্তিযোদ্ধা। পরে ব্যবসায়ী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষ কথা

সময়ের প্রয়োজনে, দেশের কল্যাণে ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সদ্য স্বাধীন দেশে বাংলাদেশ সরকার গঠন করেছিল জাতীয় রক্ষীবাহিনী। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের পর দেশটি শত্রুমুক্ত হলো এবং আমরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করলাম। কিন্তু যে দেশটা পেলাম, তা ছিল সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। সুতরাং প্রথমেই প্রয়োজন হয়ে পড়ে জরুরি ভিত্তিতে দেশটাকে পুনর্গঠন করা। পুনর্গঠনের কাজ শুরু করতে গিয়ে দেখা গেল, চারদিকে বিভিন্ন জনের কাছে বহু অস্ত্রশস্ত্র রয়ে গেছে। এই অবৈধ অস্ত্রধারীদের মধ্যে ছিল রাজাকার, আলবদর ও আলশামস বাহিনীর কুখ্যাত সদস্য, যারা স্বাধীনতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বর্বর পাকিস্তানি সেনাদের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে; মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছে। ছিল চরম বামপন্থী সন্ত্রাসবাদী দলগুলো, যারা বাংলাদেশকে মানতে পারেনি, এদের সঙ্গে পরে যোগ দেয় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ও তাদের গণবাহিনী।

জাতীয় রক্ষীবাহিনী জাতির একটি কঠিন সময়ে সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে অস্ত্র উদ্ধার করে এবং সন্ত্রাসী দলগুলোকে দমন করে অনেকটা প্রশংসিত হয়েছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আলোচিত ও সমালোচিত হয়েছিল। রক্ষীবাহিনী মাত্র তিন বছর দুই মাস দায়িত্ব পালন করেছে। এই স্বল্প সময়ে বাহিনী গঠন-প্রক্রিয়া ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পাশাপাশি অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, সন্ত্রাস দমন এবং সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের পর উদ্ভূত শান্তিশৃঙ্খলা-পরিস্থিতি মোকাবিলায় রক্ষী সদস্যরা যে অসাধারণ অবদান রেখেছেন, তা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। স্বল্প সময়ে রক্ষী সদস্যরা দেশপ্রেম, সততা, নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলার যে উদাহরণ স্থাপন করেন, তা পরবর্তী সময়ের সব বাহিনীর জন্যই শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাতীয় রক্ষীবাহিনী নিয়ে যতই আলোচনা-সমালোচনা হোক, বাংলাদেশে বহু দিন এর কার্যক্রমের প্রভাব থাকবে। কারণ, দেখা গেছে, দেশে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং সন্ত্রাসী তৎপরতা মোকাবিলা করতে গিয়ে সরকার যখনই হিমশিম খেয়েছে, তখনই রক্ষীবাহিনীর অভাব অনুভব করেছে। এটা সব সরকারের বেলায়ই সত্য। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে রক্ষীবাহিনী পুনরায় গঠন করতে চায়নি। সে জন্য বিকল্প হিসেবে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নামে রক্ষীবাহিনীর মতোই আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন ও র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন গঠন করে সন্ত্রাসী তৎপরতা ও অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা-সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবিলা করার চেষ্টা করেছে।

দেশের বর্তমান সন্ত্রাসময় পরিস্থিতি ও ধর্মীয় মৌলবাদের উত্থান বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কার হয়ে আসবে যে, জাতীয় রক্ষীবাহিনী যদি ১৯৭৫ সালে বিলুপ্ত করা না হতো, তাহলে এই পরিস্থিতি কখনো তৈরি হতে পারত না। কারণ, আর কিছুটা সময় পেলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গঠিত রক্ষীবাহিনী জামায়াত-শিবিরের নেতৃত্বে গঠিত রাজাকার, আলবদর ও আলশামস বাহিনীর অপতৎপরতা চিরকালের জন্য দমন করতে সক্ষম হতো। এসব অপশক্তি বাংলাদেশে আর কখনো মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে সাহস পেত না। বাংলাদেশ অবশ্যই এর চেয়ে ভালো একটা দেশ হতো, যে দেশে ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা ও কুশিক্ষার কোনো স্থান থাকত না। শান্তি ও শৃঙ্খলার মধ্যে দেশটা আরও দ্রুত গতিতে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হতে পারত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিশিষ্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১

জাতীয় মিলিশিয়া সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকারের ঘোষণা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দেশের সমগ্র জনসাধারণ ও সরকারের পক্ষ হইতে মুক্তিবাহিনীর (নিয়মিত ও গণবাহিনী) সকল সদস্যকে গভীর কৃতজ্ঞতা ও মোবারকবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। সংগ্রামী শক্তিগুলির সদস্যবর্গ সম্মিলিত ও এককভাবে যে দেশপ্রেম, সাহস ও তেজস্বিতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। আজকের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ এবং মুক্তিযুদ্ধে যাঁহারা লড়াই করিয়াছেন তাঁহাদের রক্ত বৃথা যায় নাই।

স্বাধীনতার সংগ্রাম জয়যুক্ত হইয়াছে। কিন্তু আমরা এক্ষণে তদপেক্ষা গুরুতর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। আমাদিগকে এখন দেশের পুনর্গঠনের জন্য সংগ্রাম করিতে হইবে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে অর্থনীতিকে দ্রুততার সহিত পুনর্গঠিত করিলে এবং স্বাভাবিকতা ফিরাইয়া আনিলেই কেবল চলিবে না, জাতির ঈপ্সিত লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অবিলম্বে দেশ গঠনে নবযুগের সূত্রপাত করিতে হইবে। আমাদিগকে এখনই গণতন্ত্র, আইনের শাসন, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করিতে হইবে। ইহা একটি দুরূহ কার্য। যে দেশপ্রেম, আন্তরিকতা, উৎসর্গ ও কঠোর পরিশ্রম ও ত্যাগ আমরা সকলেই বিশেষ করিয়া মুক্তিযোদ্ধারা, মুক্তিযুদ্ধে প্রদর্শন করিয়াছি, তাহার মাধ্যমেই কেবল ইহা সম্পন্ন করা যাইতে পারে।

কাজেই গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নূতন সমাজ গঠনকল্পে মুক্তিবাহিনীর সকল সদস্যকে তাঁহাদের শক্তি ও প্রয়াসকে সঠিক খাতে প্রয়োগের আবেদন জানাইতেছেন। এই সকল উদ্দেশ্য সাধনকল্পে সরকার অবিলম্বে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করিবেন :

দেশের স্বাধীনতা এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা সংরক্ষণের জন্য আমাদের নিয়মিত সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীর প্রয়োজন আছে। আমাদের যে সমস্ত অফিসার এবং জোয়ানরা মুক্তিযুদ্ধে নিয়মিত বাহিনীরূপে অংশগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের জন্য আমরা গর্ব অনুভব করি। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা পর্যাপ্ত নহে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়মিত ব্যাটালিয়নের জন্য আমাদের আরও অফিসার ও জোয়ানদের প্রয়োজন রহিয়াছে। গণবাহিনীর মধ্যেই জনশক্তির এক উত্তম উৎস নিহিত রহিয়াছে। তাঁহারা ইতিমধ্যেই যুদ্ধে পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছেন। তথাপি তাঁহাদের আনুষ্ঠানিক ট্রেনিং-এর প্রয়োজন আছে। গণবাহিনী হইতে অফিসার ও জোয়ান নিয়োগের ব্যবস্থা গৃহীত হইতেছে। প্রতিরক্ষা বাহিনীর নূতন অফিসার ক্যাডার এবং অন্যান্যদের ট্রেনিং দিবার জন্য অচিরেই জাতীয় প্রতিরক্ষা একাডেমী স্থাপিত হইবে। কমিশন্ড ও নন-কমিশন্ড অফিসার মনোনয়নের উদ্দেশ্যে অনতিবিলম্বে সিলেকশন বোর্ডসমূহ গঠন করা হইবে। মুক্তি সংগ্রামের বীর সেনানীরা বাংলাদেশের নবগঠিত স্থলবাহিনী, বিমান ও নৌবাহিনীতে নেতৃত্ব প্রদান করিবেন বলিয়া সরকার আন্তরিকতার সহিত আশা পোষণ করেন।

নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার আশু প্রয়োজন। শান্তি ও শৃঙ্খলা ছাড়া আমরা একটা নূতন সমাজ পুনর্গঠন করিতে পারি না। আমরা গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই সংগ্রাম করিয়াছি। গণতন্ত্রের মূলনীতি বজায় রাখিবার জন্য শহীদেরা আত্মদান করিয়াছেন এবং আমরা যদি নাগরিকদের ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা করিতে না পারি তবে গণতন্ত্র নিরর্থক। আমাদের আচরণ এখন অবশ্যই সুশৃঙ্খল ও নিয়মতান্ত্রিক হইতে হইবে এবং আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখিতে হইবে। আইনের শাসন মানিয়া চলে এইরূপ সকল নাগরিককে রক্ষা করিতেই হইবে। দোষীকে শাস্তি দিতেই হইবে; তবে উহা উপযুক্ত আইনসম্মতভাবেই করিতে হইবে। আমাদের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যাহারা যুদ্ধ করিয়াছিল এবং আমাদের লোকদের উপর নৃশংসতা চালাইয়াছিল তাহাদেরও শাস্তি পাইতে হইবে। তাহাদের বিচার হইবে। সুতরাং আমাদের প্রয়োজন একটি বিচার পদ্ধতি, একটি প্রশাসন-যন্ত্র ও জনসাধারণের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার্থে একটি পুলিশ বাহিনী।

গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার একটি নূতন পুলিশ বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উহা জনগণেরই পুলিশ বাহিনী হইবে এবং পূর্বের মত জনগণের উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন চালাইবার হাতিয়ার হইবে না। এইরূপ গণ-পুলিশ বাহিনী আমাদের বীর গণ-বাহিনীর লোক দ্বারাই উপযুক্তভাবে সংগঠন করিতে হইবে। সুতরাং সরকার পুলিশ অফিসার ও পুলিশ গণ-বাহিনীর সদস্যগণ হইতে নির্বাচন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে অবিলম্বে নির্বাচন বোর্ড গঠন করা হইবে।

আমাদের প্রিয় দেশকে অতি দ্রুত পুনর্গঠনের জন্য এবং জাতীয় উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত সকল প্রাপ্য সম্পদ (মাল-মসলা ও জনশক্তি) কাজে লাগাইবার জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা অবশ্যই বাড়াইতে হইবে। পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নক্সা তৈরির জন্য আমাদের বহু সংখ্যক অভিজ্ঞ শিক্ষক, অর্থনীতিবিদ, পরিসংখ্যানবিদ, ইঞ্জিনিয়ার, স্থপতি, ডাক্তার, কারিগর এবং সর্বপ্রকার দক্ষ জনশক্তির প্রয়োজন। বর্বর শত্রু আমাদের সমাজের রত্নস্বরূপ বুদ্ধিজীবীদিগকে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাঁহারা আমাদের উন্নতির সোপানে পৌছাইতে পারিতেন—ধ্বংস করিতে চাহিয়াছিল। আমরা বহু অমূল্য জীবন হারাইয়াছি। আমাদের শুধু এই ক্ষতিই পূরণ করিতে হইবে না বরং উন্নয়নের সর্বক্ষেত্রে আমাদের নূতন নূতন দক্ষতা অর্জন করিতে হইবে। যুদ্ধের ধ্বংসাবলী অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের মুছিয়া ফেলিতে হইবে যাহাতে আমরা নূতন সমাজ-গঠনের কাজ অবিলম্বে আরম্ভ করিতে পারি। গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মনে করেন যে, মুক্তিবাহিনী প্রতিভাসমূহের এক অপূর্ব ভাণ্ডার—যাঁহারা দেশ পুনর্গঠন, উহার অর্থনৈতিক কাঠামো পুনরুদ্ধার এবং যথাশীঘ্র সম্ভব উন্নতি লাভের জন্য এক নূতন নেতৃত্ব দান করিতে সক্ষম। সরকার আশা করেন যে, মুক্তিবাহিনীর সদস্যগণ, বিশেষ করিয়া যাঁহারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য লেখাপড়া ছাড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের জাতীয় উন্নয়নের সর্বক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করা উচিত। এই সমস্ত বিষয় স্মরণে রাখিয়া সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, যে সমস্ত মুক্তিযোদ্ধা তাঁহাদের শিক্ষা ও ট্রেনিং সমাপ্ত করিবার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, বিশেষত ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ, পলিটেকনিক শিক্ষালয় ও অন্যান্য কারিগরি কেন্দ্রে ভর্তি হইতে আগ্রহী সরকার তাহাদিগকে সকল প্রকার সুযোগ দিবেন। সরকার দেশের সকল স্থানে নূতন নূতন কারিগরি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথাও চিন্তা করিতেছেন।

যাঁরা শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছেন তাঁহাদিগকে অচিরেই উপযুক্ত পদে নিয়োগ করা হইবে।

উপরোক্ত নীতিগুলি কার্যকরী করার জন্য সমস্ত মুক্তিযোদ্ধাকে, তাঁহারা তালিকাভুক্ত হইয়া থাকুন বা না-ই থাকুন, একটি জাতীয় মিলিশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

জাতীয় মিলিশিয়া গঠনের পরিকল্পনা নিম্নরূপ হইবে :

১. অনতিবিলম্বে একটি জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করা হইবে এবং তালিকাভুক্ত হোক বা না হোক সমস্ত মুক্তিযোদ্ধাকে ইহার আওতায় আনা হইবে।

২. প্রত্যেক মহকুমায় সেই এলাকার গেরিলা বাহিনীর জন্য শিবির প্রতিষ্ঠা করা হইবে। শিবিরগুলির পরিচালনা ব্যবস্থা এমনভাবে করা হইবে যেন এসব যুবককে পুনর্গঠন কাজের উপযোগী করিয়া প্রয়োজনীয় ট্রেনিং দেওয়া সম্ভবপর হয়।

৩. মহকুমা-ভিত্তিক শিবিরগুলি সেই এলাকার সমস্ত গেরিলা বাহিনীর মিলন-কেন্দ্র হইবে।

৪. উর্ধ্বপক্ষে এগারোজন সদস্য লইয়া জাতীয় মিলিশিয়ার জন্য একটি কেন্দ্রীয় বোর্ড গঠন করা হইবে। বোর্ডের সদস্যগণকে সরকার মনোনয়ন দান করিবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫. প্রত্যেক মহকুমা-শহরে জাতীয় মিলিশিয়ার জন্য মহকুমা বোর্ড থাকিবে। মহকুমা বোর্ডের সদস্য সংখ্যা অনধিক এগারোজন হইবেন। সদস্যগণ সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবেন।

৬. প্রতিটি শিবিরে অস্ত্রশস্ত্র কার্যোপযোগী ব্যবস্থায় রাখা, গুদামজাত করা ও হিসাবপত্র রাখার জন্য একটি করিয়া অস্ত্রাগার থাকিবে।

৭. ট্রেনিং-এর কার্যসূচী এমনভাবে প্রস্তুত করা হইবে যেন এসব যুবককে নিম্নে বর্ণিত ভূমিকা পালনের উপযোগী করিয়া তোলা যায়:

   ক) যেন তাঁহারা দেশের দ্বিতীয় রক্ষাব্যূহ হইতে পারেন।

   খ) যখনই নির্দিষ্টভাবে প্রয়োজন হইবে তখনই যেন তাঁহারা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও পুনর্বহালে উপযোগী হইতে পারেন।

   গ) দেশের পুনর্গঠন কার্যে সরাসরি সহায়তা হয় এমন বিভিন্ন কাজের উপযোগী হন।

৮. অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান, অপুষ্টিকর খাদ্য এবং অপর্যাপ্ত বেতন ও ভাতার জন্য মুক্তিযুদ্ধের সমস্ত এই গেরিলাদের এক বিরাট অংশ কষ্টভোগ করিয়াছেন, সেজন্যই তাঁহাদের খাদ্য, বাসস্থান ও ভাতার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হইবে।

বাংলাদেশ সরকার, দেশ রক্ষা বিভাগ, বিজিপি-১০৭৩এ-৭১/৭২—৫ হাজার

[সূত্র : *আলোকের অনন্তধারা*, তাজউদ্দীন আহমদ, প্রতিভাস, ঢাকা।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২

রক্ষীবাহিনী গঠন-সম্পর্কিত গেজেট ও সংশোধনী

ক) রক্ষীবাহিনী গঠন-সম্পর্কিত প্রথম গেজেট

Registered No. DA-1.
The Bangladesh Gazette, Extraordinary, Published by Authority,
Wednesday, MARCH 8, 1972

GOVERNMENT OF THE PEOPLES REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF LAW AND PARLIAMENTARY AFFAIRS
(Law Division)

NOTIFICATION

No. 212—Pub.—8th March, 1972—The Following Order made by the President, on the advice of the Prime Minister, of the People's Republic of Bangladesh on the 7th March, 1972, is hereby published for general information:—

AMARBOI.COM

GOVERNMENT OF THE PEOPLES REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF LAW AND PARLIAMENTARY AFFAIRS
(Law Division)
President's Order No. 21 of 1972.
THE JATIYA RAKKHI BAHINI ORDER, 1972.

WHEREAS it is expedient to provide for the Constitution of Jatiya Rakkhi Bahini and matters ancillary thereto;

Now, THEREFORE, in pursuance of the Proclamation of Independence of Bangladesh, read with the Provisional Constitution of Bangladesh Order, 1972, and in exercise of all powers enabling him in that behalf, the President is pleased to make the following Order:—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

1. (1) This Order may be called the Jatiya Rakkhi Bahini Order, 1972.
   (2) It extends to the whole of Bangladesh.
   (3) It shall come into force at once and shall be deemed to have taken effect on the first day of February, 1972.
2. In this Order, unless there is anything repugnant in the subject or context,
   (a) "Bahini" means the Jatiya Rakkhi Bahini constituted under this Order;
   (b) "Commanding Officer" means an officer commanding a unit or a body of Rakkhis;
   (c) "Director" means the Director of the Bahini appointed under Article 5;
   (d) "Government" means the Government of the People's Republic of Bangladesh;
   (e) "Officer" means a superior office or a subordinate officer;
   (f) "prescribed" means prescribed by rules made under this Order;
   (g) "Rakkhi" means a member of the Bahini other than an officer;
   (h) "subordinate officer" means such officer as may be prescribed;
   (i) "superior officer" means the Director and such other officer as may be prescribed;
   (j) "unit" means a unit of the Bahini.
3. Every person appointed or enrolled under this Order shall be subject to this Order wherever he may be and shall remain so subject until his discharge in accordance with the provisions of this Order.
4. (1) There shall be raised and maintained in accordance with the provisions of this Order a Bahini to be called the Jatiya Rakkhi Bahini.
   (2) The Bahini shall consist of such number and classes of officers and Rakkhis and shall be constituted in such manner as the Government may from time to time direct.
5. (1) The Government shall appoint a Director of the Bahini and may appoint such other officers as it may deem fit.
   (2) The Director and the other officers shall be appointed in such manner, for such period and on such terms and conditions as may be prescribed.
   (3) The Director and the other officers shall possess, and may exercise, such powers and authority over their subordinate officers and the Rakkhis for the time being under their command as is provided by or under this Order.
6. The Rakkhis shall be enrolled in such manner, for such period and on such terms and conditions as may be prescribed.
7. The superintendence of the Bahini shall vest in the Government and the Bahini shall be administered, commanded and controlled by the

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Director in accordance with the provisions of this Order and any rules made there under and such orders and instructions as may be made or issued by the Government from time to time.

8. (1) The Bahini shall be employed for the purpose of assisting the civil authority in the maintenance of internal security when required by such authority as may be prescribed.
   (2) The Bahini shall render assistance to the Armed Forces when called upon by the Government to do so in such circumstances and in such manner as may be prescribed.
   (3) The Bahini shall perform such other functions as the Government may direct.
9. It shall be the duty of every officer or Rakkhi promptly to obey and execute all orders and warrants lawfully issued to him by any competent authority and to apprehend all persons whom he is legally authorised to apprehend and for whose apprehension sufficient grounds exist and deliver such persons to the custody of the police.
10. Every person subject to this Order shall be entitled to receive his discharge from the Bahini on the expiration of the period for which he was appointed or enrolled and may, before the expiration of that period, be discharged from the Bahini by the Government, Director or such other officer and subject to such conditions as may be prescribed.
11. (1) Subject to such rules as the Government may make under this Order, the Director may, at any time, award any one or more of the following punishments to any subordinate officer or Rakkhi whom he finds to be guilty of disobedience, neglect of duty or remissness in the discharge of any duty, or of rendering himself unfit to discharge his duty, or of other misconduct in his capacity as a subordinate officer or Rakkhi, namely:—
   (a) dismissal from service;
   (b) removal from service;
   (c) compulsory retirement;
   (d) reduction in rank or grade;
   (e) stoppage of promotion;
   (f) forfeiture of seniority for not more than one year;
   (g) forfeiture of pay and allowances for not exceeding twenty-eight days;
   (h) forfeiture of increment in pay;
   (i) fine to any amount not exceeding one month's pay;
   (j) confinement to quarter-guard for a term not exceeding twenty-eight days;
   (k) severe reprimand;
   (l) reprimand;
   (m) extra guard; picquets, patrol or fatigue;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(n) confinement to Lines for a term not exceeding one month; with or without drill, extra guard, fatigue or other duty.

(2) The Director may place under suspension any subordinate officer or Rakkhi against whom action under clause (1) is required to be taken or against whom any investigation or inquiry is required to be made.

(3) Notwithstanding anything contained in clause (1), no subordinate officer or Rakkhi shall be awarded any punishment under this Article unless he has been given an opportunity of being heard.

(4) Any subordinate officer or Rakkhi aggrieved by any action taken under sub-clauses (a) to (i) of clause (1) may prefer an appeal to the prescribed authority in the prescribed manner.

12. Any person subject to this Order who deserts or attempts to desert the Bahini shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to seven years, or with fine, or with both.

13. Whenever any person subject to this Order deserts, his Commanding Officer shall give written information of the desertion to such civil authorities as in his opinion may be able to afford assistance towards the capture of the deserter and such authorities shall thereupon take steps for apprehension of the said deserter in like manner as if he were a person for whose apprehension a warrant had been issued by a Magistrate, and shall deliver the deserter, when apprehended, to the custody of the Bahini.

14. No Person subject to this Order shall be at liberty to resign his appointment or to withdraw himself from all or any of the duties of his appointment, without the sanction of the Commanding Officer with whom he is serving or of some other officer authorised by the Commanding Officer to grant such sanction.

15. Any person subject to this Order who is guilty of any violation of duty or willful breach or neglect of any rule or lawful order made by any competent authority, or who resigns his appointment or withdraws himself from all or any of the duties of his appointment in contravention of the provision of Article 14, or who, being absent on leave, fails, without reasonable cause, to report himself for duty on the expiration of such leave, or who is guilty of cowardice, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.

16. The Director may delegate, to such extent and in respect of such subordinate officer or Rakkhi as he may think fit, the powers conferred upon him by any provision of this Order to any superior officer.

17. (1) The Government may, by notification in the official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Order.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may—
   (a) prescribe the period for which and the manner in which persons may be appointed as officers or enrolled as Rakkhis;
   (b) prescribe the training of officers and Rakkhis;
   (c) prescribe the discharge of officers and Rakkhis;
   (d) prescribe the terms and conditions of service of officers and Rakkhis;
   (e) regulate the powers and functions of the Director and other officers;
   (f) regulate the classes of officers and Rakkhis;
   (g) provide for any other matter necessary for the constitution, maintenance, administration, command, control and discipline of the Bahini and for carrying the provisions of this Order into effect.

ABU SAYEED CHOWDHURY
President of the
People's Republic of Bangladesh.

DACCA;
The 7th March, 1972

AZIMUDDIN AHMED
Deputy Secretary.

AMARBOI.COM

খ) গেজেটের সংশোধনী

Registered No. DA-1.
The Bangladesh Gazette, Extraordinary, Published by Authority
MONDAY, FEBRUARY 17, 1975

MINISTRY OF LAW, PARLIAMENTARY AFFAIRS AND JUSTICE
(Law and Parliamentary Affairs Division)
NOTIFICATION
Dacca, the 17th February, 1975.

No. 124-Pub.—The Following Ordinance made by the President of the People's Republic of Bangladesh, on the 17th February, 1975 is hereby published for general information:—
GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

MINISTRY OF LAW, PARLIAMENTARY AFFAIRS AND JUSTICE
(Law and Parliamentary Affairs Division)

The JATIYA RAKKHI BAHINI (AMENDMENT) ORDINANCE, 1975

Ordinance No. IX of 1975.

AN

ORDINANCE

further to amend the Jatiya Rakkhi Bahini Order, 1972.

WHEREAS it is expedient further to amend the Jatiya Rakkhi Bahini Order, 1972 (P. O. No. 21 of 1972), for the purposes hereinafter appearing;

AND WHEREAS Parliament is not in session and the President is Satisfied that circumstances exist which render immediate action necessary;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 93 of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh, the President is pleased to make and promulgate the following Ordinance:—

1. Short title.—This Ordinance may be called the Jatiya Rakkhi Bahini (Amendment) Ordinance, 1975.
2. Substitution of Article 2, P. O. No. 21 of 1972.- In the Jatiya Rakkhi Bahini Order, 1972 (P. O. No. 21 of 1972), hereinafter referred to as the said Order, for Artilce 2 the following shall be substituted, namely:—

"2.(1) In this Order, unless there is anything repugnant in the subject or context,—

(a) "Bahini" means the Jatiya Rakkhi Bahini constituted under Article 4 of this Order;

(b) "Battalion" means a Unit composed of several companies, forming part of or attached to a Zone;

(c) "commanding officer" means an officer commanding a Unit or a body of Rakkhis;

(d) "Company" means a sub-unit composed of several platoons;

(e) "Director" means the Director of the Bahini appointed under Article 5;

(f) "misconduct" means conduct prejudicial to good order or service discipline or unbecoming of an officer or gentleman and includes any act, commission or omission which is an offence under Article 10A or 10B;

(g) "officer" means a superior officer or a subordinate officer;

(h) "platoon" means a sub-unit consisting of three sections of Rakkhi is;

(i) "prescribed" means prescribed by rules made under this Order;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(j) "Rakkhi" means a member of the Bahini other than an officer;

(k) "Regiment" means a signal unit composed of several companies;

(l) "Special Court" means a court consisting of not less than two superior officers constituted by the Director and presided over by an officer not below the rank of Deputy Director and assisted by a public prosecutor or his representative;

(m) "Special Summary Court" means a court consisting of not less than two superior officers or one superior officer and one subordinate officer constituted by the Director and presided over by an officer not below the rank of Assistant Director;

(n) "subordinate officer" means a senior Deputy Leader, Deputy Leader, Assistant Leader or Junior Leader.

(o) "Superior Officer" means the Director, Joint Director, Deputy Director, Assistant Director, Leader, Chief Medical Officer, Medical Officer, Dental Officer or Nursing Officer, and when used in relation to a subordinate officer or Rakkhi includes any officer who is senior to him in rank or length of service;

(p) "Unit" means a Unit of the Bahini;

(q) "Zone" means a formation composed of two or more Units.

(2) The expressions "assault", "criminal force", "fraudulently", "reason to believe" and "voluntarily causing hurt" shall have the meanings respectively assigned to them in the Penal Code (XLV of 1860)".

3. Amendment of Article 4, P.O. No. 21 of 1972.—In the said Order, in Article 4 after clause (2), the following new clause shall be added namely:—

"(3) The Bahini shall be a disciplined force within the meaning of the definition of "disciplined force" as given in Article 152(1) of the Constitution."

4. Substitution of Article 5, P.O. No. 21 of 1972.-In the said Order, for Article 5, the following shall be substituted, namely:—

"5.(1) There shall be a Director of the Bahini and may be all or any of the following classes of superior officers of the Bahini, namely:—

(a) Joint Director;

(b) Deputy Director;

(c) Assistant Director;

(d) Leader;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(e) Chief Medical Officer;
(f) Medical Officer;
(g) Dental Officer;
(h) Nursing Officer.

(2) There may be all or any of the following classes of subordinate officers of the Bahini, namely:—
(a) Senior Deputy Leader;
(b) Deputy Leader;
(c) Assistant Leader;
(d) Junior Leader.

(3) The Director and other superior officers shall be appointed by the Government, and the subordinate officers shall be appointed by the Director, in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed.

(4) The Director and other superior officers shall have, and may exercise, such powers and authority over the officers subordinate to them and the Rakkhis for the time being under their command as are provided by or under this Order.:.

5. Insertion of new Articles 10A and 10B, P.O. No. 21 of 1972.—In the said Order, after Article 10, the following new Articles shall be inserted, namely:—

"10A. (1) An officer, other than the Director, or a Rakkhi who—
(a) begins, excites, causes or joins in any mutiny or sedition or, being present at any mutiny or sedition, does not make his utmost endeavours to suppress it, or, knowing, or having reason to believe in the existence, of any mutiny or sedition, does not, without delay, give information thereof to his commanding officer or superior officer;
(b) uses, or attempts to use, criminal force to, or commits an assault on, his superior officer, knowing or having reason to believe him to be such, whether on or off duty;
(c) abandons or delivers up any garrison, fortress, post or guard or wireless station which is committed to his charge or which it is his duty to defend;
(d) in the presence of an enemy or nay person in arms against whom it is his duty to act, cast away his arms or his ammunition or intentionally uses words or any other means to induce any other subordinate officer or Rakkhi to abstain from acting against the enemy, or any such person, or to discourage any such subordinate officer or Rakkhi from acting against the enemy or such person, or who otherwise misbehaves;
(e) directly or indirectly holds correspondence with, or

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

communicates intelligence to, or assists, or relieves, any enemy or person in arms against the State, or omits to disclose immediately to his commanding officer or superior officer any such correspondence or communication coming to his knowledge;

(f) directly or indirectly assists or relieves with money, victuals or ammunition, or knowingly harbours or protects any enemy or person in arms against the State;

(g) without authority leaves his commanding officer, or his post or party, to go in search of plunder;

(h) quits his guard, picquet, party or patrol without being regularly relieved or without leave;

(i) Uses criminal force to, or commits an assault on, any person bringing provisions or other necessaries to camp or quarters, or forces a safeguard, or without authority breaks into any house or any other place for plunder, or plunders, destroys or damages any property of any kind; or

(j) intentionally causes or spread a false alarm in action, camp, garrison or quarters, shall, on conviction by a Special Court, be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine which may extend to five hundred taka.

(2) A Special Court shall take cognizance of an offence punishable under this Article in such manner and follow such procedure as may be prescribed.

(3) An officer or a Rakkhi accused of an offence under this Article shall have the right to conduct his own defense or to have assistance of any officer of the Bahini or of any legal practitioner of his own choice.

(4) An appeal from the judgment of an Special Court may be preferred to the Government witching thirty days of the delivery thereof.

10B.(1) An officer, other than the Director, or a Rakkhi who—

(a) is in a state of intoxication when on or detailed for any duty, or on parade, or on the line of march;

(b) strikes, or forces or attempts to force, any sentry;

(c) being in command of a guard, picquet or patrol, refuses to receive any prisoner duly committed to his charge, or, whether in such command or not, releases any prisoner without proper authority or negligently suffers any prisoner to escape;

(d) being deputed to any guard, picquet or patrol, quits it without being regularly relieved or without leave;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(e) being in command of a guard, picquet or patrol, permits gambling or other behaviour prejudicial to good order and discipline;
(f) being under arrest or in confinement, leaves his arrest or confinement before he is set at liberty by proper authority;
(g) is grossly insubordinate or insolent to his superior officer in the execution of his office;
(h) refuses to superintend or assist in the making of any field work or other military work of any description ordered to be made either in quarters or in the field;
(i) Strike or otherwise ill-uses a subordinate officer or Rakkhi subordinate to him in rank or position;
(j) being in command at any post or on the march and receiving a complaint that any one under his command has beaten or otherwise maltreated or oppressed any person, or has committed any riot or trespass, fails, on proof of the truth of the complaint, to have due reparation made as far as possible to the injured person and to report the case to the proper authority;
(k) designedly or through neglect injures or loses or fraudulently or without due authority disposes of his arms, clothes, tools, equipment, ammunition, accoutrements, any means of transport or other necessaries, or any such articles entrusted to him or belonging to any other person;
(l) malingers, feigns or produces disease or infirmity in himself, or intentionally delays his cure or aggravates his disease or infirmity;
(m) with intent to render himself or any other person unfit for service, voluntarily causes hurt to himself or any other person;
(n) commits extortion, or without proper authority exacts from any person, carriage, porter age or provisions;
(o) designedly or through neglect kills, injures, makes away with, ill-treats or loses his horse or any animal used in the public service;
(p) disobeys the lawful command of his superior officer;
(q) plunders, destroys or damages any property of any kind;
(r) being a sentry, sleeps at his post or quits it without being regularly relieved or without leave;
(s) deserts or attempts to desert the service or absents himself without leave of, without sufficient cause, overstays leave granted to him;
(t) resigns his appointment or withdraws himself from all or

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

any of the duties of his appointment in contravention of the provisions of Article 14;

(u) accepts illegal gratification from any person;

(v) designedly or through neglect fails to apprehend an offender;

(w) designedly or through neglect fails to perform his duties;

(x) makes a false accusation against any person subject to this Order knowing or having reason to believe such accusation to be false; or

(y) neglects to obey Bahini Orders, Zonal Orders, Battalion Orders, Regiment Orders or Unit Orders or any other order or rule made under this Order or commits any act or omission prejudicial to good order and disciplines, such act or omission prejudicial to good order and disciplines, such act or omission not constituting any offence under the Penal Code (XLV of 1860), or any other law for the time being, shall, on conviction by a Special Summary Court, be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to two years and shall also be liable to fine which may extend to two hundred taka.

(2) A Special Summary Court shall take cognizance of an offence punishable under this Article in such manner and follow such procedure as may be prescribed.

(3) An officer or a Rakkhi accused of an offence under this Article shall have the right to conduct his own defense or to have assistance of any officer of the Bahini of his own choice.

(4) An appeal from the judgment of a Special Summary Court may be preferred to the Director or, where the Director presided over the Court, the Government within thirty days of the delivery thereof."

6. Amendment of Article 11, P. O. No. 21 of 1972.—In the said Order, in Article 11, in clause (3), for the full stop at the end of a semicolon shall be substituted, and thereafter the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that this clause shall not apply where a subordinate officer or Rakkhi is dismissed or removed from service or reduced in rank on the ground of conduct which has led to his conviction of an offence under article 10A or 10B any other criminal offence."

7. Insertion of new Article 11A, P. O. No. 21 of 1972.—In the said Order, after Article 11, the following new Article shall be inserted, namely:—

"11A. Any officer or Rakkhi sentenced under this Order to imprisonment shall be imprisoned in the nearest or such other jail as the Government may, by general or special order, direct.".

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

8. Omission of Article 12, P. O. No. 21 of 1972.—In the said Order, Article 12 shall be omitted.

9. Amendment of Article 12, P. O. No. 21 of 1972.—In the said Order, Article 12 shall be renumbered as clause (1) of that Article and after clause (1) as so renumbered, the following new clause shall be added, namely—

"(2) It shall be lawful for any police officer to arrest without warrant any person whom he reasonably believes to be a member of the Bahini and to be a deserter or absentee without leave, and to bring him without delay before the nearest Magistrate to be dealt with according to law.".

10. Omission of Article 15, P. O. No. 21 of 1972. —In the said Order, Article 15 shall be omitted.

11. Insertion of new Article 16B, P. O. No. 21 of 1972. —In the said Order after Article 16A, the following new Article shall be inserted, namely:—

"16B. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the Government may invest the Director with the powers of a Magistrate of any class for the purpose of enquiring into or trying any offence committed by an officer or Rakkhi against the person or property of another officer or Rakkhi and punishable under any provision of the Penal Code (XLV of 1860), or of any other law for the time being in force.".

12. Amendment of Article 17, P. O. No. 21 of 1972. —In the said Order in Article 17 after clause (2), the following new clause shall be added, namely:—

"(3) Any rules under this Article may be made so as to be retrospective to any date not earlier than the date of commencement of this Order.".

SHEIKH MUJIBUR RAHMAN
President of the
The People's Republic of Bangladesh.
DACCA; 14th February, 1975.

JUSTICE M. H. RAHMAN
Secretary.

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩

রক্ষীবাহিনীর প্রধানকে লেখা এম এ জি ওসমানীর চিঠি

General M. A. G. Osmany, p.s.c., M.C.A.,
Commander-in-Chief,
Bangladesh Forces,
Dacca Cantonment

DO No. 1972 A
Mar 72

I am desired by The President to convey to you and all ranks who participated at the historic Parade on the occasion of the First Independance Day, on the 26th March 1972, his commendation on the excellence of the Parade.

The Prime Minister was also very pleased with the standard of the Parade and considers the standard exhibited by battle-worn personnel, in such a short time, a clear indication of the capability of our boys to revive their traditionally high standard of discipline, turn out and efficiency in all operations, to which end officers and men must devote themselves.

Kindly convey the above to all ranks—by reproduction in orders and at a Parade.

Maj. A.N.M. Nuruzzaman,
Director National Militia,
Peelkhana,
Dacca

Copy to: Deputy Leader Md. Lokman,
Jatiya Rakhi Bahini,
Dacca

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

General M.A.G.Osmany, p.s.c.,M.C.A.,
Commander-in-Chief,
Bangladesh Forces,
Dacca Cantonment

DO No. 1972 A
Mar 72

I am desired by The President to convey to you and all ranks who participated at the historic Parade on the occasion of the First Independance Day, on the 26th March 1972, his commendation on the excellence of the Parade.

The Prime Minister was also very pleased with the standard of the Parade and considers the standard exhibited by battle-worn personnel, in such a short time, a clear indication of the capability of our boys to revive their traditionally high standard of discipline, turn out and efficiency in all operations, to which and officers and men must devote themselves

Kindly convey the above to all ranks - by reproduction in orders and at a Parade.

Maj A.N.M. Nuruzzaman,
Director National Militia,
Paulkhana,
Dacca

Copy to:- Deputy Leader Md Lokman,
Jatiya Rakhi Bahini,
Dacca

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪

রক্ষীবাহিনীর দ্বিতীয় ব্যাচের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ উপলক্ষে প্রকাশিত স্যুভেনিরের মুখবন্ধ

জাতীয় রক্ষীবাহিনীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

১. ৩০ লাখ প্রাণের বিনিময়ে ও দেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করেছে। বিশ্বের আর কোনো দেশকেই স্বাধীনতার জন্য এত চরম মূল্য দিতে হয়নি। এ দেশের মানুষের অদম্য শক্তি, একতা, দৃঢ়তা ও অপরাজেয় সাহসের জন্যই এ স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হয়েছে। কষ্টার্জিত এ স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়োজনেই নতুন করে অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষাকারী আত্মত্যাগী একটি বাহিনী গঠিত হচ্ছে।

২. পাকিস্তান বাহিনীর হাত থেকে দেশকে মুক্ত করতে প্রতিটি মানুষ যাঁর যাঁর অবস্থান থেকে অবদান রেখেছেন। স্বাধীনতার এ যুদ্ধে বহু মানুষ জীবন দান করেছেন। দেশের প্রতিটি গ্রাম ও ঘরের কোণ থেকে এ যুদ্ধ শুরু হয়। এই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য খুব কম পরিবারই ছিল, যারা কোনো প্রিয়জনকে হারায়নি। জনগণ নিজেদের সংগঠিত করে স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে জীবন উৎসর্গ করেন। বিভিন্ন পুলিশ স্টেশনে হামলা চালিয়ে ও সেনাবাহিনীর বিভিন্ন দপ্তর দখল করে স্বাধীনতাকামী এসব মানুষ নিজেদের সশস্ত্র করে তোলেন। তারপর স্বাধীনতার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন তাঁরা। সাড়ে সাত কোটি মানুষের এ অভূতপূর্ব আত্মত্যাগ তাদের মনের মণিকোঠায় লালিত স্বাধীনতার স্বপ্নকে বাস্তব ও পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাস্ত করার শক্তি জোগায়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া এসব মুক্তিযোদ্ধা স্বাধীনতা অর্জনের পর বঙ্গবন্ধুর পরবর্তী ডাকের অপেক্ষায় ছিলেন।

৩. স্বাধীনতা লাভের পর বঙ্গবন্ধু এসব মুক্তিযোদ্ধাকে অস্ত্র জমা দিয়ে যাঁর যাঁর পূর্ববর্তী পেশা ও কাজে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানান। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময়েও দেশপ্রেমিক কিছু মুক্তিযোদ্ধাকে দেশের প্রয়োজন ছিল। এই প্রয়োজনের তাগিদ থেকেই এসব দেশপ্রেমিক নায়ককে নিয়ে একটি বাহিনী গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়।

৪. তৎকালীন বাংলাদেশের সেনাপ্রধান জেনারেল (তখন কর্নেল) এম এ জি ওসমানী, পিএসসি (অব.) লেফটেন্যান্ট কর্নেল (তখন মেজর) এ এন এম নূরুজ্জামানকে নতুন বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করেন। সেই সঙ্গে নতুন বাহিনীটি পরিচালনার দায়িত্বও দেওয়া হয় তাঁকে।

৫. এভাবে ১৯৭২ সালের ২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠিত হয়। দেশমাতৃকার প্রতিরক্ষাব্যবস্থায় একটি নিয়মিত ও সুশৃঙ্খল বাহিনী হিসেবে সাবেক মুক্তিযোদ্ধাদের যুক্ত করতেই জাতীয় রক্ষীবাহিনী গড়ে তোলা হয়।

৬. সব সেক্টরের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা এই বাহিনীতে যোগ দেন। এ ক্ষেত্রে ৩ নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধা সুবেদার হাফিজ উদ্দীনের অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই আত্মত্যাগী জেসিও দেশ স্বাধীনের প্রথম দিনগুলোতে যে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়েছিল, তা রুখতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।

৭. জাতীয় রক্ষীবাহিনীর মূল ভিত্তিটা গড়ে উঠেছিল দেশমাতৃকার এসব অকুতোভয় সন্তানকে নিয়ে, যাঁরা একজন সৈন্য হিসেবে আনুষ্ঠানিক কোনো প্রশিক্ষণ ছাড়াই যুদ্ধ করেছেন। দেশে আইন ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় এসব আত্মোৎসর্গীকৃত যুবকদের প্রাণ, প্রাচুর্য, দেশপ্রেম ও দেশ পুনর্গঠনে জরুরি ভিত্তিতে নেওয়া উদ্যোগগুলোর একটি মঞ্চও ছিল জাতীয় রক্ষীবাহিনী।

৮. ১৯৭২ সালে মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরকালে দেশে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে রক্ষীবাহিনীর ভূমিকা সবার আস্থা অর্জন করে। শহরে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে একনজর দেখতে যে বিপুল জনসমাবেশ হয়, সেই সমাবেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে রক্ষীবাহিনীর ভূমিকা ছিল প্রশংসাযোগ্য।

৯. ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ দেশের প্রথম স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের প্যারেডে রক্ষীবাহিনীর দুটি বহর অংশ নেয়। তাদের এ প্যারেডে সালাম গ্রহণ করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী।

১০. উপসহকারী প্রধান (ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট লিডার) এম এ রফিকের নেতৃত্বাধীন মন্ত্রণালয় কর্মচারীদের একটি দলের দায়িত্ব ছিল রক্ষীবাহিনীর পোশাক, খাবার, বেতন ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সরবরাহ করার। এ দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করায় মন্ত্রণালয় কর্মচারীদের এ দলটির কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আমাদের যেকোনো অনুরোধ তাঁরা দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিজ নিজ মন্ত্রীর কাছে পেশ ও সেগুলো বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতেন।

১১. রক্ষীবাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য সাময়িক ছাউনি স্থাপন করে দেওয়াসহ ঢাকার সাভারে অবস্থিত আনসার প্রশিক্ষণকেন্দ্রের সদর দপ্তর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নানাভাবে সাহায্য করে। রক্ষীবাহিনীর দ্বিতীয় যে ব্যাচটি আজ প্যারেডে অংশ নিচ্ছে, তাদের সে সময় প্রচণ্ড সমস্যা মোকাবিলা করেই এগিয়ে যেতে হয়েছে। তারা এখনো হাসিমুখে প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণকেন্দ্রের যাবতীয় বৈরী অবস্থা ও চাপ সহ্য করে যাচ্ছে। রক্ষীবাহিনীর নিজস্ব গভীর নলকূপ স্থাপন না হওয়া পর্যন্ত সাভার ডেইরি ফার্ম সহৃদয়তার সঙ্গে প্রশিক্ষণকেন্দ্রে পানীয় জল সরবরাহ করে গেছে। শুরুর দিনগুলোতে ডেইরি ফার্মের ব্যবস্থাপক ও তাঁর কর্মচারীরা যে সহযোগিতা দিয়েছেন, তার জন্য জাতীয় রক্ষীবাহিনী তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

১২. প্রশিক্ষণের জন্য আমাদের কোনো জায়গা ছিল না। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস-চ্যান্সেলর ও রেজিস্ট্রার তাঁদের প্রস্তাবিত থামার এলাকাটি প্রশিক্ষণের উদ্দেশে আমাদের ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে সাহায্য করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়টির সব কর্মচারীকে স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য আমরা তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

১৩. সাভারে জাতীয় রক্ষীবাহিনীর কেন্দ্র স্থাপনের প্রাথমিক দিনগুলোতে স্থানীয় জনগণ ও প্রশাসন তাদের আন্তরিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। আমরা তাদের সহৃদয় সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

১৪. রক্ষীবাহিনীর প্রশিক্ষণকেন্দ্রের যে গুটিকয় কর্মচারী ছিলেন, তাঁদের প্রশিক্ষণার্থী রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের খাদ্য, বাসস্থান, প্রশিক্ষণ ও চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে কঠোর পরিশ্রম করতে হতো। এই কঠিন কাজের দায়িত্বে ছিলেন প্রশিক্ষণকেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা এম এ হাসনাত ও তাঁর কর্মচারীরা। বাহিনীর উপনেতা আখতারুদ্দীন, জাবেদ আলী ও শহিদুল্লাহ্ শুরুর সেসব দিনের হাজারো সমস্যা সমাধানের ধকল নিয়েছেন।

১৫. অবশেষে ১৯৭২ সালের ২১ জুন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রক্ষীবাহিনীর প্রথম ব্যাচের মার্চপাস্টে স্যালুট গ্রহণ করেন।

(ইংরেজি থেকে অনূদিত)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫

১৯৭২-৭৫ সালে আওয়ামী লীগের যাঁরা নিহত হয়েছেন

১৯৭২

২৯ ফেব্রুয়ারি : বরিশালের উজিরপুরের যুবলীগকর্মী ও মুজিব বাহিনীর সদস্য আবদুল লতিফ একদল 'দুষ্কৃতকারী'র হাতে নিহত।

২০ মার্চ : ভোলা মহকুমা ছাত্রলীগের সভাপতি ও ভোলা কলেজ ছাত্র সংসদের সহসভাপতি সালেহ আহম্মেদ, ছাত্রলীগ নেতা শফিউল্লাহ ও জুলফিকার আলী জুলুকে 'নৃশংস'ভাবে হত্যা করা হয়েছে।

২৮ মার্চ : বৈদ্যেরবাজার থানার বারদা ইউনিয়ন ছাত্রলীগ কর্মী ফজলুল হক, আবদুল হক, আবদুল মতিন ও হোসেন আলী অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে নিহত।

২৪ এপ্রিল : টাঙ্গাইলে ছাত্রলীগের মিছিলে বোমা হামলায় আহত আজিজুল হকের মৃত্যু।

৬ জুন : খুলনায় গণপরিষদ সদস্য আবদুল গফুর ও তাঁর দুই সঙ্গী কামাল ও রিয়াজউদ্দিন একদল সশস্ত্র দুর্বৃত্তের হাতে অপহৃত ও নৃশংসভাবে খুন।

১৫ জুন : নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে একই পরিবারের তিনজনসহ চারজন আওয়ামী লীগ কর্মী নিহত। এঁরা হচ্ছেন উক্ত এলাকার রিলিফ কমিটির সদস্য ও আওয়ামী লীগ কর্মী আবদুস সাত্তার, তাঁর পুত্র আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান নূরুজ্জামান, কন্যা মাছিলপুর আওয়ামী মহিলা সমিতির সভানেত্রী রওশন আরা বেগম ও সুরেশচন্দ্র দাস। ভোরে বাড়ি ঘেরাও করে তাঁদের ধরে নিয়ে হত্যা করা হয়।

১২ জুলাই : পাবনা বুলবুল মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক ছাত্রলীগ নেতা আবদুস সাত্তার লালু অজ্ঞাত আততায়ীর গুলিতে নিহত।

১৯ জুলাই : চৌমুহনীর আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ সফিউল্লাহ নিজ বাসভবনে দুষ্কৃতকারীদের ছুরিকাঘাতে নিহত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জুলাই : নড়াইলে আওয়ামী লীগ কর্মী বিনয়কুমার মিত্র দুষ্কৃতকারীদের গুলিতে নিহত।

২৬ জুলাই : কেরানীগঞ্জের আওয়ামী লীগ কর্মী আবু সাঈদ গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত।

৪ আগস্ট : নড়াইল জেলা আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ এম সোলায়মানকে কয়েকজন আততায়ী রূপগঞ্জ বাজারে দোকানে বসা অবস্থায় গুলি করে হত্যা করে।

৭ সেপ্টেম্বর : লৌহজংয়ে মুজিব বাহিনীর ইউনিট কমান্ডার গিয়াসউদ্দিন আহমেদ দুষ্কৃতকারীদের হাতে নিহত।

১১ সেপ্টেম্বর : ন্যাশনাল জুটমিলের শ্রমিক লীগ কর্মী আবদুল কাদের নিহত।

৭ অক্টোবর : খুলনার ফুলতলায় আওয়ামী লীগ কর্মী সরদার খলিলুর রহমান নিজ বাড়িতে আততায়ীদের গুলিতে নিহত।

১৩ নভেম্বর : কক্সবাজারের মহেশখালীতে আওয়ামী লীগ কর্মী আবদুর রহিম দুষ্কৃতকারীদের হাতে নিহত।

১৪ নভেম্বর : ঝালকাঠি শহরে শ্রমিক লীগ নেতা সঞ্জীবকুমার বোসকে গুলি করে হত্যা।

২৮ ডিসেম্বর : খুলনার দৌলতপুরে শ্রমিক লীগ নেতা আবু সুফিয়ানকে হত্যা।

AMARBOI.COM

১৯৭৩

২ জানুয়ারি : পটুয়াখালীতে ছাত্রলীগ নেতা মীরজাহানকে অপহরণ ও হত্যা। একই দিনে ঝিনাইদহে আওয়ামী লীগ কর্মী মোসলেম উদ্দিনকে গুলি করে হত্যা।

৩ জানুয়ারি : বাকেরগঞ্জের মঠবাড়িয়ায় সাবেক গণপরিষদ সদস্য ও আওয়ামী লীগ নেতা সওগাতুল আলম সগীর আততায়ীর গুলিতে নিহত।

১১ জানুয়ারি : ঘিওরে বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা সন্তোষ চক্রবর্তী ও তাঁর ছোট ভাই মনোতোষ চক্রবর্তী দুষ্কৃতকারীদের হাতে নিহত।

২১ জানুয়ারি : বরিশালে ছাত্রলীগ নেতা আবদুল বারিক নিহত।

২৭ জানুয়ারি : কুষ্টিয়ার মিরপুর থানার চিথলিয়া ইউনিয়নের রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগ কর্মী সিরাজ নিহত।

২৮ জানুয়ারি : কুমিল্লার মুরাদনগরে আওয়ামী লীগ কর্মী দীপক দুষ্কৃতকারীদের গুলিতে নিহত।

১১ ফেব্রুয়ারি : কুষ্টিয়ার বাহাদুরপুর ইউনিয়ন কর্মী নুরুজ্জামান নিহত।

২ মার্চ : কুষ্টিয়ায় আওয়ামী লীগ নেতা ফকীর মোহাম্মদ গুলিতে নিহত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৯ মার্চ : নেত্রকোনার তেলিগাতী কৃষক লীগ কার্যালয়ে প্রতিপক্ষের বোমায় তিনজন আওয়ামী লীগ কর্মী নিহত।

১০ মার্চ : গজারিয়া থানার আওয়ামী লীগ কর্মী মোশাররফ হোসেন গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত।

৬-৮ মার্চ : জয়পুরহাটে তিনজন আওয়ামী লীগ কর্মী হত্যা।

১২ মার্চ : মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইরে আওয়ামী লীগ নেতা আবদুস সালাম আততায়ীর ছুরিকাঘাতে নিহত।

১৮ মার্চ : আওয়ামী যুবলীগের সাংগঠনিক কমিটির সদস্য আতাউল আল ফারুক নিহত। একই দিনে নোয়াখালীতে আবুল বাশার ও দিনাজপুরে ছাত্রলীগ নেতা কবিরউদ্দিন আততায়ীর গুলিতে নিহত।

১ এপ্রিল : মনোহরদীর আওয়ামী লীগ কর্মী আবদুল মজিদ নিহত।

৮ এপ্রিল : কিশোরগঞ্জের কাতিয়াদী থানার আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ জামিল (রমু মিয়া) আততায়ীর গুলিতে নিহত।

১৮ এপ্রিল : শালিখায় আওয়ামী লীগ কর্মী আবদুল গণি নিহত।

৩০ মে : ফরিদপুর জেলার নড়িয়া এলাকা থেকে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য নূরুল হক আততায়ীর গুলিতে নিহত।

৩ জুন : বগুড়া আওয়ামী যুবলীগ সদস্য আবদুর রহমান নিহত।

৫ জুন : বৈদ্যেরবাজার যুবলীগ আহ্বায়ক আবদুল বাতেন নিহত।

১০ জুন : নীলফামারীর খোকসা পলাশবাড়ী ইউনিয়নের আওয়ামী লীগ নেতা তনুভূষণ রায়কে গুলি করে হত্যা।

৩ জুলাই : রমনা যুবলীগ নেতা আনোয়ার হোসেনকে পিটিয়ে হত্যা।

৬ জুলাই : ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জমির উদ্দিন আহমদকে গলা কেটে হত্যা।

১০ জুলাই : চাঁপাইনবাবগঞ্জের আওয়ামী লীগ নেতা মোজাফফর হোসেন নিহত।

১ আগস্ট : বেলকুচি থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল খালেক দুষ্কৃতকারীদের গুলিতে নিহত। একই দিনে রাজশাহীর বাগমারায় আওয়ামী লীগ কর্মী আজাহার আলী গুলিতে নিহত।

১৬ আগস্ট : রাজবাড়ী জেলা আওয়ামী লীগ নেতা, রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান অমলকৃষ্ণ চক্রবর্তীকে মুখোশধারীরা হত্যা করেছে। একই দিন বৈদ্যেরবাজারে ছাত্রলীগ কর্মী শিবু চন্দ্রকে হত্যা করা হয়।

১৮ আগস্ট : গাইবান্ধায় আওয়ামী লীগ কর্মী খলিলুর রহমান নিহত, একই দিন ফতুল্লায় আওয়ামী লীগ নেতা আবদুর রহমান নিহত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২১ আগস্ট : পাবনার শাহজাদপুরে আওয়ামী লীগ নেতা ফখরুল ইসলামসহ দুজন গুলিতে নিহত।

২৩ আগস্ট : দিনাজপুরে তিনজন আওয়ামী লীগ কর্মী নিহত। এঁরা হচ্ছেন নরেন্দ্রনাথ শীল, বিপিন সাহা ও নজিবুর রহমান।

২৫ সেপ্টেম্বর : পালং থানা যুবলীগ সভাপতি ইদ্রিস আলী নিহত।

২৯ সেপ্টেম্বর : মাদারীপুরে ছাত্রলীগ কর্মী আবদুল মোতালেব নিহত।

১১ অক্টোবর : বাকেরগঞ্জ থানা আওয়ামী লীগ নেতা কুমুদ বনু নিহত।

১৩ অক্টোবর : মাধবপুর থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি দুলাল মিয়াকে হত্যা করা হয়।

২০ অক্টোবর : নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী লীগ কর্মী আলাউদ্দিন নিহত।

৩ নভেম্বর : যশোরের ফুলতলা থানা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক তোবারক হোসেন নিহত।

৬ নভেম্বর : রংপুর জেলা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক নূরুল ইসলাম আততায়ীর হাতে নিহত।

১০ নভেম্বর : সীতাকুণ্ড থানা আওয়ামী লীগ সহসভাপতি আমিরুজ্জামান ছুরিকাঘাতে নিহত।

২৪ ডিসেম্বর : দোহারে ছাত্রলীগ কর্মী হারুন নিহত।

২৮ ডিসেম্বর : চাঁপাইনবাবগঞ্জের আওয়ামী লীগ নেতা সিরাজুল হক নিহত।

AMARBOI.COM

১৯৭৪

১০ জানুয়ারি : জাতীয় সংসদ সদস্য ও ভোলা জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি মোতাহের উদ্দিন আহমেদ আততায়ীর গুলিতে নিহত।

১১ জানুয়ারি : মাদারীপুর জেলার ছাত্রলীগ নেতা সেকান্দর আলী দুষ্কৃতকারীদের হাতে নিহত।

১২ জানুয়ারি : মানিকগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের কৃষি সম্পাদক আমজাদ হোসেন ও পাবনার আওয়ামী লীগ নেতা নকিব আলী গুলিতে নিহত।

৩০ জানুয়ারি : মানিকগঞ্জ জেলা যুবলীগ সদস্য আবদুল খালেককে গুলি করে হত্যা।

১৩ ফেব্রুয়ারি : মাদারীপুরের আওয়ামী লীগ নেতা সরদার শাজাহান দুষ্কৃতকারীদের গুলিতে নিহত।

১ মার্চ : যশোর জেলা ছাত্রলীগ নেতা একরামুল কবির গুলিতে নিহত।

৭ মার্চ : পটুয়াখালীতে আওয়ামী লীগ নেতা আবুল কাশেম আততায়ীর হাতে নিহত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৬ মার্চ : মনোহরদী থানার সংসদ সদস্য গাজী ফজলুর রহমান মুখোশধারীদের গুলিতে নিহত।

২৩ মার্চ : শ্রীপুরে আওয়ামী লীগ নেতা শাহাবুদ্দিন মণ্ডল গুলিতে নিহত।

৩০ মার্চ : হবিগঞ্জ জেলা যুবলীগ সভাপতি আবদুল মতিন নিহত।

৫ এপ্রিল : মুহসীন হলে সাতজন ছাত্রলীগ কর্মী নিহত।

২০ মে : মাদারীপুরে গৌসাইরহাট থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি জামালউদ্দিন আততায়ীর গুলিতে নিহত।

২২ মে : বরিশালে যুবলীগ নেতা এস এম ইলিয়াস হিরু ও মঞ্জুরুল হক ফিরোজ এবং রাজবাড়ীর পাংশায় যুবলীগ নেতা মানস কুমার সাহা নিহত।

৮ জুন : নারায়ণগঞ্জ জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি গোলাম মহিউদ্দিন শাহাজান গুলিতে নিহত।

১৩ জুন : মাদারীপুর জেলা আওয়ামী লীগ নেতা হারুনুর রশিদ (নিরু) আততায়ীর গুলিতে নিহত।

১০ জুলাই : বরিশাল জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সরদার জালাল উদ্দিন আততায়ীর গুলিতে নিহত।

১ আগস্ট : ময়মনসিংহ আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ সাবেক এমসিএ অ্যাডভোকেট ঈমান আলী গুলিতে নিহত। দৌলতপুর থানা আওয়ামী লীগ নেতা মারা যান ছুরিকাঘাতে।

১২ আগস্ট : মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুর রশিদ গুলিতে নিহত। রেজিস্ট্রি অফিসে ১২ থেকে ১৩ জনের একটি দল নৌকায় করে এসে তাকে হত্যা করে। দুর্বৃত্ত দলে একজন মহিলা ছিল। মাদারীপুরে ছাত্রলীগ নেতা সিরাজ সরদার ও ওমর আলী টেপাকে গুলি করে হত্যা।

১৪ সেপ্টেম্বর : শালিখা থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি মধুসূদন কুণ্ডু গুলিতে নিহত।

৬ অক্টোবর : টাঙ্গাইল মধুপুর থানা আওয়ামী লীগ নেতা মহেন্দ্র লাল বর্মণ অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির গুলিতে নিহত।

২০ অক্টোবর : গৌরনদীতে আওয়ামী লীগ নেতা শামসুল হক বিশ্বাসসহ পরিবারের চারজন নিহত।

২৯ অক্টোবর : ঝালকাঠির কাঁঠালিয়া থানা আওয়ামী লীগ সম্পাদক রহমান লস্কর আততায়ীর গুলিতে নিহত।

৩ ডিসেম্বর : রাজবাড়ীতে ছাত্রলীগ কর্মী শাজাহান নিহত।

৪ ডিসেম্বর : ফরিদপুর জেলার আওয়ামী লীগ নেতা আবু ইউসুফ আমিনুদ্দিন গুলিতে নিহত।

৮ ডিসেম্বর : নরসিংদী কলেজের ভিপি হারুনুর রশিদ নিহত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১০ ডিসেম্বর : মোহাম্মদপুর থানা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী প্রধান আলী আজম গুলিতে নিহত।

২৭ ডিসেম্বর : কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ঈদের নামাজ আদায়কালে সংসদ সদস্য গোলাম কিবরিয়া নিহত।

৩০ ডিসেম্বর : চুয়াডাঙ্গায় ছাত্রলীগ নেতা এহসানুল হক নিহত।

৩১ ডিসেম্বর : চুয়াডাঙ্গায় আওয়ামী লীগ কর্মী কামরুল ইসলাম নিহত।

১৯৭৫

২ জানুয়ারি : পাবনার কাশীনাথপুরে যুবলীগ নেতা মো. কোরবান আলী নিহত। পাবনায় আওয়ামী লীগ কর্মী শাহআলম গুলিতে নিহত।

৯ জানুয়ারি : মাদারীপুর নড়িয়া থানা আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল গণি শেখ গুলিতে নিহত। উজিরপুরে যুবলীগ সভাপতি আবদুর রহমান নিহত।

১৩ জানুয়ারি : দোহারে আওয়ামী লীগ নেতা সিরাজউদ্দিন হোসেন গুলিতে নিহত।

৭ ফেব্রুয়ারি : নাটোরে আওয়ামী লীগ কর্মী সাবের আলী নিহত।

৮ ফেব্রুয়ারি : ময়মনসিংহে যুবলীগ কর্মী আবদুস সোবহান নিহত।

২৪ ফেব্রুয়ারি : নেত্রকোনার সংসদ সদস্য আবদুল খালেক দুর্বৃত্তদের গুলিতে নিহত।

১২ মার্চ : সাতকানিয়ায় বাকশাল কর্মী আশুতোষ মহাজন খুন।

১৮ মার্চ : পাংশা থানা বাকশাল সভাপতি জোনাব আলী ও কর্মী ইয়াকুব আলী গুলিতে নিহত। চাটমোহর, বাকশাল নেতা আবুল কাসেম গুলিতে নিহত।

২০ মার্চ : সিরাজগঞ্জে যুবলীগ নেতা আবদুল হামিদ খুন।

২১ মার্চ : বগুড়ায় যুবলীগ নেতা মোস্তাফিজুর রহমান নিহত।

১২ এপ্রিল : নড়াইলে বাকশাল নেতা অমরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস নিহত।

১৩ এপ্রিল : ময়মনসিংহের যুবলীগ নেতা মাজহারুল ইসলাম গুলিতে নিহত। রাজবাড়ীর বাকশাল নেতা শাহ মোহাম্মদ হোসেন আততায়ীর গুলিতে নিহত।

২৫ এপ্রিল : কুষ্টিয়ায় বাকশাল নেতা মমতাজ আলী নিহত।

৮ মে : নোয়াখালীতে ছাত্রলীগ নেতা কামাল আহমেদ নিহত। আটারবাড়ীতে বাকশাল কর্মী ফজলুল হক নিহত।

১১ মে : নোয়াখালীতে ছাত্রলীগ নেতা কামালুদ্দিন খুন।

১৬ মে : হরিণাকুণ্ডুতে বাকশাল কর্মী ডা. গিরিন্দ্রনাথ নিহত।

২৮ মে : ঘাটাইল থানা বাকশাল সম্পাদক কলিমুর রহমান গুলিতে নিহত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৮ মে : পাকুটিয়ায় বাকশাল কর্মী তোতামিয়া ও পরশু থানা যুবলীগ কর্মী ইলিয়াস হোসেন গুলিতে নিহত। বামাইলে বাকশালের সম্পাদক কলিমুর রহমান বাঙালি ব্রাশফায়ারে নিহত।

১ জুন : চুয়াডাঙ্গা বাকশালের কোষাধ্যক্ষ দোস্ত মোহাম্মদ আনসারী গুলিতে নিহত।

২ জুন : টুঙ্গিপাড়ার বাকশাল নেতা সোহরাব হোসেন নিহত।

২ জুন : বৈদ্যেরবাজারে বাকশাল কর্মী রহমান আলী মিয়া নিহত।

৮ জুন : কোম্পানীগঞ্জে বাকশাল সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম গুলিতে নিহত।

১৮ জুন : জাতীয় শ্রমিক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আবদুল রশীদ লেবু আততায়ীর গুলিতে নিহত।

১৮ জুন : দিনাজপুরে বাকশাল নেতা শহিদুল হক বুলু নিহত।

২৫ জুন : জয়দেবপুর থানা বাকশাল নেতা কফিলউদ্দিন ও কর্মী শহর আলী নিহত।

৪ জুলাই : শ্রীপুর থানা বাকশাল নেতা মনিরউদ্দিন ফকির ও কর্মী আবদুর হালিম মাস্টারকে গুলি করে হত্যা।

১৭ জুলাই : পাঁচবিবি বাকশাল নেতা মনিরউদ্দিন ফকির ও কর্মী আবদুর হালিম মাস্টারকে গুলি করে হত্যা।

১৭ জুলাই : পাঁচবিবি বাকশাল নেতা আলাউদ্দিন আহমেদ গুলিতে নিহত।

১ আগস্ট : রামু থানা বাকশাল নেতা আজিজুল ইসলাম নিহত।

৩ আগস্ট : বগুড়ায় বাকশাল কর্মী আফতাফউদ্দিন নিহত।

[তালিকাটি দৈনিক *বাংলার বাণী* পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে তৈরি]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬

থানা-পুলিশ ফাঁড়িতে হামলা, লুট ও রক্ষীবাহিনীর ওপর আক্রমণ

১২ জুন '৭৩ : খুলনার ফকিরহাট থানার বেতাগী ফাঁড়িতে হামলা।
১৩ জুন '৭৩ : বগুড়া জেলার গাবতলী থানায় হামলা।
১৮ জুন '৭৩ : রাজশাহীর নিয়ামতপুর থানার ছাতড়া ফাঁড়ি লুট।
১৯ জুন '৭৩ : বরিশালের নলছিটি থানার কাঁটাখালী ফাঁড়িতে হামলা।
২৬ জুন '৭৩ : বরিশালের কাঠালিয়া থানার আমুয়া ফাঁড়ি লুট।
২৮ জুন '৭৩ : বরিশালের চরফ্যাশন থানা লুট।
২৯ জুন '৭৩ : রামগড়ের জালিয়া ফাঁড়িতে হামলা।
২ জুলাই '৭৩ : বরিশালের লালমোহন থানা লুট।
৩ জুলাই '৭৩ : খুলনার মোরেলগঞ্জ থানার হেলিগাতি ফাঁড়িতে হামলা।
৮ জুলাই '৭৩ : পটুয়াখালীর পাথরঘাটা থানার চরকুয়ানী এবং বরিশালের বাউফল থানার বগা ফাঁড়িতে হামলা।
৯ জুলাই '৭৩ : বৈদ্যেরবাজার থানার অলিপুর ফাঁড়ি লুট।
৯ জুলাই '৭৩ : গোপালগঞ্জের পাটগাথিয়া পুলিশ ফাঁড়িতে হামলা।
১২ জুলাই '৭৩ : বরিশালে বাউফল থানার ধুলিয়া ফাঁড়ি লুট।
২৫ জুলাই '৭৩ : বৃহত্তর ঢাকার লৌহজং থানা লুট।
২৫ জুলাই '৭৩ : ফরিদপুরের কোতোয়ালি থানার রামকৃষ্ণ মিশন ফাঁড়ি লুট।
৩০ জুলাই '৭৩ : চট্টগ্রামের বোয়ালখালী থানা লুট।
৩০ জুলাই '৭৩ : ময়মনসিংহের গফরগাঁও থানার দত্তেরগাঁও ফাঁড়িতে হামলা।
১ আগস্ট '৭৩ : ঢাকা জেলার ঘিওর থানার জাবড়া ফাঁড়ি লুট।
২ আগস্ট '৭৩ : কুষ্টিয়ার মিরপুর থানার আমলা ফাঁড়ি লুট।
৫ আগস্ট '৭৩ : বৃহত্তর ঢাকার শিবপুর থানায় হামলা।
৭ আগস্ট '৭৩ : বরিশালের বাবুগঞ্জ থানায় হামলা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৯ আগস্ট '৭৩ : কুষ্টিয়ার মিরপুর থানার আটগ্রাম ফাঁড়িতে হামলা।
১০ আগস্ট '৭৩ : ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ থানার উচাখিলা ফাঁড়ি লুট।
১০ আগস্ট '৭৩ : চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানার চুনটি ফাঁড়িতে হামলা।
১৩ আগস্ট '৭৩ : বরিশালের স্বরূপকাঠি থানার ইন্দেরহাট ফাঁড়ি লুট।
১৩ আগস্ট '৭৩ : ঢাকার কাপাসিয়া থানায় হামলা।
১৫ আগস্ট '৭৩ : পার্বত্য চট্টগ্রামের লামা থানার ফৈথান ফাঁড়িতে হামলা।
২০ আগস্ট '৭৩ : লৌহজংয়ে সশস্ত্র দুর্বৃত্ত ও রক্ষীবাহিনীর মধ্যে তিন ঘণ্টা গুলিবিনিময়।
২৩ আগস্ট '৭৩ : কুমিল্লার হোমনা থানার চন্দনাপুর ফাঁড়ি লুট।
২৫ আগস্ট '৭৩ : বৈদ্যেরবাজারের আনন্দবাজার হাট থেকে নয় ব্যক্তি অপহরণ ও সাতজনকে হত্যা।
১ সেপ্টেম্বর '৭৩ : ময়মনসিংহের ত্রিশাল থানার ধানিখোলা ফাঁড়ি লুট।
১ সেপ্টেম্বর '৭৩ : কুষ্টিয়ার চুয়াডাঙ্গা থানার শরৎগঞ্জ ফাঁড়িতে হামলা।
২ সেপ্টেম্বর '৭৩ : আরিচা ফেরিতে রক্ষীবাহিনী ও দুর্বৃত্তদের মধ্যে গুলিবিনিময়ে চারজন নিহত। (নিহতদের মধ্যে রক্ষীবাহিনীর ডেপুটি লিডার গুলজার ও ২ জন রক্ষী এবং আহতদের মধ্যে লিডার হাবিবুর রহমান)।
৩ সেপ্টেম্বর '৭৩ : ফরিদপুরের কোতোয়ালি থানার চানপুর ফাঁড়ি লুট।
১৩ সেপ্টেম্বর '৭৩ : পটিয়া থানার কাশিরপুর ফাঁড়িতে হামলা।
২৮ সেপ্টেম্বর '৭৩ : রাজশাহীর বাঘমারা থানার দামনাস ফাঁড়ি লুট। ৮ পুলিশকে হত্যা।
৩ অক্টোবর '৭৩ : পাবনার শাহজাদপুরে সশস্ত্র সন্ত্রাসী ও রক্ষী সদস্যদের মধ্যে গুলিবিনিময়ে আটজন নিহত।
৪ অক্টোবর '৭৩ : মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া থানা ও খাদ্যগুদাম লুট।
৬ অক্টোবর '৭৩ : ময়মনসিংহের বারহাট্টা থানায় হামলা।
৭ অক্টোবর '৭৩ : চুয়াডাঙ্গায় ১৪টি হত্যাকাণ্ড।
৯ অক্টোবর '৭৩ : যশোরের হরিণাকুণ্ডু থানা লুট।
১২ অক্টোবর '৭৩ : চুয়াডাঙ্গায় জেল ভেঙে ১৪ জনের পলায়ন।
১৩ অক্টোবর '৭৩ : কুষ্টিয়ার মিরপুর থানার হালসা ফাঁড়ি লুট।
১৩ অক্টোবর '৭৩ : টাঙ্গাইল থানার পোড়াবাড়ী ফাঁড়িতে হামলা।
১৭ অক্টোবর '৭৩ : কুষ্টিয়ার মিরপুর থানার খাদিমপুর ফাঁড়িতে হামলা।
২১ অক্টোবর '৭৩ : বরিশাল উজিরপুর থানার হারতা ফাঁড়ি লুট।
২৩ অক্টোবর '৭৩ : রাজশাহীর তানোর থানার পাচন্দর ফাঁড়িতে হামলা।
২৫ অক্টোবর '৭৩ : ফরিদপুরে বালিয়াকান্দি থানা লুট।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৬ অক্টোবর '৭৩ : বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জ থানার ভাসানচর ফাঁড়ি লুট, ৩ পুলিশ নিহত।

২৮ অক্টোবর '৭৩ : পটুয়াখালীর পাথরঘাটা থানা লুট।

২ নভেম্বর '৭৩ : টাঙ্গাইল থানার পাথরাইল ফাঁড়ি লুট।

২২ নভেম্বর '৭৩ : সিলেটের বালাগঞ্জ থানা লুট।

২৩ নভেম্বর '৭৩ : বৃহত্তর ঢাকার কালীগঞ্জ থানার বারোবাজার ফাঁড়িতে হামলা।

২৫ নভেম্বর '৭৩ : রাজশাহীর তানোর থানার পাচন্দর ফাঁড়ি লুট।

২৯ নভেম্বর '৭৩ : কুমিল্লার মতলব থানা লুট।

৫ ডিসেম্বর '৭৩ : ঢাকার সিঙ্গাইর থানায় হামলা।

১২ ডিসেম্বর '৭৩ : চট্টগ্রামের চন্দ্রখোলা থানা লুট।

১২ ডিসেম্বর '৭৩ : লক্ষ্মীপুর থানার দিঘলী ফাঁড়ি লুট।

১৫ ডিসেম্বর '৭৩ : বরিশালের নলছিটি থানায় হামলা।

১৫ ডিসেম্বর '৭৩ : লৌহজং থানায় সর্বহারা পার্টির হামলা। রক্ষীবাহিনীর লিডার ফারুক হোসেন নিহত।

১৫ ডিসেম্বর '৭৩ : মানিকগঞ্জ থানায় সর্বহারা পার্টির হামলা।

[সূত্র : *বাংলাদেশের তারিখ*, (১৯৭৭ সাল পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনার কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জি), মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা]

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭

রক্ষীবাহিনীর চতুর্থ ব্যাচের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ উপলক্ষে প্রকাশিত স্যুভেনিরের মুখবন্ধ

জাতীয় রক্ষীবাহিনীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

১. স্বাধীনতা অর্জন এবং একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশের পশ্চাৎপটে ছিল অসাধারণ আত্মত্যাগের ইতিহাস। তিরিশ লাখের বেশি মানুষ জীবন দিয়েছিলেন, প্রায় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছিল দেশের পুরো অর্থনৈতিক কাঠামো। বিশ্বের কোনো দেশকে মুক্তির জন্য এত চরম মূল্য দিতে হয়নি। মুক্তির জন্য অদম্য স্পৃহা সাধারণ মানুষকে একতাবদ্ধ করেছিল, তাঁরা ছিলেন দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ এবং অসম সাহসী। এসবই অসম্ভব এক যুদ্ধজয়কে সম্ভব করেছিল। চরম মূল্যের বিনিময়ে অর্জিত এই স্বাধীনতাকে রক্ষার জন্য আন্তরিকতার সঙ্গে সার্বক্ষণিক নজরদারির প্রয়োজন অনুভূত হলো।

২. দখলদার সেনাবাহিনীর কব্জা থেকে দেশকে মুক্ত করতে সর্বস্তরের মানুষ কোনো না কোনোভাবে অবদান রেখেছেন। মুক্তিযুদ্ধকালে এ মাটির সোনার ছেলেরা অকাতরে প্রাণ দিয়েছেন। দেশের প্রতিটি প্রান্ত থেকে, প্রতিটি গৃহস্থালি থেকে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। এমন একটি পরিবার খুঁজে পাওয়া দুষ্কর, যে পরিবারের একজনও প্রাণ হারাননি। সাধারণ মানুষ নিজ উদ্যোগে সংঘবদ্ধ হয়েছেন, সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন, নিজেদের উৎসর্গ করেছেন। নিরস্ত্র মানুষ অস্ত্র সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন পুলিশ স্টেশনে বা দখলদার বাহিনীর স্থাপনায় হানা দিয়েছেন। এ কাজ করতে গিয়ে স্বাধীনতার বেদিমূলে তাঁদের অনেককেই জীবন উৎসর্গ করতে হয়েছে। এই অতুলনীয় আত্মত্যাগ সাড়ে সাত কোটি মানুষের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন সফল করতে সহায়তা করেছিল, সম্পূর্ণ পরাজিত হয়েছিল পাকিস্তানের বর্বর শক্তি। এই মুক্তিযোদ্ধারা যাঁরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন, তাঁরা যুদ্ধের পর বঙ্গবন্ধুর পরবর্তী আহ্বানের অপেক্ষায় ছিলেন। তাঁদের সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ হলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩. পাকিস্তান সরকারের কব্জা থেকে মুক্তিলাভের পর বঙ্গবন্ধু সব মুক্তিযোদ্ধাকে অস্ত্রসমর্পণের আহ্বান জানালেন, বললেন তাঁরা যেন তাঁদের মূল পেশায় বা কাজে-কর্মে ফিরে যান।

৪. তখন পর্যন্ত দেশের স্বার্থে অনেক দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধার সম্পৃক্ততার প্রয়োজন ছিল। সে অনুযায়ী, এই দেশপ্রেমিক বীরদের নিয়ে নতুন একটি বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত হলো।

৫. জেনারেল এম এ জি ওসমানী, পিএসসি (অবসরপ্রাপ্ত) বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়কের (তৎকালীন) পরামর্শে এ বাহিনীর দায়িত্ব নিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল (তখন মেজর) আ ন ম নূরুজ্জামান। তিনি এ সংগঠনের পরিচালক নিযুক্ত হলেন।

৬. এভাবেই ১৯৭২ সালের ২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠিত হলো। এ বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্য ছিল মাতৃভূমিকে রক্ষার মতো একটি মহৎ কাজে যেন অনিয়মিত মুক্তিযোদ্ধারা একটি সমন্বিত ও নিয়মতান্ত্রিক বাহিনীর সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে পারে। বিভিন্ন সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা এই বাহিনীতে নিজেদের যুক্ত করলেন।

৭. রক্ষীবাহিনীর মূল দলে ছিলেন দেশের সেরা বীর সেনা, যাঁরা সৈনিকদের আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ছাড়া যুদ্ধ করে নতুন এবং অসাধারণ একটি ঐতিহ্যের সূচনা করেছিলেন। জাতীয় রক্ষীবাহিনী নিজেদের বিসর্জনে প্রস্তুত যুবাদের একটি ফোরামে পরিণত হলো। এর মাধ্যমে তাঁরা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটির দ্রুত পুনর্গঠনে নিজেদের শক্তি, সাহস, দেশপ্রেম কাজে লাগানোর সুযোগ পেলেন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শান্তি বজায় রাখাটা অপরিহার্য ছিল। অভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পেল নতুন এই বাহিনী।

৮. মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সফরকালে অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মতো রক্ষীবাহিনীকেও আইনশৃঙ্খলা-পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দেওয়া হলো। সে সময় রক্ষীবাহিনী শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষায় প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে, যদিও সে সময়ে সম্মানিত অতিথিকে একনজর দেখার আশায় শহরজুড়ে বহু মানুষের সমাগম হয়েছিল।

৯. ২৬ মার্চ, ১৯৭২ সালে জাতীয় রক্ষীবাহিনীর দুটি কন্টিনজেন্ট প্রথম স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবসের প্যারেডে অংশ নেয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ওই অনুষ্ঠানে সালাম গ্রহণ করেন।

১০. একটা সামান্য আঁচড় থেকে রক্ষীবাহিনীর মতো একটি বাহিনী গড়ে তোলা খুব সহজ কাজ ছিল না। প্রাথমিক পর্যায়ে এ বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার মতো উপযুক্ত জায়গা ছিল না। এটা ছিল একটা বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা। ঢাকার কাছে সাভারে ছিল আনসার প্রশিক্ষণের সদর দপ্তর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ জায়গাটিকেই রক্ষীবাহিনীর প্রশিক্ষণের জন্য বেছে নেওয়া হলো। '৭২-এর মে মাসে এখানেই বেশ কিছু ছাউনি দিয়ে ঘর তুলে জাতীয় রক্ষীবাহিনী প্রশিক্ষণকেন্দ্র গড়ে তোলা হলো। রক্ষীদের তৃতীয় ব্যাচ, যারা আজ প্যারেড করছে তাদের একটা কঠিন সময় পেরোতে হয়েছে। অস্থায়ী ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত সাভারের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এদের থাকতে হয়েছিল। কিন্তু হাসিমুখে সেই কঠিন জীবনের সব যন্ত্রণা তারা সয়ে নিয়েছিল। প্রশিক্ষণও নিয়েছিল পরম ধৈর্য এবং সংযমের সঙ্গে।

১১. স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে যে সহযোগিতা ও উৎসাহ আমরা পেয়েছিলাম, তা অতুলনীয়। জাতীয় রক্ষীবাহিনীর কর্মকর্তারা তখন সাভারে জাতীয় রক্ষীবাহিনী প্রশিক্ষণকেন্দ্র গঠনের কাজে নানা প্রতিবন্ধকতার শিকার হচ্ছিলেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাভার ডেইরির কর্মকর্তারা এঁদের ভীষণভাবে উজ্জীবিত করেছিলেন। আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁদের অবদান স্মরণ করি।

১২. ১৯৭২ সালের ২১ জুন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রক্ষীবাহিনীর প্রথম ব্যাচের মার্চপাস্টে সালাম গ্রহণ করেন। এই ব্যাচটি চারটি ব্যাটালিয়ন নিয়ে গঠিত হয়েছিল।

১৩. জাতীয় রক্ষীবাহিনীর দ্বিতীয় ব্যাচটি পাঁচটি ব্যাটালিয়ন নিয়ে গঠিত হয়েছিল। এই ব্যাচটির 'পাসিং আউট' উপলক্ষে সাভারে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সালাম গ্রহণ করেন। ১৯৭২-এর ৬ ডিসেম্বরের সে অনুষ্ঠানটি প্রত্যক্ষ করেন মন্ত্রীসহ বিদেশি সব দূতাবাসের কূটনীতিক, তিন বাহিনীর প্রধানেরা এবং বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

১৪. এমনকি সকালে প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে যে ব্যাটালিয়নটির (৬ ডিসেম্বর, ৭২) সেটিকেও ঢাকায় ছুটতে হয়েছে আইনশৃঙ্খলা-পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য। অবশিষ্ট চারটি ব্যাটালিয়নকে ডিসেম্বরের মধ্যেই বিভিন্ন সাব-ডিভিশনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

১৫. ১৯৭২-এর ২৫ জুন থেকে জাতীয় রক্ষীবাহিনীকে দেশজুড়ে বিভিন্ন কাজে সম্পৃক্ত করা হয়। জাতীয় রক্ষীবাহিনী যেসব দায়িত্ব পালন করত তার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো।

ক. বেষ্টনী দেওয়া ও খানাতল্লাশি করা।

খ. সমাজ ও রাষ্ট্রবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা।

গ. আদমজীনগর, নারায়ণগঞ্জ, টঙ্গী, খুলনা ও চট্টগ্রামসহ শিল্পাঞ্চলগুলোয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা।

ঘ. চট্টগ্রাম, খুলনা ও চালনা বন্দরে দায়িত্ব পালন করা।

ঙ. আইডব্লিউটিসি, ব্যাংক ও অন্যান্য শিল্প স্থাপনার নির্বিঘ্নে চলা নিশ্চিত করা।

চ. সারা দেশে এসএসসি, এইচএসসি এবং ডিগ্রি পরীক্ষা পরিচালনায় সাহায্য করা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছ. নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করা। থানা পর্যায় পর্যন্ত নির্বাচনে রক্ষীবাহিনী অতিরিক্ত বাহিনী হিসেবে মোতায়েন থাকত। তবে এই বাহিনীকে ভোটকেন্দ্রের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে ব্যবহার করা হতো না।

জ. গুপ্ত ও খোয়া যাওয়া অস্ত্র, লুট হওয়া মালামাল উদ্ধার এবং আবাসিক ভবন থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের উচ্ছেদের কাজে রক্ষীবাহিনী নিয়োজিত ছিল।

ঝ. রেলগাড়ি ও স্টিমারে টিকিট ছাড়া কেউ ভ্রমণ করছে কি না, তা দেখা।

ঞ. সেনাবাহিনী, সীমান্ত রক্ষাকারী বাহিনী ও পুলিশের সঙ্গে যৌথভাবে দেশের বিভিন্ন জায়গায় সমাজবিরোধী লোকজনকে আটক করা।

বিশ্বস্ততার সঙ্গে আন্তরিকভাবে এসব দায়িত্ব পালন করায় রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা সাধারণ মানুষ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনেক প্রশংসা কুড়ায়। জাতীয় দৈনিকগুলোর একটি বড় অংশজুড়ে থাকত রক্ষীরা কী কী দায়িত্ব পালন করছে তার খবর দিয়ে। আর এ কথা বলাই বাহুল্য, সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে রক্ষীরা নানা প্রতিবন্ধকতা ও চাপের মুখে পড়ছিল।

১৬. '৭৩-এর ২ ফেব্রুয়ারি রক্ষীবাহিনীর প্রথম 'রেইজিং ডে'তে জাতীয় রক্ষীবাহিনী অলিম্পিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকায় শারীরিক শিক্ষাকেন্দ্র প্রাঙ্গণে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শারীরিক শিক্ষাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ ও অন্য কর্মকর্তারা এ বৈঠকটি যেন নিখুঁত ও সুন্দর হয়, সে জন্য সব ধরনের সহযোগিতা করলেন।

১৭. ১৯৭৩-এর ২৬ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে রক্ষীবাহিনীর দুটি কোম্পানি আনুষ্ঠানিক প্যারেডে অংশ নেয়। এতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী সালাম গ্রহণ করেন।

১৮. ১৯৭৩-এর ৩১ মার্চ প্রথম জাতীয় অ্যাথলেটিক বৈঠকে সহকারী অধিনায়ক (এখন উপ-অধিনায়ক) হাবিবুর রহমান ম্যারাথন দৌড়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

১৯. সোহরাওয়ার্দী ফুটবল টুর্নামেন্টে প্রথমবারের মতো অংশ নিয়ে জাতীয় রক্ষীবাহিনী চূড়ান্ত পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। ওই টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত খেলাটি এখনো হয়নি।

২০. জাতীয় রক্ষীবাহিনীর পোশাক এখন বদলে ধূসর নীল বর্ণের করা হচ্ছে।

(ইংরেজি থেকে অনূদিত)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮

রক্ষীবাহিনীর কর্মকর্তা

ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা (১৯৭৫ পর্যন্ত)

১. পরিচালক : এ এন এম নূরুজ্জামান বীর উত্তম, ব্রিগেডিয়ার, পরে রাষ্ট্রদূত।
২. উপপরিচালক (প্রশাসন) : আবুল হাসান খান, লেফটেন্যান্ট কর্নেল।
৩. উপপরিচালক (অপারেশন) : সরোয়ার হোসেন মোল্লা (পরে কর্নেল, সচিব ও রাষ্ট্রদূত)।
৪. উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ) : আনোয়ার উল আলম (পরে কর্নেল, সচিব ও রাষ্ট্রদূত)।
৫. উপপরিচালক (সিগন্যাল) : সাবিহ উদ্দিন আহমেদ, লেফটেন্যান্ট কর্নেল (পরে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল)।
৬. উপপরিচালক (জোনাল কমান্ডার, চট্টগ্রাম) : এ কে এম আজিজুল ইসলাম, লেফটেন্যান্ট কর্নেল (পরে ব্রিগেডিয়ার)।
৭. উপপরিচালক (মেডিকেল) : এ এম খান, লেফটেন্যান্ট কর্নেল।
৮. সহকারী পরিচালক : শরিফ উদ্দিন আহমেদ, মেজর, (পরে ব্রিগেডিয়ার)।
৯. সহকারী পরিচালক : সালাহউদ্দিন, মেজর।
১০. সহকারী পরিচালক : এম এ হাসনাৎ।
১১. সহকারী পরিচালক : ফকির মোহাম্মদ।
১২. সহকারী পরিচালক : তৈয়বুর রহমান।

যাঁরা লিডার হিসেবে কর্মরত ছিলেন (১৯৭৫ পর্যন্ত)

১. মোজাফফর হোসেন (প্রথম ব্যাচ; পরে মেজর)।
২. লুৎফর রহমান (প্রথম ব্যাচ; পরে মেজর)।
৩. আকরাম হোসেন (প্রথম ব্যাচ; পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল)।
৪. নীতি ভূষণ সাহা (প্রথম ব্যাচ; পরে ক্যাপ্টেন)।
৫. তৈয়ব উদ্দিন খান (প্রথম ব্যাচ; পরে মেজর)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬. রাখাল চন্দ্র সাহা (প্রথম ব্যাচ; পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল)।
৭. আলমগীর হাওলাদার (প্রথম ব্যাচ; পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল, মৃত)।
৮. এস কে দলিল উদ্দিন (প্রথম ব্যাচ; পরে মেজর)।
৯. আক্তারুজ্জামান (প্রথম ব্যাচ; পরে মেজর)।
১০. সর্দার মিজানুর রহমান (প্রথম ব্যাচ; পরে ক্যাপ্টেন)।
১১. এ কে এম নুরুল হোসেন (প্রথম ব্যাচ; পরে মেজর)।
১২. শরীফ ওয়ালিউর রহমান (প্রথম ব্যাচ; পরে কর্নেল)।
১৩. সৈয়দ রফিকুল ইসলাম বীর প্রতীক (প্রথম ব্যাচ; পরে মেজর)।
১৪. গাজী বেলায়েত হোসেন (প্রথম ব্যাচ; পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল)।
১৫. মো. নুরুল হক তালুকদার (প্রথম ব্যাচ; পরে মেজর)।
১৬. মো. লিয়াকত আলী (প্রথম ব্যাচ; পরে মেজর)।
১৭. মো. আলাউদ্দিন (প্রথম ব্যাচ; লিডার)।
১৮. আবদুর রাজ্জাক (প্রথম ব্যাচ; লিডার)।
১৯. মো. হাবিবুল্লাহ (প্রথম ব্যাচ; লিডার)।
২০. সামছুল কবির (প্রথম ব্যাচ; লিডার)।
২১. লিয়াকত আলম চন্দন (প্রথম ব্যাচ; লিডার, মৃত)।
২২. সিরাজুল হক দেওয়ান (দ্বিতীয় ব্যাচ; পরে মেজর, মৃত)।
২৩. এ কে এম আবদুল আজিজ (দ্বিতীয় ব্যাচ; পরে মেজর)।
২৪. এস এম মহিউদ্দিন (দ্বিতীয় ব্যাচ; পরে মেজর)।
২৫. দীপক কুমার হালদার (দ্বিতীয় ব্যাচ; পরে ক্যাপ্টেন)।
২৬. সোহরাব আলী (দ্বিতীয় ব্যাচ; পরে মেজর)।
২৭. মো. ওয়াসিকুল আজাদ (দ্বিতীয় ব্যাচ; পরে মেজর, মৃত)।
২৮. সাখাওয়াত হোসেন (দ্বিতীয় ব্যাচ; পরে ক্যাপ্টেন)।
২৯. আনোয়ারুল ইসলাম (দ্বিতীয় ব্যাচ; পরে মেজর)।
৩০. সাইদুর রহমান (দ্বিতীয় ব্যাচ; পরে মেজর)।
৩১. সারওয়ার হোসেন (দ্বিতীয় ব্যাচ; পরে ক্যাপ্টেন, মৃত)।
৩২. সিরাজুল ইসলাম (দ্বিতীয় ব্যাচ; পরে মেজর)।
৩৩. মঈনুদ্দিন চৌধুরী (দ্বিতীয় ব্যাচ; পরে মেজর)।
৩৪. হাবিবুর রহমান (দ্বিতীয় ব্যাচ; পরে মেজর)।
৩৫. আলীমুজ্জামান জোয়ার্দার (দ্বিতীয় ব্যাচ; পরে মেজর)।
৩৬. সবেদ আলী মিয়া (দ্বিতীয় ব্যাচ; পরে মেজর)।
৩৭. জাহিদুল ইসলাম (দ্বিতীয় ব্যাচ; পরে মেজর)।
৩৮. সাহাব আলী মিয়া (দ্বিতীয় ব্যাচ; পরে ক্যাপ্টেন, মৃত)।
৩৯. দেবনাথ শংকর প্রসাদ (দ্বিতীয় ব্যাচ; পরে ক্যাপ্টেন, মৃত)।
৪০. সৈয়দ মঞ্জুরুল আলম (দ্বিতীয় ব্যাচ; পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪১. আবুল বাসার মোল্লা (দ্বিতীয় ব্যাচ; পরে ক্যাপ্টেন)।
৪২. এ কে এম নুরুল বাহার (দ্বিতীয় ব্যাচ; লিডার)।
৪৩. নুরুল ইসলাম (দ্বিতীয় ব্যাচ; পরে ক্যাপ্টেন, মৃত)।
৪৪. আবদুস সাত্তার (তৃতীয় ব্যাচ; পরে ক্যাপ্টেন, মৃত)।
৪৫. জাহাঙ্গীর আনোয়ার (তৃতীয় ব্যাচ; পরে মেজর)।
৪৬. কাজী আফতাব উদ্দিন (তৃতীয় ব্যাচ; লিডার)।
৪৭. আবু তাহের সরকার (তৃতীয় ব্যাচ; লিডার)।
৪৮. মো. খালেদ (তৃতীয় ব্যাচ; লিডার)।
৪৯. আবু বকর সিদ্দিক (চতুর্থ ব্যাচ; পরে মেজর, মৃত)।
৫০. শরীফুল ইসলাম, পিএসসি (চতুর্থ ব্যাচ; পরে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল)।
৫১. মঞ্জুরুল আলম, পিএসসি (চতুর্থ ব্যাচ; পরে মেজর জেনারেল)।
৫২. এইচ এম সাদেক (চতুর্থ ব্যাচ; পরে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল)।
৫৩. শাহজাহান মিয়া, পিএসসি (চতুর্থ ব্যাচ; পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল)।
৫৪. কে এ বি মঈনুদ্দিন (চতুর্থ ব্যাচ; পরে কর্নেল)।
৫৫. মহিউদ্দিন আহমেদ (চতুর্থ ব্যাচ; পরে মেজর)।
৫৬. আলতাফ হোসেন (চতুর্থ ব্যাচ; লিডার)।
৫৭. আইনাল কামাল (চতুর্থ ব্যাচ; লিডার)।
৫৮. শাহ জাকারিয়া (পঞ্চম ব্যাচ; পরে মেজর)।
৫৯. পরিতোষ কুমার রায় (পঞ্চম ব্যাচ; পরে মেজর)।
৬০. এন এ রফিকুল হোসেন, পিএসসি (পঞ্চম ব্যাচ; পরে মেজর জেনারেল)।
৬১. এম এম ইকবাল আলম, পিএসসি (পঞ্চম ব্যাচ; পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল)।
৬২. এস কে নুরুল আমিন, পিএসসি (পঞ্চম ব্যাচ; পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল)।
৬৩. আবদুল হাকিম তালুকদার (পঞ্চম ব্যাচ; পরে মেজর)।
৬৪. এ জেড এম বজলুল হক (পঞ্চম ব্যাচ; পরে কর্নেল)।
৬৫. এস এম সাহাদাত হোসেন (পঞ্চম ব্যাচ; পরে মেজর)।
৬৬. মো. রেজাউল হক (পঞ্চম ব্যাচ; পরে ক্যাপ্টেন)।
৬৭. আশরাফুল হাফিজ খান (পঞ্চম ব্যাচ; পরে ক্যাপ্টেন, শহীদ)।
৬৮. বনমালী রায় (পঞ্চম ব্যাচ; পরে মেজর)।
৬৯. এস এম ইকবাল হোসেন, পিএসসি (পঞ্চম ব্যাচ; পরে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল)।
৭০. আরশাদ আহমেদ খান, পিএসসি (পঞ্চম ব্যাচ; পরে কর্নেল)।
৭১. সুনীল কুমার সরকার (পঞ্চম ব্যাচ; পরে মেজর)।
৭২. এস এম মহিউদ্দিন (পঞ্চম ব্যাচ; পরে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল)।
৭৩. মো. সানাউল্লাহ মিয়া (পঞ্চম ব্যাচ; পরে মেজর)।
৭৪. মো. হাবিবুল্লাহ (পঞ্চম ব্যাচ; পরে মেজর)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭৫. এ কে আজাদ (পঞ্চম ব্যাচ; পরে মেজর, মৃত)।
৭৬. গোলাম আলী (পঞ্চম ব্যাচ; পরে মেজর, মৃত)।
৭৭. সৈয়দ এ খুরশিদ রেজা (পঞ্চম ব্যাচ; পরে মেজর)।
৭৮. এস এম বদরুজ্জামান (পঞ্চম ব্যাচ; পরে মেজর)।
৭৯. এ এফ এম কামরুল হাসান (পঞ্চম ব্যাচ; পরে মেজর)।
৮০. মহসিন তালুকদার (পঞ্চম ব্যাচ; পরে মেজর)।
৮১. আশরাফ কামাল (পঞ্চম ব্যাচ; পরে মেজর)।
৮২. মোবারক হোসেন (পঞ্চম ব্যাচ; পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল)।
৮৩. ওয়াহিদুর রহমান (পঞ্চম ব্যাচ; পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল)।
৮৪. আবদুল লতিফ হাওলাদার (পঞ্চম ব্যাচ; পরে মেজর)।
৮৫. এ টি এম এ হালিম (পঞ্চম ব্যাচ; পরে মেজর)।
৮৬. রেজাউল করিম হেলাল (পঞ্চম ব্যাচ; পরে মেজর)।
৮৭. মহসিন সিকদার (পঞ্চম ব্যাচ; পরে মেজর)।
৮৮. মফিজুল হক সরকার (পঞ্চম ব্যাচ; পরে মেজর)।
৮৯. মজিবুর রহমান (পঞ্চম ব্যাচ; পরে মেজর)।
৯০. কাজী ইমদাদুল হক (পঞ্চম ব্যাচ; পরে মেজর)।
৯১. আবদুল আহাদ (পঞ্চম ব্যাচ; পরে মেজর)।
৯২. এম এ বারেক সিকদার (পঞ্চম ব্যাচ; পরে মেজর)।
৯৩. নুরুর রহমান (পঞ্চম ব্যাচ; পরে মেজর)।
৯৪. বিশ্বাস আবু বকর (পঞ্চম ব্যাচ; পরে ক্যাপ্টেন)।
৯৫. নজরুল ইসলাম (পঞ্চম ব্যাচ; পরে মেজর)।
৯৬. মাসুদুল আলম (পঞ্চম ব্যাচ; পরে মেজর)।
৯৭. জোবেদ হোসেন (পঞ্চম ব্যাচ; পরে লেফটেন্যান্ট)।
৯৮. কাজী মাজেদুর রহমান (পঞ্চম ব্যাচ; লেফটেন্যান্ট)।
৯৯. শহীদ ফারুক হোসেন (পঞ্চম ব্যাচ; লিডার)।
১০০. সাইফুল আনোয়ার সরফু (পঞ্চম ব্যাচ; লিডার)।
১০১. এনামুল হক (পঞ্চম ব্যাচ; লিডার)।
১০২. ইলিয়াস হোসেন (ষষ্ঠ ব্যাচ; পরে ক্যাপ্টেন)।
১০৩. মাসুদউদ্দিন চৌধুরী, এনডিইউ, পিএসসি (ষষ্ঠ ব্যাচ; পরে লেফটেন্যান্ট জেনারেল)।
১০৪. শাহজাহান আলী, পিএসসি, জি+ (ষষ্ঠ ব্যাচ; পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল)।
১০৫. আসাদুল ইসলাম (ষষ্ঠ ব্যাচ; পরে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল)।
১০৬. দিলীপ কুমার অধিকারী (ষষ্ঠ ব্যাচ; পরে মেজর)।
১০৭. এম এ জাবের (ষষ্ঠ ব্যাচ; পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল)।
১০৮. কে এম এইচ আই চৌধুরী ফরিদ (ষষ্ঠ ব্যাচ; পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১০৯. এ বি এম মির কাসেম মিয়া (ষষ্ঠ ব্যাচ; পরে মেজর)।
১১০. দেলোয়ার হোসেন মিয়া (ষষ্ঠ ব্যাচ; পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল)।
১১১. এ এন এম মঈন উদ্দিন, জি (ষষ্ঠ ব্যাচ; পরে কর্নেল)।
১১২. এ এইচ এম শহীদুল্লাহ (ষষ্ঠ ব্যাচ; পরে মেজর)।
১১৩. নুরুল বশির, পিএসসি (ষষ্ঠ ব্যাচ; পরে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল)।
১১৪. হাবিবুর রহমান (ষষ্ঠ ব্যাচ; পরে মেজর)।
১১৫. মেসবাউর রহমান (ষষ্ঠ ব্যাচ; পরে কর্নেল, মৃত)।
১১৬. মুকুল কুমার দে (ষষ্ঠ ব্যাচ; পরে মেজর)।
১১৭. আনিসুর রহমান (ষষ্ঠ ব্যাচ; পরে কর্নেল)।
১১৮. আবদুস সালাম খান (ষষ্ঠ ব্যাচ; পরে মেজর)।
১১৯. সাদেকুল ইসলাম (ষষ্ঠ ব্যাচ; পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল)।
১২০. এ বি এম নওশের আলম (ষষ্ঠ ব্যাচ; পরে ক্যাপ্টেন)।
১২১. মনির ইকবাল হামিদ (ষষ্ঠ ব্যাচ; পরে ক্যাপ্টেন)।
১২২. আলিমুজ্জামান মোল্লা (ষষ্ঠ ব্যাচ; লেফটেন্যান্ট)।
১২৩. মাহমুদ আলী মণ্ডল (ষষ্ঠ ব্যাচ; পরে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল)।
১২৪. মাহমুদ আলী, পিএসসি (ষষ্ঠ ব্যাচ; পরে মেজর জেনারেল)।
১২৫. গোলাম কিবরিয়া খান চৌধুরী (ষষ্ঠ ব্যাচ; পরে মেজর)।
১২৬. সাইফুল আজম চৌধুরী (ষষ্ঠ ব্যাচ; পরে মেজর)।
১২৭. সৈয়দ মিজানুর রহমান (ষষ্ঠ ব্যাচ; পরে মেজর)।
১২৮. অনন্ত কুমার কর (ষষ্ঠ ব্যাচ; পরে কর্নেল)।
১২৯. মঈনুল হক (ষষ্ঠ ব্যাচ; পরে কর্নেল)।
১৩০. নূর আলমগীর (ষষ্ঠ ব্যাচ; পরে ক্যাপ্টেন)।
১৩১. ইকবাল হোসেন (ষষ্ঠ ব্যাচ; পরে মেজর)।
১৩২. আবদুর রউফ (ষষ্ঠ ব্যাচ; লেফটেন্যান্ট)।
১৩৩. এস এম শাহাবুদ্দিন, পিএসসি, জি (ষষ্ঠ ব্যাচ; পরে মেজর জেনারেল)।
১৩৪. মাহমুদুল হক (ষষ্ঠ ব্যাচ; পরে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল)।
১৩৫. মির হোসেন মিয়া (ষষ্ঠ ব্যাচ; পরে মেজর)।
১৩৬. সফিউদ্দিন মো. জাহিদ (ষষ্ঠ ব্যাচ; পরে মেজর)।
১৩৭. শামসুল হক (ষষ্ঠ ব্যাচ; পরে মেজর)।
১৩৮. মিজানুর রহমান সরকার (ষষ্ঠ ব্যাচ; পরে মেজর)।
১৩৯. খন্দকার আবু আলম (ষষ্ঠ ব্যাচ; পরে মেজর)।
১৪০. শাহ আলম, পিএসসি (ষষ্ঠ ব্যাচ; পরে কর্নেল)।
১৪১. ও এফ এম নাজিমুদ্দিন, জি (ষষ্ঠ ব্যাচ; পরে কর্নেল)।
১৪২. এ টি এম এ মান্নান (ষষ্ঠ ব্যাচ; পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল, মৃত)।
১৪৩. আবদুর রহমান জোয়ার্দার (ষষ্ঠ ব্যাচ; পরে মেজর)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৪৪. হোসেন আহমেদ খান (ষষ্ঠ ব্যাচ; পরে মেজর)।
১৪৫. চৌধুরী মো. খালেকুজ্জামান (ষষ্ঠ ব্যাচ; পরে মেজর)।
১৪৬. মকবুল হোসেন (ষষ্ঠ ব্যাচ; পরে মেজর)।
১৪৭. আবদুল মান্নান মিয়া (ষষ্ঠ ব্যাচ; পরে মেজর, মৃত)।
১৪৮. কে কে এম আবদুল আজিজ (ষষ্ঠ ব্যাচ; পরে মেজর)।
১৪৯. সিরাজুল ইসলাম (ষষ্ঠ ব্যাচ; পরে মেজর)।
১৫০. নুরুন নবী (ষষ্ঠ ব্যাচ; পরে মেজর)।
১৫১. এস কে লিয়াকত হোসেন (ষষ্ঠ ব্যাচ; পরে মেজর)।
১৫২. কাজী আবুল ফরিদ (ষষ্ঠ ব্যাচ; পরে মেজর)।
১৫৩. ভবেশ চন্দ্র দে (ষষ্ঠ ব্যাচ; পরে ক্যাপ্টেন)।
১৫৪. নুরুল কবির (ষষ্ঠ ব্যাচ; পরে ক্যাপ্টেন, মৃত)।
১৫৫. আবদুর রব (ষষ্ঠ ব্যাচ; লেফটেন্যান্ট)।
১৫৬. মো. ফজলুল হক (সপ্তম ব্যাচ; পরে কর্নেল)।
১৫৭. আবদুস সালাম চৌধুরী (সপ্তম ব্যাচ; পরে মেজর জেনারেল)।
১৫৮. সৈয়দ গোলাম মোকাদ্দাস (সপ্তম ব্যাচ; পরে মেজর)।
১৫৯. এ কে মো. আলী সিকদার, পিএসসি (সপ্তম ব্যাচ; পরে মেজর জেনারেল)।
১৬০. সুরঞ্জন দাস (সপ্তম ব্যাচ; পরে মেজর)।
১৬১. আকরাম উল্লাহ খান (সপ্তম ব্যাচ; পরে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, মৃত)।
১৬২. মো. মকসুদুল হোসেন (সপ্তম ব্যাচ; পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল)।
১৬৩. রবিউল আলম চৌধুরী (সপ্তম ব্যাচ; পরে মেজর)।
১৬৪. আবদুল ওয়াদুদ, এনডিইউ, পিএসসি (সপ্তম ব্যাচ; পরে লেফটেন্যান্ট জেনারেল)।
১৬৫. গিয়াস উদ্দিন আহমেদ (সপ্তম ব্যাচ; পরে ক্যাপ্টেন)।
১৬৬. শাহজাহান উদ্দিন ভূঁইয়া (সপ্তম ব্যাচ; পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল, মৃত)।
১৬৭. মো. জাফর ইকবাল (সপ্তম ব্যাচ; পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল)।
১৬৮. মো. আবদুল রব (সপ্তম ব্যাচ; পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল)।
১৬৯. খান মো. এনায়েত হোসেন (সপ্তম ব্যাচ; পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল)।
১৭০. মো. সাইফুল ইসলাম (সপ্তম ব্যাচ; পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল)।
১৭১. আকবর হোসেন (সপ্তম ব্যাচ; পরে মেজর)।
১৭২. সৈয়দ মিজানুর রহমান (সপ্তম ব্যাচ; পরে মেজর)।
১৭৩. মঈনুল হক চৌধুরী (সপ্তম ব্যাচ; পরে ক্যাপ্টেন)।
১৭৪. মো. আবদুস সবুর (সপ্তম ব্যাচ; পরে মেজর)।
১৭৫. খুরশেদ আলম (সপ্তম ব্যাচ; পরে মেজর)।
১৭৬. মো. ইউনুস খান (সপ্তম ব্যাচ; পরে মেজর)।
১৭৭. রকিবুল হাসান খান (সপ্তম ব্যাচ; পরে মেজর)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৭৮. মো. রফিকুল ইসলাম (সপ্তম ব্যাচ; পরে মেজর)।
১৭৯. শাহ মো. আতিউর রহমান (সপ্তম ব্যাচ; পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল)।
১৮০. মো. আওলাদ হোসেন, পিএসসি, জি (সপ্তম ব্যাচ; পরে কর্নেল)।
১৮১. রাহাজুল আমিন (সপ্তম ব্যাচ; পরে মেজর)।
১৮২. মো. মিজানুল ইসলাম (সপ্তম ব্যাচ; পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল)।
১৮৩. এস এম শওকত আলী, পিএসসি, জি (সপ্তম ব্যাচ; পরে কর্নেল)।
১৮৪. মো. আতাউর রহমান (সপ্তম ব্যাচ; পরে কর্নেল)।
১৮৫. মো. শাহ আলম (সপ্তম ব্যাচ; পরে মেজর)।
১৮৬. এ বি এম নাসের উদ্দিন (সপ্তম ব্যাচ; পরে মেজর)।
১৮৭. মো. জাফরুল্লাহ খান (সপ্তম ব্যাচ; পরে মেজর)।
১৮৮. আকতারুজ্জামান (সপ্তম ব্যাচ; পরে মেজর)।
১৮৯. আজিজুল হক (সপ্তম ব্যাচ; পরে মেজর)।
১৯০. মো. আজিজুর রহমান (সপ্তম ব্যাচ; পরে মেজর)।
১৯১. এম এম উসমান হারুন (সপ্তম ব্যাচ; পরে মেজর)।
১৯২. জি এম জামায়েত হোসেন (সপ্তম ব্যাচ; পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল)।
১৯৩. পিনাক পানি সাহা (সপ্তম ব্যাচ; পরে মেজর)।
১৯৪. মো. হাফিজুর রহমান (সপ্তম ব্যাচ; পরে মেজর)।
১৯৫. খলিলুর রহমান (সপ্তম ব্যাচ; পরে মেজর)।
১৯৬. এ কে এম শামসুল আলম (সপ্তম ব্যাচ; পরে মেজর)।
১৯৭. মো. ইকবাল হায়দার (সপ্তম ব্যাচ; পরে মেজর)।
১৯৮. মোহাম্মদ ওয়াহিদ (সপ্তম ব্যাচ; পরে মেজর)।
১৯৯. মাহবুবুর রহমান (সপ্তম ব্যাচ; পরে মেজর)।
২০০. মুন্সি মনিরুজ্জামান (সপ্তম ব্যাচ; পরে মেজর)।
২০১. এ কে এম হামিদুর আর চৌধুরী (সপ্তম ব্যাচ; পরে মেজর)।
২০২. মো. নাসিম উদ্দিন (সপ্তম ব্যাচ; পরে মেজর)।
২০৩. আবুল কালাম মাহমুদ (সপ্তম ব্যাচ; পরে ক্যাপ্টেন)।
২০৪. এ বি এম হুমায়ুন কবির (সপ্তম ব্যাচ; পরে মেজর)।
২০৫. আবুল কালাম আজাদ (সপ্তম ব্যাচ; পরে মেজর)।
২০৬. আবদুল আজিজ মোল্লা (সপ্তম ব্যাচ; পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল)।
২০৭. আবদুল মজিদ (সপ্তম ব্যাচ; সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট)
২০৮. হাবিবুর রহমান (সপ্তম ব্যাচ; পরে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট)।
২০৯. মানস কুসুম রায় (সপ্তম ব্যাচ; সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট)।
২১০. আশরাফ (সপ্তম ব্যাচ; সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট)।
২১১. জাহিদ (সপ্তম ব্যাচ; সি/এল)।
২১২. মিজানুর রহমান (সপ্তম ব্যাচ; সি/এল)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৯

কে এম সফিউল্লাহর সাক্ষাৎকার

মতিউর রহমান : *পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হওয়ার পর ১৮ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। সে সময় আপনি চিফ অব আর্মি স্টাফ ছিলেন। সেই ঘটনাবলির কথা মনে হলে আপনার কী প্রতিক্রিয়া হয়?*

কে এম সফিউল্লাহ : দেখুন, বলতে গেলে ১৫ আগস্টের ঘটনাবলির পর থেকে গত ১৭ বছর আমি দেশের বাইরে ছিলাম। এই পুরো সময়টা জুড়ে বিদেশের মাটিতে এই দিনটি আমাকে একভাবে নাড়া দিত। তখন একাই ভেবেছি। দেশে ফিরে আসার পর এই দিনটি আরেকভাবে আমাকে নাড়া দেয়। দেখি, মানুষ যেভাবে বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করে, অতীত নিয়ে যেভাবে ভাবে, তাতে অনেক কিছু মনে পড়ে। আমি ভাবি, সেদিন যদি একটি সৈন্যদল নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম, তাহলে কী হতো? তাহলে হয়তো বঙ্গবন্ধুকে বাঁচানো যেত। সব ভেবে মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

'৭১ সাল থেকেই আমি অদৃষ্টবাদী হয়ে পড়েছি। স্বাধীনতাসংগ্রামের সময় দুবার শত্রুর মুখোমুখি হয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেছি। তখন থেকেই আমি ভাবি, যা ঘটার তা ঘটবেই। তবু সতর্ক হওয়া উচিত। সব রকম প্রস্তুতি নেওয়া দরকার। পেছনে ফিরে তাকালে মনে হয়, ১৫ আগস্টে কী করা যেত, কিছু করা সম্ভব ছিল কি না—এসব ভেবে মন খারাপ হয়।

ম. র. : *পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ড ও রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তনকে কি আপনি সামরিক অভ্যুত্থান বলবেন?*

কে এম স : পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের ঘটনাবলিকে আমি সামরিক অভ্যুত্থান বলে উল্লেখ করতে চাই না। যদিও পরবর্তী সময়ে এটি সামরিক অভ্যুত্থান বলে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আসলে সামরিক অফিসারদের একটি ছোট গ্রুপ, সেনাবাহিনীর ভেতরে এবং বাইরে যাদের অবস্থান ছিল, তারাই এ ঘটনা ঘটিয়েছে। সে সময় এমন একটা পরিস্থিতি ছিল, যেখানে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে একটা ক্ষোভ ছিল মানুষের মধ্যে। আবার সামরিক বাহিনীর মধ্যেও তা ছিল। ওই পটভূমিতে এই যে একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটনা, পরবর্তী সময়ে মস্ত বড় বিপদ ডেকে নিয়ে আসে, সেটা ঘটিয়েছিল একটি ছোট গ্রুপ। এটা সামরিক অভ্যুত্থান নয়। এটা একটা সন্ত্রাসী কাজ, একটা ছোট গ্রুপের কাজ।

ম. র. : *সামরিক বাহিনীর ভেতর থেকে কেন এ ঘটনা ঘটতে পারল?*

কে এম স : তখন সরকারের কিছু কার্যকলাপ জনগণের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল। আবার সেনাবাহিনীর মধ্যেও অসন্তোষ ছিল। সরকারবিরোধী কিছু রাজনৈতিক শক্তি এই অবস্থায় সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে। তারা কিছু অফিসার এবং জওয়ানকে বিভ্রান্ত করতে পেরেছিল। এদের অবস্থান সরকারের ভেতরেও ছিল এবং বাইরে তো ছিলই। এই শক্তিটা সক্রিয় ছিল। এ অবস্থার সুযোগ নিয়ে গ্রুপটি ১৫ আগস্টের দুঃখজনক ঘটনা ঘটায়।

ম. র. : *এ রকম ঘটনার সম্ভাবনা সম্পর্কে কিছু আঁচ করতে পেরেছিলেন?*

কে এম স : সামরিক বাহিনীর মধ্যে যে একটা অসন্তুষ্টির মনোভাব ছিল, সেটা কিছুটা টের পেয়েছিলাম। এই অসন্তুষ্টির কারণে কিছু 'পকেটে' (গ্যারিসন) সরকার সম্পর্কে সমালোচনা দেখা দিচ্ছিল। আর এ ঘটনার মাস পাঁচ-ছয় আগে আমাদের হাতে একটি লিফলেট আসে; কিছু সেপাই, এনসিও পর্যায়ের লোক সরকারের কার্যকলাপে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে এটি বের করেছিল। সেটাসহ একজন এনসিওকে ধরা হয়েছিল। এটা যখন ধরা পড়ে তখন আমাদের গোয়েন্দা সংস্থা ভালোভাবে সংগঠিত ছিল না। কার্যত পুরো সামরিক বাহিনীই তখন অ্যাডহক ভিত্তিতে কাজ করছিল। আমরা পুরো বাহিনীকে সংগঠিত করার জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করেছিলাম। সেটা সরকারের কাছে ছিল অনুমোদনের জন্য। যেহেতু এটা বিলম্বিত হচ্ছিল, সে জন্য প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী নূরুল ইসলাম চৌধুরীর সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ করি। বিষয়টি যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সে জন্য আমি প্রতিমন্ত্রীকে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর কাছে যাই। উদ্দেশ্য ছিল, আমাদের পুরো পরিকল্পনার মধ্য থেকে অন্তত পক্ষে গোয়েন্দা বিভাগকে সংগঠিত করার সম্মতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো। কারণ, এটা ছাড়া আমি সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিলাম। যেটা আমার সামনে আসে, লিফলেট নিয়ে ধরা পড়ার ঘটনা, সেটা পেয়েছিলাম একটি ফিল্ড ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের মাধ্যমে।

আমি বঙ্গবন্ধুকে অনুরোধ করার পরও ওই অনুমোদন পাইনি। তিনি তখন বলেছিলেন, 'কেন, রউফ তোমাকে সব খবর দেয় না?' ব্রিগেডিয়ার রউফ তখন ডিজিএফআইয়ের প্রধান ছিলেন। আমার মনে হলো, আমি যে খবরটা নিয়ে বঙ্গবন্ধুর কাছে গিয়েছিলাম, সেটা তিনি জানেন। যেহেতু এটা সামরিক বাহিনীর ভেতরের ঘটনা, সেটা ডিজিএফআইয়ের জানার কথা। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'কেন, রউফ তোমাকে বলেনি?' আমার বিশ্বাস হয়েছিল, ডিজিএফআই এ খবর বঙ্গবন্ধুকে দিয়েছিল। আমি বলি, 'রউফ আমাকে এ খবর দেয়নি। আমি পেয়েছি একটি ফিল্ড ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের মাধ্যমে; এই যে কিছু জানতাম, কিছু জানতাম না—এ নিয়ে বলা যায় কিছুটা আঁচ পেয়েছিলাম। কিন্তু এটা যে এ রকম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রূপ নেবে, সেটা চিন্তা করিনি। আমরা ভেবেছিলাম, যেটা হতে পারে, সেটা সেপাই এনসিওদের মধ্য থেকে হতে পারে। অফিসাররাই এমন কিছু একটা করছে, সেটা ধারণার বাইরে ছিল।

ম. র. : *সেই সম্ভাব্য ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভেবেছিলেন কি?*

কে এম স : তখন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কথা বলার পর গ্যারিসন কমান্ডারদেরও এ সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করা হয়। তবে এটাকে এত বড় কিছু মনে করে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। পরে ব্রিগেডিয়ার রউফের সঙ্গে এ নিয়ে আর কোনো কথা হয়নি। হতে পারে সে ইচ্ছে করে আমাকে পুরো জানতে দেয়নি। এ অভিযোগ আমি বঙ্গবন্ধুর কাছেও করেছিলাম।

আমি সে সময় বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর মুখ্য সচিব রুহুল কুদ্দুসের সঙ্গেও কথা বলেছি বারবার। তিনি আমাদের পরিকল্পনা অনুমোদন করবেন-করবেন করেও করতে পারেননি। এ কাজে সে সময় কিছুটা স্যাবোটাজও হয়েছিল বলে মনে হয়।

ম. র. : *তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটিকে বঙ্গবন্ধু কি হালকাভাবে নিয়েছিলেন?*

কে এম স : আমার মনে হয়, তিনি ব্যাপারটিকে এত গুরুত্ব দেননি। আমি যখন বলি, 'আমি সম্পূর্ণ অন্ধকারে', তখন তিনি বলেন, 'তুমি খবর চাও? আমি তোমাকে খবর দেব।' আমি কিছুটা হতাশ হই। কারণ, আমি যে বিষয়টিতে গুরুত্ব দিচ্ছিলাম, সেটা তিনি দেননি। অধ্যাপক নূরুল ইসলাম চৌধুরীও বলেছিলেন। আমরা তখনো ভাবিনি, এ থেকে এত বড় ঘটনা ঘটে যেতে পারে, এতে অফিসাররাও যুক্ত থাকতে পারে।

ম. র. : *১৫ আগস্টের ঘটনা সম্পর্কে আপনি কখন জানতে পারলেন?*

কে এম স : ১৫ আগস্ট ভোরে ফজরের নামাজের পর আমি এ সম্পর্কে কিছুটা জানতে পারি। ১৪ তারিখ সারা দিনই কিছু ঘটনা ঘটে। সেদিন চট্টগ্রামে একটি ঘটনা ঘটেছিল। আমাদের একটি হেলিকপ্টার ছিল। সেদিন ওটা কলকাতা যাচ্ছিল। সেটা যখন ফেনীর ওপর, তখন দুর্ঘটনা ঘটে। হেলিকপ্টারটি বিধ্বস্ত হয়। আরোহীরা সবাই মারা যায়। এ নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম সারা দিন।

পরের দিন (১৫ আগস্ট) বঙ্গবন্ধুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার কথা। সেদিন (১৪ আগস্ট) বিকেলে ওই মঞ্চে এবং এর আশপাশে কিছু বিস্ফোরণ ঘটে। আরও বিস্ফোরক আছে কি না, সেটা দেখার জন্য পুলিশের আইজি নূরুল ইসলাম আমাকে ওই এলাকাকে বিপদমুক্ত করার অনুরোধ জানান। সে জন্য কিছু বিস্ফোরক-উদ্ধার-বিশেষজ্ঞদের কয়েকটি দল পাঠাই। এসব নিয়ে সারা দিন ব্যস্ত থাকি। এসব কিছু শেষ হতে হতে অনেক রাত হয়ে যায়। আমি ঘুমিয়ে পড়ি। সেদিন খুব সকালে সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের পরিচালক লে. ক. সালাহউদ্দিন এসে আমাকে খবর দেয়, 'স্যার', তখন হতে পারে ভোর সাড়ে পাঁচটা কি তারপর, 'আপনি কি আর্মার্ড এবং আর্টিলারি রেজিমেন্টকে শহরে পাঠিয়েছেন? তারা তো শহরে যাচ্ছে। অরা রেডিও অফিস দখল করেছে। তারা গণভবন, ধানমন্ডির দিকে যাচ্ছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ কথাগুলো শুনতে শুনতে আমার মধ্যে বিদ্যুতের মতো প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করি, 'ঢাকার ব্রিগেড কমান্ডার জানেন?' তারপর আমি তাকে বলি, 'যদি তারা এভাবে গিয়ে থাকে, তাহলে তুমি তাড়াতাড়ি ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়াত জামিলের কাছে যাও, ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটালিয়নকে প্রস্তুত করে প্রতিরোধ করতে বলো।'

ম. র. : *এ ঘটনা জানার পর বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কি আপনার কোনো যোগাযোগ হয়েছিল?*

কে এম স : লে. ক. সালাহউদ্দিনকে এই নির্দেশ দিয়ে ঘরে গিয়ে লাল টেলিফোনে বঙ্গবন্ধুকে ফোন করি। দেখি, তাঁর টেলিফোন ব্যস্ত। তখন আমার স্ত্রীকে লাল টেলিফোন ঘোরাতে বলি, আর আমি অন্য টেলিফোনে চেষ্টা করি। এই সময়ের মধ্যে যদি বঙ্গবন্ধুও আমাকে চেষ্টা করে থাকেন, তাহলে তিনি আমাকে পাননি। আমি জানার পর যদি তিনি চেষ্টা করে থাকেন, তাহলে তো পাওয়ার কথা নয়; কারণ, আমার টেলিফোন তো তখন ব্যস্ত।

কয়েকটি টেলিফোন করার পর আমি আবার টেলিফোন নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি। ছয়টা বাজার তিন-চার মিনিট আগে আমি টেলিফোনে বঙ্গবন্ধুকে পেয়ে যাই। আমার সঙ্গে শুধু কয়েকটি কথা হয়। তিনি বলেন, 'সফিউল্লাহ, তোমার ফোর্স আমার বাড়ি অ্যাটাক করেছে। কামালকে বোধ হয় মাইরা ফেলছে। তুমি জলদি ফোর্স পাঠাও।' আমি বলি, 'Sir, I am doing something. Can you get out of the house?' আমি এ কথা বলার পর তাঁর গলা আমি আর শুনতে পাইনি। মনে হলো, টেলিফোনটি টেবিলের ওপর রেখে দিয়েছেন। আমি হ্যালো হ্যালো করছি। সে সময়ই আমি টেলিফোনের মধ্য দিয়ে গুলির আওয়াজ শুনতে পাই। তার পরই টেলিফোনটি অকেজো হয়ে যায়।

ম. র. : *আপনি কি কিছু করতে পেরেছিলেন? আপনার চেষ্টার ফল কী হলো?*

কে এম স : সিকোয়েন্সটা হলো এ রকম। আমি প্রথমে কথা বলি শাফায়াত জামিলের সঙ্গে। আমার মনে হলো, আমি তাকে ঘুম থেকে উঠিয়েছি। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি জানেন যে আর্মার্ড এবং আর্টিলারি ইউনিট শহরের দিকে গেছে?' তিনি বলেন, জানেন না। তখন আমি বললাম, 'সামরিক বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান এসে আমাকে এ খবর দিয়েছে। আমি তাকে তখন প্রথম, দ্বিতীয় এবং চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিয়ে ওই গ্রুপটিকে প্রতিরোধ করার জন্য নির্দেশ দিই। এ কথা বলে আমি বিমানবাহিনীর প্রধান এ কে খন্দকার এবং নৌবাহিনীর প্রধান এম এইচ খানকে ফোন করি। কথা বলি। আমি বুঝলাম, তাঁরাও কিছু জানেন না। এরপর আমি জেনারেল জিয়ার সঙ্গে কথা বলি; আমার মনে হলো, তিনি আমার কাছ থেকেই ঘটনা সম্পর্কে প্রথম শুনলেন। আমি তাঁকে বলি, 'আপনি দ্রুত আমার বাসায় চলে আসুন।' তারপর ফোন করি খালেদ মোশাররফকে। তাঁকেও আমার বাসায় আসতে বলি।

এরপর ডিজিএফআইয়ের ব্রিগেডিয়ার রউফকে ফোন করি। তাঁর বাসায় কেউ ফোন ধরেনি। তারপর কর্নেল জামিলকে (নতুন ডিজিএফআই) ফোন করি। তাঁকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি পাই। তিনি বললেন, 'বঙ্গবন্ধু আমাকে ডেকেছেন। আমি তাঁর বাসায় যাচ্ছি।' আমি বলি, 'আমি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি। কিন্তু পারছি না। তুমি যেহেতু বঙ্গবন্ধুর কাছে যাচ্ছ, তাঁকে বলো, আমি কিছু করার চেষ্টা করছি। আর যদি পারো, তাঁকে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে যেয়ো।'

এসব কিছুর পর, আমি বঙ্গবন্ধুকে ফোনে পাই এবং কথা বলি। সে কথা আগেই বলেছি।

তারপর আমি আবার ফোন করি কর্নেল শাফায়াত জামিলকে। কারণ, তখন পর্যন্ত কিছুটা সময় ছিল। ১৫ থেকে ২০ মিনিটের বেশি হয়ে গেছে। কিন্তু আমি কোনো প্রতিক্রিয়া বা কোনো তৎপরতার খবর পাচ্ছিলাম না। এমনটা কেন হচ্ছে, আমি বুঝতে পারছিলাম না। আমি তাঁকে না পেয়ে এক্সচেঞ্জকে বললাম আমাকে ধরিয়ে দিতে। এক্সচেঞ্জ থেকে বলা হয়, মনে হয় টেলিফোনটা তুলে রাখা হয়েছে। আমি ভাবলাম, হয়তো উত্তেজনায় টেলিফোনটা তিনি ঠিক জায়গায় রাখতে পারেননি। অথবা যারা ক্যু করেছে, তারা তাঁকে আটকে রেখেছে।

এ সময়ের মধ্যে জেনারেল জিয়া চলে আসে। খালেদও আসে। এ সময় আমার ব্যাটম্যান রেডিও খুলে দেয়। আমি ডালিমের গলা শুনতে পাই।

আমি তাঁদের বললাম, 'শাফায়াত কী করছে?' আমি বুঝতে পারছি না। আমি বাসায় বসে কিছু করতে পারছি না। আমি অফিসে যাব। আমি যখন কাপড় বদলাতে ভেতরে যাই, তখন দেখি রউফ আমার পেছনের দেয়াল টপকে ভেতরে এসে পড়েছে। সে তখন লুঙ্গি-গেঞ্জি পরা অবস্থায় ছিল। আমি ওকে বাসায় গিয়ে কাপড় বদলিয়ে আসতে বলি।

আমি প্রস্তুত হয়ে অফিশিয়াল গাড়িতে অফিসে যাই। জিয়া আমার পরপর আমার অফিসে আসে। ইতিমধ্যে খালেদও চলে আসে। আমি ওকে শাফায়াতের ব্রিগেডে যেতে বলি এবং কেন ওরা কিছু করছে না, সেটা জানাতে বলি। কোনো তৎপরতা দেখছি না কেন, ইতিমধ্যে তো দ্রুত তৎপরতা শুরু হওয়া উচিত ছিল।

ম. র. : *আপনি বঙ্গবন্ধুর হত্যার খবর কখন জানলেন?*

কে এম স : এরপর আমার এডিসিকে খবর দিতে এবং আমাকে জানাতে বলি। তারপর আমি ঢাকার বাইরে অন্যান্য ব্রিগেড কমান্ডারের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলি। ইতিমধ্যে তারা রেডিও থেকে খবর জেনে গেছে। আমি তাদের বলি, যা ঘটেছে, সেটা আমার অজ্ঞাতে হয়েছে। আমি ঢাকার কমান্ডারকে প্রতিরোধের জন্য বলেছি। পরবর্তী নির্দেশের জন্য আমি তাদের অপেক্ষা করতে বলি।

এরপর খালেদ মোশাররফ আমাকে টেলিফোন করে। আমি জিজ্ঞাসা করি, 'কী হচ্ছে?' সে তখন বলে, 'স্যার, ওরা আপনাকে ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে চায়।' আমি বলি, 'ওরা কে?' সে বলে, 'আমাকে সব বলতে দিচ্ছে না।' আমি বলি, 'যাহোক তুমি আসো।' সে বলে, 'আমাকে ১৫ মিনিটের জন্য আসতে দিচ্ছে।' আমি ওকে আসতে বলি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর কিছুক্ষণের মধ্যেই এডিসি এসে বলে, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে। এই প্রথম আমি শুনি এবং আমার মধ্যে ভীষণ প্রতিক্রিয়া হয়। এ খবর আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। এডিসি চলে যাওয়ার পর খালেদ আসে। সে বলে, 'বঙ্গবন্ধু নিহত হয়েছেন। পুরো গ্যারিসন মনে করে আপনার নির্দেশে ক্যু হয়েছে।' ওরা আনন্দ করছে। কেউ নড়ছে না। যখন খালেদ কথা বলছিল, তখন জেনারেল জিয়া এবং কর্নেল নাসিম আমার অফিসকক্ষে ছিল।

ম. র. : *আপনার কাছে ষড়যন্ত্রকারীদের পক্ষ থেকে প্রথম কী প্রস্তাব এসেছিল সেদিন সকালে?*

কে এম স : খালেদ মোশাররফ কথা শেষ করার পরপরই আমার অফিসের সামনে দুটি গাড়ি বেশ আওয়াজ করে থামে। বাইরে কিছুটা হইচইয়ের শব্দ শোনা যায়। তার পরই সজোরে ধাক্কা দিয়ে দরজা খোলে ডালিম এবং তার সঙ্গে ১০ থেকে ১২ জন সশস্ত্র সৈনিক আমার অফিসঘরে ঢোকে এবং আমার দিকে অস্ত্র তাক করে 'চিফ কোথায়, চিফ কোথায়' বলে চিৎকার করতে থাকে। তখন কর্নেল নাসিম উচ্চ কণ্ঠে বলে ওঠে, 'দেখছ না, চিফ সামনেই।' ডালিমের এই ঔদ্ধত্যপনা দেখে আমি প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে উঠি, বলি, 'তুমি যে অস্ত্র আমার দিকে তাক করছ, আদৌ সেটা যদি ব্যবহার করতে চাও, করো। আর যদি কথা বলতে এসে থাকো, তাহলে অস্ত্র বাইরে রেখে আসো।' এ কথার পর ও অস্ত্র নামিয়ে নিয়ে বলে, 'স্যার, প্রেসিডেন্ট আপনাকে রেডিও স্টেশনে যেতে বলেছেন।'

আমি বললাম, 'আমি জানি, প্রেসিডেন্ট নিহত হয়েছেন।' তখন সে বলে, 'স্যার, আপনার জানা উচিত, খন্দকার মোশতাক আহমদ এখন রাষ্ট্রপ্রধান।' আমি বলি, 'খন্দকার মোশতাক তোমার রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারে, কিন্তু আমার নয়।'

এ কথার পর ডালিম বলে, 'স্যার, আমাকে এমন কিছু করতে বাধ্য করবেন না যেটা আমি চাই না।' আমি বলি, 'তুমি যা কিছু করতে চাও, করতে পারো। আমি তোমার সঙ্গে কোথাও যাচ্ছি না। আমি আমার সৈন্যদের কাছে যাচ্ছি।' এ কথা বলে এডিসিকে গাড়ি আনতে বলে আমি উঠে দাঁড়াই। গাড়িতে উঠে সরাসরি ৪৬ ব্রিগেডে যাই। ওখানে গিয়ে দেখি, সৈন্যরা সবাই আনন্দ করছে। এমনকি সেখানে বঙ্গবন্ধুর কিছু ছবিও ভাঙা হয়েছে। এসব দেখে তখন আমার মূকবধির হওয়ার অবস্থা। তখন কয়েকজন অফিসার আমাকে পথনির্দেশ করে পাশের একটি ঘরে নিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে দেখি মেজর হাফিজ এবং মেজর রশীদ। ওরা এসে আমাকে অনুরোধ করে, 'স্যার, আপনি রেডিও স্টেশনে যান।' তখন আমি বললাম, 'আমি তো একা যাব না। অন্য দুই চিফের সঙ্গে কথা বলব।' ওরাই আমাকে দুই বাহিনীর প্রধানের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করিয়ে দেয়। দুই প্রধান বলেন, 'অপেক্ষা করুন, আমরা আসছি।'

ম. র. : *আপনার সঙ্গে খন্দকার মোশতাকের কখন কোথায় কথা হলো?*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কে এম স : আমি যখন ওঁদের জন্য অপেক্ষা করছি, সে সময় আমি ভাবছিলাম, আমার কী করা দরকার? আমার সামনে দুটি প্রশ্ন—এক. বঙ্গবন্ধু যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে আমার কোনো সংশয় থাকত না। আমি সরাসরি সংঘর্ষে যেতাম। দুই. যেহেতু বঙ্গবন্ধু বেঁচে নেই, তাতে আমি সংঘর্ষে গিয়ে কী লাভ করতে পারব? পারি, গৃহযুদ্ধের দিকে দেশকে নিয়ে যেতে। এতে আরও রক্তপাত হবে। এটা কি লাভজনক হবে? এ কথা ভাবতে ভাবতে ওরা চলে আসে। কিছু কথা হওয়ার পর সবাই আমরা রেডিও স্টেশনে চলে যাই।

সেখানে যাওয়ার পর খন্দকার মোশতাক যে ঘরে বসা ছিলেন, সেখানে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খন্দকার মোশতাক আমাকে বলেন, 'অভিনন্দন সফিউল্লাহ, তোমার সৈন্যরা একটি বিরাট কাজ করেছে। এখন বাকিটা করো।' আমি বললাম, 'আর বাকি কী আছে?' তিনি বলেন, 'তোমারই সেটা জানার কথা।' এটা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমি বলি, 'তাহলে সেটা আমার ওপরই ছেড়ে দিন।' এ কথা বলে চলে আসার সময় তাহেরউদ্দিন ঠাকুর খন্দকার মোশতাককে বলেন, 'স্যার, ওনাকে থামতে বলুন। ওনাকে থাকতে হবে। রেডিওতে একটা ঘোষণা দিতে হবে।' এবং আমাদের গতি রোধ করা হলো। সে সময় তাহের ঠাকুর একটা কাগজে ঘোষণা লিখে দিল। সেটা আমরা একে একে পড়ি। সেটাই পরে রেডিওতে ঘোষিত হয়।

এসব কিছুর পর খন্দকার মোশতাক বলেন, 'আমি এখনই বঙ্গভবনে যাচ্ছি। জুমার নামাজের আগেই সেখানে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হবে। আমি চাই, আমার সকল প্রধানরা সেখানে উপস্থিত থাকবেন।' এরপর আমরা সবাই ক্যান্টনমেন্টে চলে আসি। এবং সকল অফিসারকে একত্র করে পুরো ঘটনা বর্ণনা করি। সবাইকে সেনাবাহিনীর মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য বলি। তারপর বঙ্গভবনের দিকে চলে যাই। তখন প্রায় ১১টা বেজে গেছে। বঙ্গভবনে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হলো। প্রধান বিচারপতি অনুষ্ঠান পরিচালনা করলেন।

ম. র. : *শপথ গ্রহণের পর কী হলো? আপনি কী করলেন?*

কে এম স : শপথ গ্রহণের পর খন্দকার মোশতাক বললেন, 'আমার চিফদের দরকার।' আমরা তিনজনই থেকে গেলাম আলোচনার জন্য। নামাজের পর বৈঠক শুরু হলো। খন্দকার মোশতাক, তিন বাহিনীর প্রধান, জিয়া এবং খালেদও ছিল। আলোচনার বিষয় ছিল মার্শাল ল দেওয়া হবে কি হবে না। অল্প কিছুক্ষণ বৈঠক হওয়ার পর স্থগিত হয়ে গেল। বিকেল-সন্ধ্যায় আবার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। সেটার পর আবার বৈঠক। তখন সবাই আর নেই।

দ্বিতীয় বারের শপথের পর কর্নেল মঞ্জুরকে বঙ্গভবনে দেখে আমি বিস্মিত হই। তখন সে দিল্লিতে কর্মরত ছিল। আমি জিজ্ঞেস করি, 'তুমি কীভাবে এলে?' সে বলে, 'আমি খবর জেনে রাস্তা দিয়ে ঢাকায় চলে এসেছি।' এখনো আমার মনে প্রশ্ন, সে ঢাকায় কীভাবে এবং কেন এল!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একসময় যখন সবাই সম্মেলনকক্ষে, তখন রাষ্ট্রপতির ভারপ্রাপ্ত সামরিক সচিব এসে বললেন, 'স্যার, আপনার একটি টেলিফোন।' অন্যদিক থেকে জেনারেল ওসমানীর কণ্ঠস্বর শুনলাম। তিনি বললেন, 'সফিউল্লাহ, অভিনন্দন নাও।' আমি বললাম, 'স্যার, আপনি কি মনে করেন এটা অভিনন্দনযোগ্য?' তিনি বলেন, 'তুমি কি জানো না যে তুমি দেশকে বাঁচিয়ে দিয়েছ?'

এরপর সম্মেলনকক্ষে ঢুকে দেখি, এক কোনায় খন্দকার মোশতাক আর কর্নেল মঞ্জুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলছেন। তখন আমি আরও ভাবলাম, কে তাকে আসতে বলেছে? আমি তাকে আসতে বলিনি। আমি সেনাপ্রধান। সে তখন দিল্লিতে মিলিটারি অ্যাটাশে। খন্দকার মোশতাক তো সেদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি ছিলেন না? তাহলে তাদের এই ঘনিষ্ঠতার মূলে কী ছিল?

বৈঠক আবার শুরু হলো। একপর্যায়ে কথা উঠল, মার্শাল ল দেওয়া হবে কি না? আমি বললাম, 'এ নিয়ে আলোচনার কী আছে? এটা তো ঘোষিত হয়ে গেছে। এখন শুধু এটা আনুষ্ঠানিকতার প্রশ্ন।' এতে খন্দকার মোশতাক বলেন, 'কে এর দায়িত্ব নেবে?' আমি বললাম, 'রাষ্ট্রপতি।' তিনি বলেন, 'কেন রাষ্ট্রপতি? তোমার বাহিনী এটা করেছে। তোমাকে দায়িত্ব নিতে হবে।' এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমি বলি, 'আমি দায়িত্ব নিতে ভীত নই। কিন্তু ওরা যদি আমার বাহিনী হতো তাহলে তো আমার নামে ঘোষণা দিত। তারা তো আপনার নামে ঘোষণা দিয়েছে।' তখন তিনি কথা ঘুরিয়ে নেন। তিনি আমাকে বলেন, 'আমরা আলোচনা করছি সামরিক আইন করা হবে কি না, তা নিয়ে।' এ রকম আলোচনা আরও দুদিন চলল। এই তিন দিন পুরো সময়টা আমাকে ওরা বঙ্গভবনে ব্যস্ত রাখে। অন্য সামরিক কর্মকর্তারা যার যার বাসায় বা অফিসে ফিরে যাচ্ছিল। ওরা আসা-যাওয়ার মধ্যে ছিল।

ম. র. : *তাহলে আপনাকে কি ওরা ভয় পাচ্ছিল?*

কে এম স : হতে পারে। সে জন্যই তো ২৪ আগস্ট তারিখে আমাকে পদচ্যুত করে। এই তিন দিনের মধ্যে এক দিন আমাকে রক্ষীবাহিনীর হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। আমাকে সাভার যেতে হয়। তখন তাদের মধ্যে উত্তেজনা ছিল। এবং একজন রক্ষী নিজেকে গুলি করে আত্মহত্যা করে। ওদের সামাল দেওয়ার জন্য আমাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। এ রকম এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে আমি যখন বঙ্গভবনে অবস্থান করছিলাম, তখন একদিন (১৭ আগস্ট) খালেদ মোশাররফ আমাকে এসে বলে, 'স্যার, আপনি কি জানেন, ট্যাংকগুলো কোনো রকম গোলাবারুদ ছাড়াই অ্যাকশনে গিয়েছিল?' তখনো আমি জানতাম না যে, ওদের ট্যাংক-কামানে গোলা ছিল না। তাৎক্ষণিকভাবে আমার মধ্যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল যে, তাহলে তো ওদের নিয়ন্ত্রণে আনা কঠিন কিছু ছিল না। এ কথা ভেবে আমি খালেদকে বলি, 'এটা কি সত্যি?' খালেদ বলে, 'হ্যাঁ স্যার, আমি তো পরশু দিনই (১৫ আগস্ট) ওদের গোলাবারুদ দিয়েছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, 'তুমি এ সময় ওদের গোলাবারুদ দিলে, আমাকে জিজ্ঞেস করলে না? ওরা এমন জঘন্য কাজ করেছে, এখন তো ওরা আমার মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠবে।' সে বলল, 'আমি ভেবেছি সবকিছু শেষ হয়ে গেছে।' আমি বলি, 'ওরা যদি গোলাবারুদ ছাড়া এমন কাণ্ড করতে পারে, তাহলে ওরা তো এখন আরও অনেক কিছু করতে পারে।' খালেদ চলে যাওয়ার পর একসময় মেজর রশীদ এল আমার কাছে। আমি প্রশ্ন করি, 'তোমরা কীভাবে এমন জঘন্য কাজ করতে পারলে?' রশীদ বলল, 'স্যার, এটা তো বেশ দীর্ঘ কথা।' সে বলল, 'রোজার ঈদের দিন আপনার বাসায় গিয়েছিলাম। আমি সস্ত্রীক দেড় ঘণ্টা ছিলাম। সেদিন ইচ্ছে ছিল আপনাকে বলার।' তখন আমি জিজ্ঞেস করি, 'বললে না কেন?' সে উত্তর দেয়, 'সাহস পাইনি।' আমি বলি, 'সাহস না পেয়ে থাকলে তাহলে করতে গেলে কেন? অন্যরা কি জানত?'

সে বলে, 'হ্যাঁ স্যার, অনেকে জানত।' সে আরও বলে, 'আমাদের সাফল্য লাভ করার সম্ভাবনা ছিল মাত্র .০১%। তবু আমরা পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিলাম। যদি আমরা ব্যর্থ হতাম তাহলে মরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত যদি কোনো সুযোগ পেতাম, তাহলে বলে যেতাম, অনেক সিনিয়র অফিসার এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।' তার এ কথাগুলো শুনে আমি বিমর্ষ হয়ে পড়ি।

আমি যে সময়ের কথা বলছি, তখনো আলোচনা চলছে। আমি বঙ্গভবনেই আছি, সে রাতেই শেষ কথা হলো, একটা খসড়া তৈরি করতে হবে। সে রাতে বিমান ও নৌবাহিনীর প্রধানসহ আমি এবং জেনারেল খলিল আর ঘুমাইনি। খুব সকালে খন্দকার মোশতাক আমাদের কাছে এসে একটি খসড়া দেয়। সেটাই পরে ঘোষণা করা হয়। তারপর আমরা চা খেয়ে বঙ্গভবন থেকে চলে আসি। আমি অফিসে যাই এবং খালেদকে বলি, 'আমাদের বৈঠক হওয়া দরকার। রাতেই সেটা হওয়া দরকার।'

সে রাতের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তিন বাহিনীর প্রধান, পুলিশের আইজি, জেনারেল জিয়া, পিএসও, ব্রিগেডিয়ার রউফ, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ, ডিএমও কর্নেল মালেক, জিএসও ওয়ান লে. ক. নূরউদ্দীন আহমেদ। ওখানে যখন সম্মেলন করছি, সে রাতে রউফ বলে, 'আমরা ওখানে যত কথাই বলি সব ফাঁস হয়ে যায়। সে জন্য গোপন কথা বলতে হলে আমাদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে।' সেটা করা হলো। সভায় সবাই বলল, সেনাবাহিনীর কমান্ড ভেঙে গেছে। অভ্যুত্থানকারীদের শাস্তি হওয়া দরকার। এ রকমই সিদ্ধান্ত হলো যে, যারা বঙ্গভবনে আছে তাদের ফিরিয়ে আনতে হবে। সামরিক বাহিনীর চেইন অব কমান্ড ফিরিয়ে আনতে একই সঙ্গে ১৯ তারিখ সব ব্রিগেড কমান্ডারকে নিয়ে বৈঠক ডাকি। সেদিন সকালে বৈঠকের সময় ফারুক আর রশীদকেও হেডকোয়ার্টারে উপস্থিত থাকতে বলা হয়।

সকালে সম্মেলনে গিয়ে আমি সবাইকে পরিস্থিতি সম্পর্কে জানাই। কী পরিস্থিতিতে পুরো দায়িত্ব নিতে হয় তা ব্যাখ্যা করি। সামরিক বাহিনীতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার কথা বলি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ম. র. : *১৯ আগস্টের পর কী হলো?*

কে এম স : দেখলাম, আমাদের সব কথা জানাজানি হয়ে গেছে। যেসব গোপন সিদ্ধান্ত নিই সেগুলোও বঙ্গভবনে সবাই জানে। এ সময় আমি অপেক্ষা করছিলাম ফারুক-রশীদ ক্যান্টনমেন্টে ফিরে আসে কি না। আমি খন্দকার মোশতাকের কাছে গেলাম। তিনি বললেন, 'ওরা ভীত। সময় দাও।' এভাবে ২৪ তারিখ এসে যায়।

সেদিন দুপুর ১২টার রেডিওর খবরে জানানো হয়, জেনারেল ওসমানীকে প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা করা হয়েছে। এর পরপরই খন্দকার মোশতাক আমাকে টেলিফোন করে বলেন, 'তুমি খবর শুনেছ?' বললাম, 'এটা ভালো খবর।' তিনি বললেন, 'আমি তোমাকে সাড়ে পাঁচটায় বঙ্গভবনে চাই।' আমি বঙ্গভবনে যেতেই একজন অফিসার বললেন, জেনারেল ওসমানী আমাকে সালাম দিয়েছেন। আমি তাঁর ঘরে গেলাম। তিনি আমাকে বসতে বলে কিছু কথা বললেন। তিনি আমার প্রশংসা করলেন। তারপর তিনি বললেন, 'তুমি দেশের জন্য অনেক করেছ। দেশ তোমাকে চায়। এখন তোমার ভূমিকা বিদেশের মাটিতে দেখতে চাই। তোমাকে বিদেশে রাষ্ট্রদূত করে পাঠানো হবে।' এটা আমার জন্য বজ্রপাতের মতো শোনাল। আমি বললাম, 'খন্দকার মোশতাকের সঙ্গে কথা বলতে চাই।' আমরা গেলাম, তিনি অনেক কথা বললেন। বললেন, 'এখন বিদেশে তোমার কাজ দেখতে চাই।'

আমি তাঁকে বলি, 'আমাকে যখন সেনাবাহিনীর প্রধান করেন বঙ্গবন্ধু, তখন বলেছিলাম, বিশেষ পরিস্থিতিতে আমাকে দায়িত্ব নিতে হলো। এখনো বলি, এবার আমি পরিস্থিতির শিকার হলাম।' ২৪ আগস্টেই আমার চাকরি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেষণে পাঠানো হয়।

AMARBOI.COM

ম. র. : *১৫ আগস্টের ঘটনা প্রতিরোধ করতে পারলেন না, এটা কি আপনার ব্যর্থতা বলে মনে করেন?*

কে এম স : প্রশ্ন হলো, এ রকম অবস্থায় একজন সেনাপ্রধান কী করতে পারেন? তিনি তো একজন একক ব্যক্তি। তিনি তাঁর সহকর্মী, অধীনস্থ অফিসারদের দিয়ে কাজ পরিচালনা করেন। সে সময় যার সবচেয়ে বড় ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন ছিল, তিনি ছিলেন ঢাকা ব্রিগেড কমান্ডার। তাকে নিষ্ক্রিয় দেখে চিফ অব জেনারেল স্টাফকে পাঠালাম। তিনিও উৎসাহব্যঞ্জক রিপোর্ট দিলেন না। তখন আমি নিজে যাই এবং ৪৬ নম্বর ব্রিগেডে গিয়ে যখন দেখি আমি একা, তখন আমার কী করণীয় থাকে?

আমার মনে হয়, আমার যদি কোনো ব্যর্থতা থেকে থাকে, সেটা হলো আমার নিজের আত্মাহুতি প্রদান। এটাই যদি আমার কর্তব্য হয়ে থাকে, তাহলে সেখানে আমি আমার ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছি। সেটা করে যদি কোনো লাভ হতো, তাহলে সেটা আমার ব্যর্থতা।

ম. র. : *কেন এই অভ্যুত্থান সফল হলো?*

কে এম স : এ জন্য একটু পটভূমি ব্যাখ্যা করা দরকার। সেনাবাহিনীর সদস্যদের এ রকম মনোভাব ছিল যে, তারা কিছুটা অবহেলিত। যদিও ব্যাপারটা পুরোপুরি সত্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল না। তবে কতকগুলো কার্যকলাপ, যেমন রক্ষীবাহিনীর আবির্ভাবটা অসন্তোষের একটা বড় কারণ ছিল। বিরোধী পক্ষ এর পুরো সুযোগ নেয়। তারা এটা প্রচার করে অনেকের মধ্যে এটা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয় যে, শেষ পর্যন্ত রক্ষীবাহিনী সেনাবাহিনীর জায়গা নিয়ে নেবে। আর এ জন্য কিছু ঘটনা কাজ করেছে। সেটা হলো, সেনাবাহিনীর প্রায় সবকিছুই ছিল পুরোনো বা পূর্ব ব্যবহৃত। এটা নয় যে, এগুলো তাদের দেওয়া হয়। এগুলো তাদেরই ছিল। দেশে যা ছিল, সেটা দিয়ে সেনাবাহিনীকে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি। কিন্তু রক্ষীবাহিনী যখন তৈরি করা হয় তখন তাদের জন্য তো কিছু ছিল না। তাদের অস্ত্র, পোশাক, যানবাহন বা অন্য কোনো কিছুই ছিল না। সে জন্য সবকিছুই নতুন করতে হয়। তাই ওদের সবকিছু নতুন ছিল। পোশাক, অস্ত্র, যানবাহন, থাকার জায়গা—সবই নতুন ছিল। এ সবকিছুই সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে কিছুটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। রক্ষীবাহিনীকে যখন দেখত, অন্যরা মনে করত আমরা অবহেলিত। এর ওপর আরেকটি বড় ব্যাপার ছিল। রক্ষীবাহিনীকে কিছু ক্ষমতা দেওয়া হয়, যা দিয়ে তারা যে কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারত। যার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু কিছু দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল দুই বাহিনীর মধ্যে।

ম. র. : *তাহলে তো দেখা যায়, এটাই আবার সত্য বলে প্রমাণিত হলো যে, নিয়মিত সেনাবাহিনী কখনোই বিকল্প কোনো বাহিনীকে মেনে নিতে পারে না?*

কে এম স : এটা ঠিক, তারা ভাবে যে, দেশের প্রতিরক্ষা বিষয়টি তো তাদের ওপর ন্যস্ত। যদি তা-ই হয়, তাহলে বিকল্পের কী প্রয়োজন?

ম. র. : *কেন রক্ষীবাহিনী গঠন করা হয়েছিল?*

কে এম স : এটা করা হয়েছিল মূলত পুলিশকে সাহায্য করার জন্য। পুলিশ তখন কার্যকর ছিল না। তাদের পক্ষে আইনশৃঙ্খলা-পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার মতো অবস্থা ছিল না। এ অবস্থায় হয়তো রক্ষীবাহিনী গঠন করা হয়। পরে এমন প্রচারণা ছিল যে, রক্ষীবাহিনীর সংখ্যা এক লাখের কাছে চলে গেছে। ১৫ আগস্টের পরে তো দেখা গেল তাদের সংখ্যা ছিল ১০ থেকে ১২ হাজারের মতো। বলা হতো, ওদের কামান দেওয়া হয়েছে। পরে প্রমাণিত হলো, সেটা ছিল না। এসব অপপ্রচারও সেনাবাহিনীর মধ্যে কাজ করেছে।

ম. র. : *রক্ষীবাহিনী কি প্রতিরোধের কথা ভেবেছিল?*

কে এম স : এটা আমি বলতে পারব না। তবে মনে হয়, সমগ্র পরিস্থিতি তাদেরও অপ্রস্তুত করে ফেলে। তা ছাড়া ট্যাংকের উপস্থিতি তাদের ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করতে পেরেছিল। তবে তাদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব ছিল কি না সে সম্পর্কে রক্ষীবাহিনীর তৎকালীন সমরনায়কেরা বলতে পারবেন।

ম. র. : *অভ্যুত্থান সম্পর্কে অনেকে বলে, এটা হয়েছিল ব্যক্তি-আক্রোশের কারণে?*

কে এম স : না, তবে কিছুসংখ্যক সামরিক অফিসার চাকরিচ্যুত হয়েছিলেন, সেগুলোতে কিছুটা অন্যায় হয়েছিল। তা নিয়ে কিছু বিক্ষোভ ছিল। এটা হলো একটি গ্রুপের ব্যাপার। অন্যরা, যেমন রশীদ, ফারুক, তারা তো সেনাবাহিনীতেই ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা এতে নেতৃত্ব দিয়েছিল বিশেষ রাজনৈতিক লক্ষ্য সামনে রেখে। তারা অন্যদের ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। তখন সরকারের মধ্যেও একটা অংশ বোধ হয় ওদের ইন্ধন জোগায়। আর সরকারের বাইরের কিছু শক্তি এর সঙ্গে যোগসাজশে ছিল।

ম. র. : *এ ঘটনার পেছনে বিদেশিদের কোনো হাত ছিল বলে মনে করেন?*

কে এম স : এ ব্যাপারে আমার কাছে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। তবে তাদের বিভিন্ন কার্যকলাপে বাইরের কোনো কোনো শক্তির হাত ছিল বলে আমি বিশ্বাস করি। বঙ্গবন্ধুর সরকারের পতনের পর যারা অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দেয়, স্বাগত জানায়, তাতে তো তাদের পরোক্ষ সমর্থন ছিল বলে মনে করার কারণ রয়েছে।

ম. র. : *সেনাবাহিনীর ভেতরে তখন সামগ্রিক দেশের অবস্থার প্রতিফলন ছিল কি?*

কে এম স : দেশের তৎকালীন অবস্থায়, যেমন 'বাকশাল' গঠন ইত্যাদি নিয়েও সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রতিক্রিয়া ছিল। আমার মধ্যে কিছু প্রশ্ন ছিল। সেগুলো নিয়ে আমি কথা বলেছিলাম।

এ ব্যাপারে আমি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করে প্রশ্ন করি, 'স্যার, সারা জীবন গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করেছেন। হঠাৎ করে এক পার্টিতে কেন যাচ্ছেন?' তিনি বললেন, 'সফিউল্লাহ, তুমি বুঝবে না, যে ব্যক্তি সারা জীবন গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করেছে, সে কি তা ভুলতে পারে? দেশে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনি, আবার গণতন্ত্রে ফিরে আসব। আমার ওপর বিশ্বাস রাখো।' তখন বঙ্গবন্ধুর ওপর রাজনীতি নিয়ে কথা বলার ক্ষমতা অন্তত আমার ছিল না। আমিও মেনে নিয়েছিলাম তাঁর ওই বক্তব্য। যদিও আমরা যারা গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করেছিলাম, এ থেকে সরে যাওয়া মেনে নিতে পারছিলাম না। তবে বঙ্গবন্ধুর ব্যাখ্যা সে অবস্থায় মেনে নিয়েছিলাম। মনে হয়, এসব কিছুর পরও যদি রক্ষীবাহিনী সামনে না আসত, তাহলে হয়তো সেনাবাহিনী সেগুলো মেনে নিত।

ম. র. : *সেনাবাহিনীর ব্যাপারে কি বঙ্গবন্ধুর মধ্যেই কোনো সন্দেহ বা অনাস্থা ছিল বলে মনে করেন?*

কে এম স : না, সেটা মনে করি না। তাহলে তো আনোয়ার সাদাতের কাছ থেকে ট্যাংক, মার্শাল টিটোর কাছ থেকে এক ডিভিশনের অস্ত্র আনাতেন না। ওই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, সে সময় কিছু অসুবিধা ছিল। কোনো অবকাঠামো ছিল না। শিল্পপ্রতিষ্ঠান ছিল না। যানবাহন বলতে কিছু ছিল না। বৈদেশিক মুদ্রা ছিল না। বৈদেশিক প্রকল্প চূড়ান্ত করা যাচ্ছিল না তাদের পুরোনো ঋণ মেনে না নেওয়া পর্যন্ত। এসব সমস্যা নিয়ে তাঁরা কাজ শুরু করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু সেনাবাহিনীর উন্নয়ন চাইছিলেন, কিন্তু পারছিলেন না। কেননা, তখন অগ্রাধিকার তো অন্যত্র ছিল। আমাদের পরিকল্পনাও বাস্তবায়ন করা যাচ্ছিল না। সে জন্যও অর্থের প্রয়োজন ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ম. র.: *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে আপনি কী ভাবেন? আপনার মূল্যায়ন কী?*

কে এম স: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ছিলেন সত্যিকার অর্থে একজন মহান দেশপ্রেমিক। ছাত্রজীবন থেকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়া পর্যন্ত বাঙালি জাতি এবং বাংলাদেশের মুখপাত্র হিসেবে কথা বলে এসেছেন। সে জন্য তাঁকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। তাঁর নিজের কর্মজীবন দিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন, মিথ্যার কাছে তিনি কখনো মাথা নত করেননি। দেশের স্বার্থকেই সব সময় সর্বোচ্চ মূল্য দিয়েছেন। নিজের কী হবে না হবে, সেটা কখনো ভাবেননি। সে জন্য একজন প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে যে নিরাপত্তাব্যবস্থা নেওয়ার কথা ছিল, সেটাও তিনি কখনো নেননি।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে বঙ্গবন্ধু মূলত বিরোধীদলীয় রাজনীতি করেছেন। এ জন্য রাষ্ট্র পরিচালনায় যে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ছিল, তা হয়তো পুরোটা অর্জন করার সময় পাননি। তার অর্থ এই নয় যে, তিনি তা জানতেন না বা তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর সাড়ে তিন বছরের রাষ্ট্র পরিচালনায় তিনি সফল, এটাই বলব। ব্যর্থ বলব না। সামগ্রিক পরিস্থিতির পটভূমিসহ বলা যায়, অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক বিষয়ে তিনি সফল হয়েছিলেন। এমনকি বর্তমান সেনাবাহিনীর কাঠামোও তাঁর শাসনামলে তৈরি। ভিত্তি তো সেখান থেকেই। বলতে হবে, যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশকে গড়ে তুলতে তিনি যথেষ্ট সফল হয়েছিলেন।

আমি বঙ্গবন্ধুর কথা সব সময়ই স্মরণ করি। যত দিন পর্যন্ত তিনি বঙ্গবন্ধু হিসেবে স্বীকৃতি না পাবেন, তত দিন আমি মানসিকভাবে স্বস্তি পাব না। তারই আহ্বানে আমি এবং আমার সহকর্মীরা জীবনের সব ঝুঁকি নিয়ে স্বাধীনতাসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। ব্যক্তিগতভাবেও আমি তাঁর স্নেহভাজন ছিলাম। এখনো বহু স্মৃতি ভিড় জমায় মনে। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

[*ভোরের কাগজ*, ১৫ ও ১৬ আগস্ট ১৯৯৩।
পত্রিকায় তাঁর নাম ছাপা হয়েছে 'শফিউল্লাহ', আমরা 'সফিউল্লাহ' করেছি।
এভাবেই তিনি তাঁর নাম লিখে থাকেন]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১০

রক্ষীবাহিনীর বিলুপ্তি ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে আত্তীকরণ-সংক্রান্ত গেজেট

THE JATIYA RAKKHI BAHINI (ABSORPTION IN THE ARMY) ORDINANCE, 1975

ORDINANCE NO. LII OF 1975

[9th October, 1975]

An Ordinance to provide for the absorption of the members of the Jatiya Rakkhi Bahini in the Bangladesh Army.

WHEREAS it is expedient to provide for the absorption of the members of the Jatiya Rakkhi Bahini in the Bangladesh Army and for matters connected therewith or ancillary thereto;

AND WHEREAS Parliament is not in session and the President is satisfied that circumstances exist which render immediate action necessary;

Now, THERFORE, in pursuance f the Proclamation of the 20th August, 1975, and in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 93 of the Constitution of the peoples Republic of Bangladesh, the President is pleased to make and promulgate the following Ordinance.

1. (1) The Ordinance may be called the Jatiya Rakkhi Bahini (Absorption in the Army) Ordinance, 1975.
   (2) It shall be deemed to have come into force on the 3rd day of September, 1975.
2. In this Ordinance, unless there is anything repugnant in the subject or context,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(a) "Bahini" means the Jatiya Rakkhi Bahini constituted under the Order;

(b) "commencement of this Ordinance" means the 3rd day of September, 1975;

(c) "member of the Bahini" means a person appointed or enrolled in the Bahini under the Order.

(d) "Order" means the Jatiya Rakkhi Bahini Order, 1972 (P.O. No 21 of 1972)

3. The provisions of this Ordinance and any order made thereunder shall have effect notwithstanding anything contained in the Order or in any other law for the time being in force, or in any contract, agreement, document or other instrument.

4. On the commencement of this Ordinance,—

(a) all members of the Bahini, who are willing to serve in the Bangladesh Army and found suitable in all respects for such service, shall be appointed in the Bangladesh Army on such terms and conditions as the Government may determine ;

(b) all rights and assets and all property, movable or immovable, cash and bank balances, funds, arms ammunition, explosives, wireless sets, equipment, stores, vehicles, vessels, and work shops and all rights and interests in or arising out of such property, of the Bahini shall be transferred to the Bangladesh Army, or to such other Defence Service or branch thereof, in such manner as the Government may, by order, specify,

(c) all debts, obligations and liabilities incurred, all contracts entered into, all agreements made, and all matters and things. engaged to be done, by, with or for the Bahini shall be deemed to have been incurred, entered into, made or engaged to be done by, with or for the Bangladesh Army or such other Defence Service or branch thereof as the Government may, by order, specify;

(d) all deeds, bonds, agreements, powers of attorney, documents and other instruments of whatever nature to which the Bahini is a party or which are in favour of the Bahini shall be .....and of effect by, against or in favour of the Bangladesh Army or such other by, other Defence Service or branch thereof as the Government may, by order, specify as if in place of the Bahini the Bangladesh Army or the Defence Service or branch thereof specified in the order had been named therein;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(e) all budget grants made and sums sanctioned for the Bahini shall be deemed to be budget grants made and sums sanctioned for the Bangladesh Army;

(f) all projects and schemes of the Bahini shall be deemed to be projects and schemes of the Bangladesh Army;

(g) all suits and other legal proceedings by or against the Bahini shall be deemed to be suits and proceedings by or against the Bangladesh Army and may be proceeded or otherwise dealt with accordingly.

5. As soon as may be after action under clauses (a) and (b) of section 4 has been taken and the accounts of the Bahini have been audited, the Government shall, by notification in the official Gazette appoint a date on which the Bahini Organisation shall stand abolished.

6. On the abolition of the Bahini Organisation under section 5, the Order shall stand repealed.

7. (1) The Director-General of the Bahini shall, for the purpose of giving effect to the provisions of clauses (a) and (b) of section 4 and abolition of the Bahini Organisation, take such steps as he deems necessary or as the Government may direct.

(2) The Government shall make available to the Dircetor-General such staff and fund as may be necessary for the discharge of his functions under this Ordinance.

8. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Ordinance, the Government may, by order, do anything which appears to it to be necessary for the purpose of removing the difficulty, and any such order shall be deemed to be, and given effect to as, part of the provisions of this Ordinance.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. *এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য : স্বাধীনতার প্রথম দশক*, মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০০

২. *বাংলাদেশ : রক্তাক্ত অধ্যায়, ১৯৭৫-৮১*, ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেন, পালক পাবলিশার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৯৭

৩. *সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে আটাশ বছর*, মেজর জেনারেল মুহাম্মদ ইবরাহিম। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯

৪. *বাংলাদেশ দি এরা অব শেখ মুজিবুর রহমান*, মওদুদ আহমদ, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (ইউপিএল), ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৩

৫. *বাংলাদেশে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড*, আশরাফ কায়সার, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫

৬. *বঙ্গবন্ধুবিরোধী মিথ্যাচার : বাংলাদেশের রাজনীতি*, আবীর আহাদ, জ্যোৎস্না পাবলিশার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯২

৭. *'৭০ থেকে '৯০ : বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট*, আবদুল ওয়াহেদ তালুকদার, পাণ্ডুলিপি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯১

৮. Bangladesh Forces Ahead: Policies and measures, Ministry of Information, Government of Bangladesh. তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৯. *বাংলাদেশের তারিখ*, মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

১০. *জীবন যে রকম*, আয়েশা ফয়েজ, সময় প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ ২০০৮

১১. *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ : রক্তাক্ত মধ্য আগস্ট ও ষড়যন্ত্রের নভেম্বর*, কর্নেল শাফায়াত জামিল, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

১২. *ফ্যাক্টস অ্যান্ড ডকুমেন্টস : বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড*, অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, জ্ঞান প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬; চারুলিপি প্রকাশন, ঢাকা, পরিবর্ধিত পরিমার্জিত প্রথম চারুলিপি প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৩. *১৫ আগস্টের সামরিক অভ্যুত্থান: মুজিব হত্যা ও ধারাবাহিকতা*, ড. হাসানউজ্জামান। অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৪
১৪. *মুজিব হত্যা চক্রান্ত*, লরেন্স লিফশুলজ; অনুবাদ : আশফাক আলম স্বপন। ত্রিধারা প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৮
১৫. *আমাদের স্বাধীনতাসংগ্রামের ধারাবাহিকতা এবং প্রাসঙ্গিক কিছু কথা*, মেজর জেনারেল এম এ মতিন, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ২০০২
১৬. *সশস্ত্র বাহিনীতে গণহত্যা, ১৯৭৫ থেকে ১৯৮১*, আনোয়ার কবির, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~